SCI Kolkata

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

সুশীল রায়

জিজ্ঞাসা
ক লি কা তা

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৭০
এপ্রিল ১৯৬৩

প্রকাশক শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড
১৩৩এ-রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

ভূমিকা

যাঁরা কলেজে বাংলাবিদ্যা পঠনপাঠন করেন তাঁরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম জানেন। তিনি কে ও কী ছিলেন এবং কী কী বই লিখেছিলেন তাও বোধ করি জানেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা কোনো বই বা আঁকা কোনো ছবি তাঁদের অধিকাংশের দৃষ্টিগোচর হয়েছে বলে মনে হয় না।

অথচ আমরা বাঙালিরা আমাদের সাহিত্যপ্রিয়তার জাঁক করি।

লেখক হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় নাট্যকার রূপে, দ্বিতীয় পরিচয় অনুবাদক রূপে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক নাটক একদা অভিনয়ে খুব জমেছিল, বিশেষ করে 'সরোজিনী'। 'সরোজিনী' নাটক যাত্রাপালা হয়ে দেশে পল্লী-অঞ্চলে সমাদৃত হয়েছিল। এ ভাবে এতটা সমাদর আর-কোনো বাঙালি নাট্যকারের রচনা— ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' ছাড়া— পায় নি। আমি এখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তি উদ্‌ঘোষণ করছি না। আমি বলতে চাই, যে সাহিত্য অতীতের, এখন যে সাহিত্যের সে জলুষ নেই কিন্তু একদা যা ছিল, সে সাহিত্যকে বাংলা বিদ্যার কারবারিরাও যদি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন তবে দুর্ভাগ্য, অতীতের ও বর্তমানের।

তবে, ভরসা হল। সুশীলবাবুর বই থেকে অনেকে জানতে পারবেন যে, এ দেশে এমন-একজন লোক একদা ছিলেন যিনি সাহিত্যে শিল্পে সংস্কৃতিতে লোকযাত্রায় বিচিত্রকর্মা অগ্রণী। এ কথা সত্য যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিষয়ে যা জানি তা প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে গেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি আমরা পড়ি তো সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর দিক থেকে। যদি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিষয়ে মোটা-মার্কার প্রশ্ন থাকত তবে আগেই তাঁর উপর পাঁচ-দশ খানা বই বেরিয়ে যেত। আশঙ্কা হচ্ছে, এখন সুশীলবাবুর পদাঙ্ক মুছে দিতে পশ্চাদ্‌ধাবক এল ব'লে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা ও শিল্পের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে বেশি টানে। তাঁর জীবন সম্বন্ধে আরও অনেক জানতে ইচ্ছা করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আমার কেমন tragic figure বলে মনে হয়। তাঁর মধ্যে যেন একটু

বিষাদ ছিল। রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’র খেই ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও যেন লুকিয়ে পড়লেন। সুশীলবাবু তাঁর জীবনী-সংগ্রহে যথোচিত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতে তৃপ্তি হল না। অনুরোধ করি, তিনি যেন আরও বছর-কয়েক গবেষণা করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-মানুষটির জীবনী রচনা করেন। এ কাজে সুশীলবাবুরই অধিকার।

১৬. ২. ৬৩

শ্রীসুকুমার সেন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে এখানে যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হল। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর প্রভাব এককালে কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে তেমন ভাবে ইতিপূর্বে আলোচনা না হওয়ায় আমরা তা বিস্মৃত হতে বসেছি। একাধারে কর্মী ও শিল্পী এই মানুষটির বিভিন্ন কর্মোদ্যোগ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হল। আশা করা যায়, এতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহুমুখীপ্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাবে।

এই কাজে অনেকের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। তথ্যসংগ্রহ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সহায়তা করেছেন। নানা প্রকার পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থাদি দিয়ে আনুকূল্য করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের লাইব্রেরি, শান্তিনিকেতন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতার ন্যাশানাল লাইব্রেরি। এ ছাড়া, কয়েকটি ছোট ছোট লাইব্রেরি থেকেও কিছু বই পেয়েছি। এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের কাছে এ জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী মহাশয়ার কাছ থেকে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের জীবন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানবার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটেছে, এ কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের এক সকালে তাঁর শান্তিনিকেতনের গৃহে বসে তিনি তাঁর এই নতুনকাকার বিষয়ে অনেক কাহিনী বিবৃত করেছেন। তাঁর বর্ণনার গুণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছি বলে মনে হয়েছে। এতে আমার রচনা-কাজের বিশেষ সুবিধে ঘটেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধর্মদীক্ষা সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের পত্রটি দিয়েছেন শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়; এই পত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, নূতন পদ্ধতি অনুসারে ঠাকুরপরিবারে এই অনুষ্ঠানটিই প্রথম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রের তালিকা প্রস্তুতে সাহায্য করেছেন শ্রীঅসীমকুমার ঘোষ; উল্লেখপঞ্জী প্রস্তুতে সাহায্য পেয়েছি শ্রীসনৎকুমার গুপ্তের; মুদ্রণ ব্যাপারে শ্রীসতীন্দ্র ভৌমিক ও

শ্রীইবিমল লাহিড়ীর সাহায্য লাভ করেছি। আরও অনেকে নানাভাবে আমার কাজে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ও ডক্টর বিজিতকুমার দত্ত। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কয়েকটি চিত্র মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের নির্দেশ ও উপদেশ অনুযায়ী অগ্রসর হয়ে এই কাজ আরম্ভ করি। নির্দেশ ও উপদেশের সঙ্গে তিনি যে উৎসাহ দান করেছেন, এ কাজ তারই জন্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হল।

১ বৈশাখ ১৩৭০
১৩ বি কাঁকুলিয়া রোড
কলকাতা ১৯

সুশীল রায়

সূচীপত্র

চিত্রাবলী



জন্ম : ৪ মে ১৮৪৯ মৃত্যু : ৪ মার্চ ১৯২৫

সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা আমরা করব না। মানুষের মনের এ রহস্য নিয়ে মানুষের মন চিরকালই বিব্রত। অনেক চিন্তা ও অনেক চেষ্টা বহুকাল ধরে করা হয়েছে, কিন্তু সে রহস্যের কোনো কিনারা পাওয়া যায় নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছেন মানুষের মনের সেই রহস্যের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

তাঁকে আমরা তেমন ভাবে মনে রাখি নি, তাঁর কর্মকে তেমন ভাবে স্বীকার করে নিতে বুঝি পারি নি, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা তাঁর প্রাপ্যের উপযুক্ত নমস্কার নিবেদন হয়তো করি নি।

এর কারণ তাঁর বহুমুখী প্রতিভা। এরূপ প্রতিভাবানদের জীবনের ট্র্যাজিডি এইখানেই। এবং এইটিই মানুষের মনের সেই চিরকালীন রহস্য। যাঁকে চিরস্মরণীয় রূপে গণ্য ক'রে মনের মধ্যে চিরজাগরূক ক'রে রাখার কথা, তাঁর সম্মুখে বিস্মরণ-যবনিকা নিক্ষেপ করে আমরা অতি সহজেই আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত করতে পেরেছি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের ট্র্যাজিডি এইখানেই বটে, এবং এইখানেই আমাদের জাতীয়-জীবনেরও ট্র্যাজিডি। তাকে তাঁর প্রাপ্য দক্ষিণা না দিয়ে আমরা কেবল তাঁর স্মৃতির কাছেই না, আমাদের সাহিত্যের সংগীতের সমাজের ও আমাদের নিজেদের কাছেও অধমর্ণ হয়ে আছি।

তাঁর সম্বন্ধে এখানে কিছু লেখার এই চেষ্টা আমাদের সেই জাতীয়-ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা মাত্র।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবিধ কর্মের এবং তাঁর উদ্যমের উদ্যোগের ও উৎসাহের কথা যাঁরা সামান্যমাত্রও জানেন তাঁদের কাছে তিনি একটি আশ্চর্য চরিত্র। যে চরিত্র এমন বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে তার পরিণাম যে এমন বিস্মৃতিতে সম্ভব— এও এক বিস্ময়।

এই বিস্ময়ই হচ্ছে মানুষের মনের সেই রহস্যটি। যে-কোনো একটি বিশেষ শক্তিকে মানুষ স্বীকার করে, কিন্তু বিবিধ শক্তির আধারকে সে কেন যেন স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। একজন বৈজ্ঞানিককে সে মেনে নেবে, তাকে বরণ

করবে, স্মরণও হয়তো করবে; কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক যদি, ধরা যাক, কাব্যরচনা করেন— তা হলেই তাঁর এই দ্বিবিধ মর্যাদাই একসঙ্গে খাটো হয়ে যায়। তাঁকে পুরোপুরি অস্বীকার না করলেও তাঁর এই দ্বিবিধ কর্মের যে-কোনো একটি বড়জোর বেছে নেওয়া হয়তো হয়--হয় তাঁর কবিতা নয় তাঁর বিজ্ঞান।

এ ব্যাপারে হাতের কাছের দুটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে— প্রথম, চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ; দ্বিতীয়, সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ। চিত্রশিল্পী-রূপে রবীন্দ্রনাথ বন্দিত হলেও স্বীকৃত নন, সাহিত্যিক-রূপে অবনীন্দ্রনাথ অভিনন্দন লাভ করলেও অভিবাদন পান নি। ডবল গুণের জন্যে মানুষের মন দ্বিগুণ মর্যাদা দিতে রাজি না, মানুষের মনের মধ্যে মর্যাদার পুঁজি যেন পরিমিত, যে-কোনো একজায়গায় পুরো উপুড় করে সে তা ঢেলে দিতে পারে, তার থেকে ভাগাভাগিটা যেন তার কাছে নিয়মের ব্যতিক্রম।

এই নিয়মের দৌলতেই বুঝি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাগ্যে তেমন কিছুই পড়ল না। তাঁর গুণটা আবার কেবল ডবলই না— তাঁর গুণ ছিল এরও কয়েকগুণ বেশি। এবং তার সব-কয়টির উপর তিনি তাঁর জীবনের সঞ্চিত প্রতিভা সমান-সমান মাপে ঢেলে গিয়েছেন। এইজন্যে তাঁর কোনো বিশেষ একটি কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি কারো বিশেষ দৃষ্টি না পড়ে সেই দৃষ্টিটা তাঁর বিবিধ কর্মের উপর ছড়িয়ে গিয়ে চার দিকে চারিয়ে গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে কি যে করণীয় তা বুঝতে না পেরে হয়তো মর্যাদার আধারটি আর উপুড় করা হয়ে ওঠে নি।

তাই বঞ্চিত হয়ে আছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। কিন্তু এ বঞ্চনা তাঁর একার নয়, এ বঞ্চনা আমাদেরও; আমাদের জাতির— বঙ্গবাসীর। আমরাও তাই বঞ্চিত হয়ে আছি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত কাজের লোকের জীবনে এ এক অবিশ্বাস্য পরিণাম। তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল অসাধারণ, উদ্ভাবনাশক্তি অসামান্য। কিন্তু কল্পনার জাল বুনে ঊর্ণনাভের মত তিনি কেন্দ্রবিন্দুতে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারেন নি; যখনই কোনো কাজের কল্পনা তিনি করেছেন, তখনই তিনি প্রস্তুত করে নিয়েছেন সেই কাজের পরিকল্পনাও, এবং সেই পরিকল্পনা-অনুযায়ী চলেছে সেই কাজকে রূপ দেওয়ার উদ্যোগ।

নাট্যকার, বহুভাষাবিৎ-অনুবাদক, গীতরচয়িতা ও স্বরলিপিকার রূপে তিনি

নিজেকে পরিচিত করেছেন। কিন্তু এই পরিচয়ই তাঁর পূর্ণ পরিচয় নয়। তরুণ-বয়স থেকেই তিনি প্রতিকৃতি-অঙ্কনের প্রতি অনুরক্ত হন এবং বহু প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন— দেশে ও বিদেশে সেসব চিত্র প্রশংসা অর্জন করেছে। সাহিত্যে ও শিল্প -কর্মে তিনি যেমন দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন, জমিদারী-পরিচালনা এবং স্বদেশী স্টিমার-চালনাতেও তেমনি নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-পরিচালনায় তাঁর উদ্যম এবং দেশের ছেলেদের স্বাদেশিকতায় দীক্ষিত করার জন্যে সভা স্থাপনা এবং তাদের শিকার শেখানো ও সর্বজনীন পরিচ্ছদ উদ্ভাবনা এবং দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করে তাদের উদ্দীপিত করা তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। এ ছাড়া অভিনয়েও তাঁর দক্ষতা ছিল। এবং এত কাজের মধ্যে থেকেও শিরোমিতি-বিদ্যায়ও তিনি তাঁর পটুতার প্রমাণ দিয়েছেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা— রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠনে তাঁর প্রভাব। এসব বিষয় পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনার যোগ্য।

এই কর্মবীর শিল্পপ্রাণ ও দেশপ্রাণ পুরুষটিকে উচ্ছ্বাসের মুহূর্তে আমরা হয়তো কখনো কখনো মহাত্মা বলে উল্লেখ করি, কিন্তু তাঁর মাহাত্ম্যের প্রতি আমরা সত্যই উদাসীন।

আমাদের মনে হয়, তিনি বহুবিধ কাজ যে যে পরিমাণে করেছেন, এর মধ্যের যে-কোনো একটি কাজ যদি তিনি ঠিক ঐ পরিমাণেই করে যেতেন তাহলে হয়তো তাঁর সেই বিশেষ কাজটিকে আমরা অধিক মনোযোগের সঙ্গে দেখতাম। তাঁর সামগ্রিক কর্মের প্রতি আমাদের মন কেন-যেন তেমন আকৃষ্ট নয়। গণিতের দ্বারাও মনের এ রহস্যের কোনো মীমাংসা হয় না। প্রতিটি কর্মের প্রতি যদি আলাদা আলাদা ভাবে মনের যোগ হতে পারে, তা হলে সবগুলি একত্র করলে সেই যোগফল অবশেষে শূন্য হয়ে যায় কি করে তা বলা বড় কঠিন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাগ্যে জুটেছে এই কর্মফল। তাই তিনি আজ বিস্মৃত।

বিস্মৃত বটে, আমাদের সচেতন মনের সম্মুখে তিনি সমুজ্জ্বল মূর্তিতে দণ্ডায়মান নন বটে, কিন্তু আমাদের অর্ধচেতন বা অবচেতন মনের একটি বিশিষ্ট অংশ তিনি অবশ্যই অধিকার করে আছেন। আমাদের মনের মধ্যে তাই জমা হয়ে

উঠেছে প্রচ্ছন্ন কৃতজ্ঞতা। জনতার হাততালি লাভ তিনি করলেন না, কিন্তু তিনি কৃতজ্ঞদের কাছ থেকে পেলেন করজোড় নমস্কার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের সার্থকতা এইখানে, এবং এইখানেই তাঁর কর্মের সাফল্য। পৃথিবীর এই জনজীবনের দুস্তর মরুভূমিতে জ্যোতিরিন্দ্রের কর্মের স্রোত তার ধারা হারিয়ে ফেলেছে হয়তো, তাকে আজ আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই সে ধারা ফুরিয়ে গিয়েছে বলে আমরা কিন্তু স্বীকার করতে পারিনে। একদা তিনি যে প্রেরণা আমাদের জাতীয়-জীবনে ও সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় দিয়ে গিয়েছেন, সেই প্রেরণাটি অবশ্যই অদৃশ্য ধারার মত বয়ে চলেছে, এবং তারই প্রভাবে উভয়কূল উর্বর হয়ে উঠেছে এবং দুই পারে ফলে উঠেছে অজস্র ফসল।

আম্রকুঞ্জে প্রচুর ফল ফললে সেই আনন্দের উৎসবে কে কবে মনে-মনে স্মরণ করে সেই ব্যক্তিটিকে— যে ব্যক্তি একদা ভূমি নির্বাচন করে উপ্ত করেছিল বীজ, এবং অঙ্কুরের প্রথম উদ্‌গমে যে ব্যক্তি উল্লাসে উতরোল হয়ে তার মূলে সার দিয়ে এবং স্নেহের জলধারা দিয়ে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল তাকে। সে ব্যক্তিকে কেউ মনে না রাখলেও সেই ব্যক্তির প্রচেষ্টাটি মিথ্যে হয়ে যায় না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'বঙ্গের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক আম্রকুঞ্জের প্রথম মালাকর। তাঁর রচিত এই কুঞ্জকে আমরা লালবাগ আখ্যা দিতে পারি। কেননা, কথায় যাকে বলে লক্ষ রকমের কাজ, তিনি তাঁর একটি জীবনে তাই করে গিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একাই একটি ইন্‌স্‌টিটিউশন।

তাঁর উদ্যোগ উৎসাহ সাহস ও মনের প্রসার দেখে মনে হয় তিনি খুব কম করে অর্ধ শতাব্দ কাল আগাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তা না হলে যে দেশে নারীদের অন্তঃপুরের নিভৃত নেপথ্যে বন্দিনীর জীবনযাপন করার কথা, সেই দৃঢ় নিয়ম লঙ্ঘন করে তিনি সস্ত্রীক ঘোটকারোহণ করে কি ভাবে জোড়াসাঁকোর গৃহ থেকে ইডেন উদ্যান পর্যন্ত যেতে পারলেন! প্রচুর প্রাণশক্তি ও অপরিসীম মানসিক বল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের এই পুত্রটি।

১৮৪৯ সনের ৪ঠা মে, ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ২২শে বৈশাখ, মধ্যরাত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম[১]।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিনি পঞ্চম পুত্র— সপ্তম সন্তান। রবীন্দ্রনাথের তিনি

নতুনদাদা। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির অষ্টম পুত্র— চতুর্দশ সন্তান। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বারো বছরের বড়।

এখানে ঠাকুরবংশের কিঞ্চিৎ পূর্বপরিচয় দেওয়া যেতে পারে। এই বংশ অতি প্রাচীন। অষ্টম থেকে একাদশ শতকের কোনো সময়ে আদিশূরের অনুরোধে কান্যকুব্জ থেকে বঙ্গদেশে পঞ্চব্রাহ্মণ প্রেরিত হন। এই পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম হচ্ছেন ভট্টনারায়ণ। ঠাকুরবংশের উৎপত্তি এই ভট্টনারায়ণ থেকে। ভট্টনারায়ণের ষষ্ঠবিংশতি বংশধর পঞ্চানন, ইনি যশোহর থেকে গোবিন্দপুরে এসে বসবাস আরম্ভ করেন, এবং 'ঠাকুর' পদবি লাভ করেন। পঞ্চাননের পুত্রের নাম জয়রাম। জয়রামের চার পুত্র— আনন্দীরাম নীলমণি দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম। দ্বিতীয় পুত্র থেকে জোড়াসাঁকো-ঠাকুরপরিবারের উদ্ভব। নীলমণির তিন পুত্র— রামলোচন (১৭৫৪), রামমণি (১৭৫৯), ও রামবল্লভ (১৭৬৭)। রামমণির তিন পুত্রের অন্যতম দ্বারকানাথ।

পুত্রহীন রামলোচন ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। উত্তরাধিকার-সূত্রে দ্বারকানাথ প্রভূত বিত্তের অধিকারী হন। .

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথের জন্ম। তাঁর বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় শেরবোর্ন নামক জনৈক ফিরিঙ্গি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলে। এখানে তাঁর ইংরেজি পাঠ অভ্যাস হয়। সেই সঙ্গে তিনি ফার্সি ও আরবি ভাষায়ও দক্ষ হয়ে ওঠেন। তার পর আইন-শিক্ষার জন্যে তিনি ফারগুসন নামক একজন ব্যারিস্টারের কাছে শিক্ষানবিশী ক'রে এ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। সে-আমলে নিমক-মহলের দেওয়ানীর কাজ ছিল খুবই লাভজনক। দ্বারকানাথ স্বীয় কর্মকুশলতায় সল্ট এজেন্ট প্লাউডেন নামক সায়েবের দেওয়ানী পদ লাভ করেন। এর দ্বারা অল্পদিনের মধ্যে তিনি বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। তার পর 'কার টেগোর কোম্পানী' ও 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গঠন ক'রে স্বাধীন ব্যবসায়ের দ্বারাও প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তিনি উদারহৃদয় পুরুষ ছিলেন; দানে ছিলেন মুক্তহস্ত। কলকাতা মেডিকাল-কলেজ স্থাপনে তাঁর সহায়তার কথা সকলেই জানেন, নিজ ব্যয়ে তিনি মেডিকাল কলেজের দুইজন ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার্থে বিলাতে পাঠান। ১৮৪৪ সালে তিনি দ্বিতীয় বার বিলাত যান, দুই বছর পরে ১৮৪৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়— লণ্ডন শহরের উপকণ্ঠে এক প্রসিদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে

তাঁর দেহ সমাধিস্থ হয়। রাজা রামমোহন রায়ের তিনি অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ও সহকর্মী ছিলেন।

বিলাতে তিনি 'প্রিন্স' নামে আখ্যাত হতেন।

দ্বারকানাথের ছয় পুত্রকন্যার মধ্যে প্রথম কন্যাসন্তান অতি অল্পবয়সে মারা যান, দ্বিতীয় দেবেন্দ্রনাথ, তৃতীয় নরেন্দ্রনাথ—অল্পায়ু, চতুর্থ গিরীন্দ্রনাথ, পঞ্চম ভূপেন্দ্রনাথ—অল্পায়ু, ষষ্ঠ নগেন্দ্রনাথ। যে তিন পুত্রকে জীবিত রেখে দ্বারকানাথ লোকান্তরিত হন তাঁদের মধ্যে একমাত্র দেবেন্দ্রনাথই (১৮১৭-১৯০৫) দীর্ঘজীবন লাভ করেন, অপর দুই জনের মধ্যে গিরীন্দ্রনাথ (১৮২০-১৮৫৪) ও নগেন্দ্রনাথ (১৮২৯-১৮৫৮) অধিককাল জীবিত ছিলেন না। এই দুই জনের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান, গিরীন্দ্রনাথের চার পুত্রকন্যা—গণেন্দ্রনাথ কাদম্বিনী কুমুদিনী ও গুণেন্দ্রনাথ। গুণেন্দ্রনাথের (১৮৪৭-১৮৮১) পাঁচ পুত্রকন্যা—গগনেন্দ্রনাথ সমরেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ বিনয়নী সুনয়নী।

দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিছুদিন পাঠ করেন। ধনী পিতার পুত্র হয়েও অধিকদিন বিষয়সুখে তিনি সুখী থাকতে পারেন নি। এইরূপ সুখকে হেয় জ্ঞান করে তিনি বেদান্তধর্ম অনুশীলনে রত হলেন, এবং 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করলেন (১৮৩৮)। বছর দুই পরে তিনি স্থাপন করলেন 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'। ১৮৪৩ সনে (১২৫০ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ) তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ছিল অসামান্য। নিজ চেষ্টায় তিনি বাংলা সংস্কৃত ফার্সি ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। দেশাত্মবোধেও তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন।

তাঁর পিতা কোটি টাকা ঋণ রেখে মারা যান। দেবেন্দ্রনাথ কারও পরামর্শ না শুনে পিতার সেই ঋণভার গ্রহণ ক'রে অস্থাবর সম্পত্তি ও বিলাসিতার উপকরণাদি বিক্রয় করে পিতৃঋণ পরিশোধ করেন। নিষ্কাম ও নিস্পৃহ জীবন যাপন করে তিনি সুখানুভব করতেন; বৎসরের বেশির ভাগ সময় হিমালয়ের নিভৃত স্থানে শান্তিপূর্ণ ভাবে কাটাতেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁর দান সামান্য নয়। তাঁর আত্মজীবনী, আত্মতত্ত্ববিদ্যা, ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তিনি মহর্ষি নামে আখ্যাত হন।

'প্রিন্স' দ্বারকানাথের পুত্র রাজসিক জীবন পরিত্যাগ ক'রে আখ্যাত হলেন ভিন্ন পরিচয়ে, সে পরিচয় 'মহর্ষি'।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চদশ পুত্রকন্যার মধ্যে প্রথম কন্যা অল্পায়ু, তার পর দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রনাথ সৌদামিনী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুকুমারী পুণ্যেন্দ্রনাথ শরৎকুমারী স্বর্ণকুমারী বর্ণকুমারী সোমেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ বুধেন্দ্রনাথ।

দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিতৃকুলের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাঁর মাতার নাম সারদা দেবী (১৮২৩ ?-১৮৭৫)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় গৃহে। গৃহস্থিত গুরুমহাশয়ের কাছে তার হাতেখড়ি হয় ও প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেকালের রীতিই ছিল এইরূপ— গুরুমহাশয় চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলে বসতেন, পাড়ার ছেলেরা পাঠ নিত, গুরুমহাশয়ের ফরমাশ খাটত, পলাতক বালকদের ধরে এনে দিত, গুরুমহাশয়কে দেয় দক্ষিণা আদায় করে দিত। ঠাকুরবাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপ নেই, সুতরাং তিনি পাঠশালা খুলেছিলেন ঠাকুরদালানে। এইখানে বাড়ির অন্যান্য বালক ও পাড়াপ্রতিবেশীর কয়েকটি ছেলের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাঠ আরম্ভ হয়। গুরুমহাশয়টি সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, ইনি "একেবারে সেকেলে পণ্ডিতের জ্বলন্ত আদর্শ। রং কালো, গোঁফজোড়া কাঁচাপাকায় মিশ্রিত মুড়া-খ্যাংরার ন্যায়।... মুখে কখনও এতটুকু হাসি দেখা যাইত না।... তাঁহার এক-গাছি ছোট বেত ছিল, নিজের দেহের সঙ্গে সেটিকেও তিনি সযত্নে তৈল মাখাইতেন।... অপরাধে, বিনা-অপরাধে, যখন-তখন, এই বেত্রগাছটি ছাত্রদিগের পৃষ্ঠস্পর্শে আসিত... আর সেইসঙ্গে কতকগুলা অকথ্য গালিবর্ষণও যে না হইত, তাহাও নয়।"[১]

এই অবস্থার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হল। তাঁর সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ তাঁর চেয়ে বছর পাঁচের বড়, ইনি এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন, এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে একজন গৃহশিক্ষকের কাছে ইংরেজি পড়া আরম্ভ হল। হেমেন্দ্রনাথও বিশেষ কড়া অভিভাবক ছিলেন।

এখানে হেমেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সামান্য-একটু বলে নেওয়া দরকার। তিনি কিছুকাল মেডিকাল কলেজে অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ও পাশ্চাত্য

বিজ্ঞানের প্রতি হেমেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, বিজ্ঞান-বিষয়ে তিনি অনেক সরল নিবন্ধ রচনা করেছেন। ফরাসি ভাষাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, "আমাদিগকে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা মেঘনাদ-বধকাব্য জ্যামিতি গণিত ইতিহাস ভূগোল শিখিতে হইত।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সেজদাদার হেফাজতে এলেন। পণ্ডিতমহাশয়ের কবল থেকে এখানে আসা হয়তো অনেকটা তপ্ত কটাহ থেকে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ারই অনুরূপ; কিন্তু এই অগ্নির মধ্যেও হয়তো একটু আরাম ছিল— এখানে ভ্রাতার স্নেহের উত্তাপ ছিল।

সারাদিন ঘাড় গুঁজে বসে বসে পড়তে হত। পড়ার সময় নষ্ট হবে বলে খেলার জন্যও ছুটি মিলত না। বাড়ির অন্যান্য ছেলেরা বাইরে খেলা করছে দেখলে পড়ার টেবিলে আবদ্ধ বালকটির প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠত, মনে হত পৃথিবীটা বুঝি এমনি বন্দীশালা। মুক্তিলাভের জন্যে তাঁর মন অস্থির হয়ে ওঠে।

তাঁর সেজদাদা তাঁর ভালোর জন্যেই অবশ্য এরূপ কঠোর হয়েছিলেন এবং সময়নিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু এর ফল হল বিপরীত। পণ্ডিতমহাশয়ের বেত্রে এবং সেজ-দাদার এই কঠোরতায় পড়াশুনার উপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা জন্মাল।

লেখাপড়া ছাড়া অন্য বিষয়েও হেমেন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রাতাকে শিক্ষা দেন, অর্থাৎ শারীরিক ব্যায়ামে। রবীন্দ্রনাথ যে কানা পালোয়ানের কথা বলেছেন, তার নাম হীরা সিং, এই পাঞ্জাবী কুস্তিগীরের কাছে হেমেন্দ্রনাথ কুস্তি শিক্ষা করেন, এবং শারীরিক বলের জন্যে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর ভ্রাতাদেরও তিনি শারীরিক বলে বলীয়ান করার জন্যে তাদেরও কুস্তি শেখানো প্রয়োজন বোধ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অনেক প্রকার ব্যায়াম শিক্ষা করতে হয়— মুগুর-ভাঁজা ডন-দেওয়া সন্তরণ ইত্যাদি। এ সময় তিনি অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্বল ছিলেন। এইসব ব্যায়ামে স্বাস্থ্যের উপকার হয়ে থাকবে, কেননা উত্তরকালে তিনি অশ্বা-রোহণ শিকার প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়েছেন বলে আমরা জেনেছি।

ইংরেজি ও বাংলায় গৃহের পাঠ এইরূপ কঠোরতার মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি ভর্তি হলেন সেণ্ট পল্‌'স্‌ স্কুলে। কিছুদিন পরে গেলেন মণ্টেগু'স্‌ অ্যাকাডেমিতে। অতঃপর হিন্দু স্কুলে।

ঘন ঘন স্কুল পরিবর্তনের জন্যে তাঁর মনে পড়াশুনার প্রতি বিতৃষ্ণা আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি পাঠ্য-বইতে কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারেন না।

হিন্দু স্কুল থেকে অবশেষে তিনি কেশবচন্দ্র সেন স্থাপিত কলিকাতা কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে ১৮৬৪ সনে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষা দেন। পাঠ্য-বইয়ে তার মনোযোগ ছিল না, লেখাপড়ার উপর বিতৃষ্ণা জন্মেছিল, এ সত্ত্বেও তিনি এনট্রান্স পরীক্ষা দ্বিতীয়-বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। এখানে উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এই বৎসর রমেশচন্দ্র দত্ত এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম-বিভাগে পাস করেন।

কেশবচন্দ্রের কলিকাতা কলেজ প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কলেজ ছিল না। উত্তরকালে এই বিদ্যায়তনটি কলেজে পরিণত করার ইচ্ছে ছিল বলে পূর্ব থেকেই ঐ নাম দেওয়া হয়। এখানে তখন শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃব্য উকিল ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত।

এঁদের কাছ থেকে স্কুলজীবনের শেষ দিকের পাঠ গ্রহণ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এনট্রান্স পাস করে উচ্চশিক্ষার জন্যে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর এ-সেকশনে এবং বিহারীলাল গুপ্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বি-সেকশনে পড়া আরম্ভ করলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ীদের মধ্যে একজন হচ্ছেন নবীনচন্দ্র সেন। গণিতের অধ্যাপক ছিলেন ব্রীজ সায়েব, ইভ্‌স্‌ সায়েব ইংরেজির এবং রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন।

বাড়িতে এদিকে গানবাজনা ও আমোদপ্রমোদের বিরাট আয়োজন। অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথে ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথে হরিহরাত্মা সম্পর্ক, ভ্রাতুষ্পুত্র ও খুল্লতাত দুইজনে প্রায় সমবয়সী। বাড়ির বারান্দায় বসে দুইজনে আড্ডা জমাতেন। এই সময়ে তাঁর মন এই ব্যাপারে মেতে ওঠে। গুণেন্দ্রনাথের মাথায় বড় বড় কল্পনা বেশ আসত, তাঁর সেই কল্পনা অনুযায়ী একদিন

extravaganzaর অভাবের কথা উঠল। কল্পনাকে অবিলম্বে কাজে লাগানোয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত, 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে কয়েকটি মজার মজার কবিতা নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে এক extravaganza তৈরি ক'রে তাতে সুর বসানো হল। গুণেন্দ্রনাথের গৃহের বৈঠকখানায় তুমুল রিয়ার্সেল চলল।

গানবাজনা আমোদপ্রমোদ এবং যাত্রায় তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। এবং অভিনয় করাতেও আগ্রহ কম ছিল না। বিভিন্ন নাটকে ভূমিকাগ্রহণও তখন থেকেই করছেন। এবং নাটুকে রামনারায়ণের নবনাটকে (১৮৬৬) তিনি কনসার্টে হারমোনিয়ম বাজান এবং নটীর ভূমিকাভিনয় করেন।

যখন নবনাটকের অভিনয়ের কিছু আগে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ কর্মস্থল বোম্বাই থেকে ছুটিতে কলকাতায় এসেছেন এবং কাশীপুরের বাগানবাড়িতে সস্ত্রীক আছেন, সত্যেন্দ্রনাথের ব্যারিস্টার বন্ধু মনোমোহন ঘোষও তখন সেখানে, তিনি তখন সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছেন। এইসময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মেজদার কাছে গিয়ে থাকেন। এবং মনোমোহনের কাছে ফরাসি ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন।

কোনো সুযোগ হেলায় হারানো তাঁর ইচ্ছে নয়; এইজন্যে প্রথম সুযোগেই তিনি ফরাসি শিখতে আরম্ভ করলেন; এবং মেজবৌঠাকুরানীর কাছে শুনতে লাগলেন বোম্বাইয়ের গল্প— সেখানকার সমুদ্রের কথা, তার প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা, সেখানকার লোকজনের কথা। কল্পনাপ্রবণ বালকের চোখে স্বপ্ন জেগে উঠল সেই দেশের, এবং সেই স্বপ্নকে চাক্ষুষ দেখার সাধও জেগে উঠল মনে।

এফ এ পরীক্ষা তখন অতি নিকটে। তিনি পড়াশুনা ত্যাগ করে কাউকে কিছু না বলে মেজদাদার সঙ্গে বোম্বাইতে চলে গেলেন (এপ্রিল ১৮৬৭)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন শেষ হল এইখানে। ছাত্রজীবন শেষ হল বটে, কিন্তু ছাত্রের জীবন বুঝি শেষ হল না। বোম্বাইতে গিয়ে তিনি স্বয়ং বরণ করে নিলেন শিক্ষার্থীর ব্রত। ভাষাশিক্ষা চিত্রাঙ্কন ও সেতারবাদন ইত্যাদি কাজে তিনি রত হলেন। যথাস্থানে এসব বিষয়ে আলোচিত হবে।

যে মানুষের মনে আত্মোন্নয়নের অকৃত্রিম আগ্রহ থাকে তার জীবনে উপযুক্ত সুযোগ ঘটে যায়ই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন পর্যালোচনা করলে এর সাক্ষ্য মেলে। মাস ছয় পরেই অসুস্থতার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথকে পুনরায় ছুটি

নিয়ে দেশে ফিরতে হয় (অক্টোবর ১৮৬৭), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে ফিরে আসেন।

এর কিছু পূর্বে (১৮৬৭) ঠাকুরবাড়ির সহযোগিতায় চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার সৃষ্টি হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে ফেরার কিছুদিন পরেই এই মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্যোগ আরম্ভ হয়। গুণেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১ - ১৮৬৯) মেলার সম্পাদক এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে প্রকাশিত 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রিকার সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মেলার সহকারী সম্পাদক।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন আঠারো, এই তরুণের চোখে-মুখে অবশ্যই প্রতিভার বিশেষ-কোনো দীপ্তি ছিল, কেননা, তখন পর্যন্ত তিনি কখনো কোনো কবিতা লেখেন নি, তবুও নবগোপাল মিত্র অনবরতই জ্যোতিরিন্দ্রকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয়ভাবের কবিতা লেখার জন্য অনুরোধ করতেন। এই অনুরোধ পালনের জন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবিতা লিখলেন। কবিতারচনায় এই তাঁর হাতেখড়ি, কবিতাটির নাম 'উদ্বোধন'[৩]।

কবিতরচনায় যেমন এই সময়ে তাঁর হাতেখড়ি, তেমনি তাঁর জাতীয়-চেতনা-লাভেরও বুঝি এই প্রথম উদ্বোধন।

হিন্দুমেলার এই দ্বিতীয় অধিবেশনের কিছুদিন পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয় (৫ জুলাই ১৮৬৮, ২৩ আষাঢ় ১৭৯০ শক)। তাঁর স্ত্রীর নাম কাদম্বরী দেবী।

এই বিবাহের সংবাদ ১৭৯০ শক শ্রাবণ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এইরূপ মুদ্রিত হয়—

> ব্রাহ্ম-বিবাহ।—গত ২৩ আষাঢ় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যার যথাবিধি ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে শুভবিবাহ সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সভায় বহুসংখ্য ব্রাহ্ম এবং এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান

> অধ্যাপক ব্রাহ্মণ সকল উপস্থিত ছিলেন। দরিদ্রদিগকে প্রচুর ভক্ষ্য ভোজে পরিতৃপ্ত করিয়া বিস্তর অর্থ প্রদান করাও হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথ তখন মারি হিল্‌স্‌এ অবস্থান করছিলেন। তিনি পুত্রের বিবাহে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। বিবাহের কয়েকদিন পরে ২০শে জুলাই তারিখে তিনি সেখান থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথকে লেখেন—

> প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ,—জ্যোতির বিবাহে যাহা কিছু আমার হৃদ্য ও কল্যাণকর কার্য্য হইয়াছে তাহা তোমার প্রযত্নেই হইয়াছে। ইহা হইতে প্রচুর মঙ্গল উৎপন্ন হইয়া তোমার হৃদয়কে আনন্দে সিক্ত রাখুক এই আমার আশীর্বাদ। ইতি ৬ শ্রাবণ, ১৭৯০ শকাব্দ।
>
> শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

দেবেন্দ্রনাথ এই বিবাহে 'প্রচুর মঙ্গল উৎপন্ন' হওয়ার আশা জানিয়াছিলেন। বস্তুত, মঙ্গল প্রচুর পরিমাণেই উৎপন্ন হয়েছিল! রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই নববধূর প্রভাব কম নয়, ইনি যখন গৃহে এলেন রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত। কিন্তু মঙ্গল অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হল না, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তেইশ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স পঁয়ত্রিশ, তখন, ১৮৮৪ সনের ১৯শে এপ্রিল, ১২৯১ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ, কাদম্বরী দেবী অকস্মাৎ আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে বটে, কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন, 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই বউঠাকুরানীর কথা অনেকভাবে বলে তাঁকে অমরত্ব দিয়েছেন। এঁর স্মৃতির উদ্দেশে কয়েকটি কবিতাও তাঁর আছে।

১৮৬৮ সনে তাঁর বিবাহ হয়। এই সময় থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আমরা অন্য কাজে লিপ্ত দেখি। হিন্দুমেলা উপলক্ষে তিনি প্রথম কবিতা রচনা করেন, এখন তিনি আরম্ভ করেন ব্রহ্মসংগীত রচনা, বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ সহ তিনি এই কাজে লিপ্ত হন। তাঁদের এ কাজে পিতা দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল।

তিনি কেবল কল্পনাবিলাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন কর্মীও, সুতরাং এই রচনাকার্যেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ মগ্ন না রেখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচলনা-

কার্যেও আত্মনিয়োগ করেন। কুড়ি বৎসরের তরুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পাদক হলেন আদিব্রাহ্মসমাজের (এপ্রিল ১৮৬৯), এবং একটানা পনেরো বৎসর এই কাজ ক'রে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পর পর্যন্ত (আগস্ট ১৮৮৪) এই পদে বহাল ছিলেন। ১৮৭২ সনের ১০ই মার্চ আদিব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম-বোধিনী সভার সূচনা হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (ও নবগোপাল মিত্র) এই সভার সম্পাদক হন। ১৮৭৫ সনের ৪ঠা জুন 'আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতের স্থায়িত্ব ও উন্নতিসাধনের জন্য' সমাজমন্দিরে আদিব্রাহ্মসমাজ সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর সম্পাদক হন। তার পর আমরা তাঁকে হিন্দুমেলার "সংশ্লিষ্ট সম্পাদক" পদে বৃত হতে দেখি (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪-ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)।

ইতিমধ্যে তিনি একটি নাটক রচনা করেন—'কিঞ্চিৎ জলযোগ', এই নাটকে কেশবচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করা হয়। কেশবচন্দ্র নব্যপন্থী ছিলেন এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা দানের জন্যে বদ্ধপরিকর ছিলেন। "এই সময়ে আমি কিন্তু পুরাতনপন্থী ছিলাম। তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়া এই গ্রন্থে একটু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলাম।"[২] উত্তরজীবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন।

সেই প্রাচীনপন্থীকে আমরা অচিরেই নবীনপন্থী রূপে লাভ করি। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে পরিবারে অনেক পরিবর্তন আনেন, তাঁর প্রভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবশেষে স্ত্রী-স্বাধীনতার এমন পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন যে, সস্ত্রীক ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠ পর্যন্ত ভ্রমণে বহির্গত হতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন নি।

কাজের মানুষের জন্যে নিত্য নূতন কাজের প্রয়োজন। নূতন কাজ যদি চোখের সম্মুখে পাওয়া না যায় তাহলে নূতন কাজ তৈরি করে নিতে হয়। কিছু দিনের জন্যে তিনি জমিদারী কার্য পরিদর্শনের জন্যে কটকে যান— এ ঘটনা তাঁর 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' রচনার কিছুদিন পরের ঘটনা। কটকে জমিদারী কাজ পরিচালনার ফাঁকে তিনি নাটক রচনা করেন ('পুরুবিক্রম', ১৮৭৪), এবং কটক থেকে ফিরেই আর-এক অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে ওঠেন, এর নাম বিদ্বজ্জন-সমাগম। এই সমাগমে জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর নবরচিত নাটকের অংশবিশেষ পাঠ করেন, পরে এর অন্যান্য অধিবেশনে তাঁর কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়।

এর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য নাটক রচনা আরম্ভ করেন। হিন্দুমেলার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে আসছেন, তাঁর ধারণা যে দেশের লোকের মনে দেশপ্রীতি জাগিয়ে তোলার জন্যে ভারতের গৌরবকাহিনী ও বীরত্বগাথা নাটকের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করলে সুফল পাওয়া যাবে। তাঁর রচিত নাটক অভিনীত ও প্রশংসিত হতে আরম্ভ করল, তিনি একজন সেরা নাট্যকাররূপে চিহ্নিত ও বন্দিত হলেন।

তাঁর এই অভিপ্রায় পূরণের জন্যে তাঁর অন্য কর্মপ্রচেষ্টার কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সঞ্জীবনী সভা স্থাপন। জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হবে— সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে এই সভার উল্লেখ করে বলেছেন, "জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন এর সভাপতি।" এই সভায় সর্বজনীন পরিচ্ছদ, অর্থাৎ জাতীয়-পোশাক, -প্রবর্তনের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগ ও উৎসাহ কম ছিল না, এমন-কি বাঙালিদের মধ্যে সৎসাহস বর্ধিত করার জন্যে বন্দুক ছোঁড়া ও শিকারের প্রবর্তনও করা হয়। এই সঞ্জীবনী সভাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এক সাংকেতিক ভাষায় বলা হত হা়ম্‌ চু পা মু্ হা ফ।

বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি আর-একটি সংঘ গঠন করেন, তার নাম সারস্বত সমাজ, ১৮৮২ সনের ১৭ই জুলাই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে এর প্রথম অধিবেশন হয়।

অক্লান্ত কর্মী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষার যেন নিবৃত্তি নেই। তিনি একের পর অন্য এক কাজের মধ্যে নিজেকে লুপ্ত করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। নিজেকে লুপ্ত করতে করতে বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি কখনো নিজেকে প্রচার করার জন্যে ব্যগ্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন কেজো লোক, এবং অনেকটা যেন কাজ-পাগলা। মনে-মনে যা করার ইচ্ছে করতেন অচিরে তা করেছেন। তাঁর জীবনের অন্যতম বড় কাজ হচ্ছে 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র মত একটি সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের কল্পনা তাঁর মাথায় আসা মাত্র তিনি ষোলো বৎসর বয়স্ক ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ ও সুহৃদ্ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর (১৮৫০-১৮৯৮) সঙ্গে পরামর্শ করে জ্যেষ্ঠাগ্রজ

দ্বিজেন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন। এবং অচিরেই, ১২৮৪ সালের শ্রাবণ (১৮৭৭ জুলাই) মাসে 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

যাঁর মাথায় এইরূপ বিবিধ কর্মের পরিকল্পনা আসে, মাথার উপর তাঁর বিশেষ রকম টান থাকাই স্বাভাবিক। এরই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর ফ্রেনলজি বা শিরোমিতি-বিদ্যার প্রতি আকর্ষণে।

স্বপ্ন দেখতে তিনি ভালোবাসতেন, কিন্তু স্বপ্নবিলাসী বলতে যা বোঝায় তিনি তা ছিলেন না। বলা যায়, তিনি কর্মের ও স্বপ্নের শুভপরিণয়ের ছিলেন পুরোহিত। এই উভয় ব্যাপারের নিবিড় সম্পর্ক সম্ভব হয়েছে এই স্বপ্নপ্রাণ-কর্মবীরের দ্বারা। ভাষা অভ্যাস করছেন, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন, সংগীত চর্চা ও প্রচার করেছেন, নাট্য রচনা করছেন, স্বাদেশিকতা প্রচার করছেন, সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা করছেন, সেই যে মানুষ, সেই মানুষ আবার আরম্ভ করেছেন পাট ও নীলের ব্যবসা। তাঁর ভগ্নিপতি, অর্থাৎ স্বর্ণকুমারীর স্বামী, জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে এক হয়ে হাটখোলায় পাটের আড়ৎ খুলে কিছু লাভ হল। অমনি নতুন মতলব এল মাথায়। লাভের টাকা দিয়ে শিলাইদহে গিয়ে আরম্ভ করলেন নীলের চাষ। যখনই যে কাজে নামতেন সেই কাজে আকণ্ঠ ডুবে যাওয়াই ছিল তাঁর অভ্যাস। এই সময় তিনি প্রবন্ধ লিখলেন 'নীলের বাণিজ্য', জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ (মে ১৮৮২) 'ভারতী'তে তা প্রকাশিত হল।

এর বছর-দুই পরেই তিনি নূতন আর-এক কাজে নামলেন— বরিশালে স্বদেশী স্টিমার পরিচালনায়। নীলের ব্যবসা করে যে লাভ হয়, সেই লাভের টাকা দিয়ে এই নূতন ব্যবসায়ে লিপ্ত হলেন। ১৮৮৪ সনের ২৩ মে তারিখে তিনি প্রথম এই কর্মক্ষেত্রে নামলেন, তাঁর জাহাজের নাম 'সরোজিনী'। অনেকের বাধা সত্ত্বেও তিনি এই কাজে নামেন, তার এক কারণ স্বাদেশিকতা, দেশী লোকে যে এ কাজের যোগ্য তা প্রমাণ করা; দ্বিতীয় কারণ, বাংলায় বাঙালির দ্বারা জাহাজ-চালানোর প্রবর্তন তিনিই করবেন— তাঁর এই সংকল্প রক্ষা। সংকল্প তিনি রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিনি সর্বস্বান্ত হলেন।

স্টিমার-পরিচালনায় তিনি, কেবল ব্যস্ত নয়, ব্যতিব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁর

মাথার কাজ চলছে। তিনি অন্যের মাথা দেখে দেখে তার পরীক্ষা করছেন, এবং সে-বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করছেন, সে সময়ের পত্রিকায়— 'কল্পনা' 'বালক' 'সাধনা' প্রভৃতিতে— সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

ষ্টিমার-পরিচালনা আরম্ভের মাস-খানেক আগে তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটে। এই আঘাত সত্ত্বেও তিনি তাঁর কর্মোদ্যম হারান নি। এই আঘাত সত্ত্বেও তিনি তাঁর রচনাকার্য অব্যাহত রেখেছেন।

তাঁর জীবনের এই দুর্ঘটনা ও কর্মপ্রবাহের মধ্যেও আরও দুইটি সূক্ষ্ম ধারা প্রচ্ছন্ন অথচ অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছিল, সে দুটি হচ্ছে সংগীত-সাধনা ও চিত্রাঙ্কন।

তার সংগীত-রচনার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলা গানে নূতন রীতির সুর-সংযোজনা হচ্ছে বাংলার সংগীতে তাঁর বিশিষ্ট দান। এবং, দ্বিজেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত স্বরলিপি-পদ্ধতি সংস্কার করে স্বরলিপিকে সহজবোধ্য করার প্রণালী আবিষ্কার তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বরলিপির যে প্রণালী দিয়ে গিয়েছেন সেই আকার-মাত্রিক স্বরলিপি এখনো চলেছে।

ইতিমধ্যে ১৮৯৪ সনের মার্চ মাস থেকে ১৮৯৭ সনের প্রথম ভাগ পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল পুনায় ছিলেন। পূর্বে তিনি ফরাসি ভাষা শিখেছেন, এবার মারাঠি পণ্ডিতের কাছে শিখলেন মারাঠি।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক সংকলিত ও ব্যাখ্যাত 'স্বরলিপি-গীতি-মালা' প্রকাশিত হয়, তার পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংগীতপ্রকাশিনী মাসিক পত্র প্রকাশ করেন— 'বীণাবাদিনী' (১৩০৪ শ্রাবণ, ১৮৯৭ জুলাই)। 'বীণাবাদিনী' রহিত হওয়ার তিন বছর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' নামে আর-একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন (১৩০৮ আশ্বিন, সেপ্টেম্বর ১৯০১)। যখন তিনি পুনায় ছিলেন তখন সেখানকার 'গায়ন সমাজ' দেখে তাঁর ইচ্ছে হয় কলকাতায় তিনি ঐরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করবেন। এবং সেই ইচ্ছা পূরণ করে তিনি কলকাতায় স্থাপন করেন 'ভারতসংগীত-সমাজ'— বিশুদ্ধ সংগীতচর্চার ব্যবস্থা করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য। তিনি যে 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' প্রকাশ আরম্ভ করলেন তা এই সমাজের মুখপত্র স্বরূপেই।

এই হচ্ছে তাঁর সংগীতসাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সামান্য কয়েক ছত্রেই এই পরিচয় দেওয়া হল বটে, কিন্তু হয়তো এর থেকেই বোঝা গেল যে, অদম্য ও অসামান্য উদ্যোগ না থাকলে এইরূপ কাজ করা সহজ ছিল না— অন্তত সেকালে।

তাঁর বাল্যকালে চিত্রাঙ্কনের আগ্রহের যে বীজ তাঁর মনে উপ্ত হয়েছিল উত্তরকালে সেই বীজ থেকে বিশাল বনস্পতি পল্লবিত হয়। হিন্দু স্কুলে পাঠকালে তিনি ক্লাসে বসে তাঁর শিক্ষকের প্রতিকৃতি এঁকেছেন, সেই অঙ্কনস্পৃহা পরে আরো বর্ধিত হয়। খ্যাত-অখ্যাত বহু ব্যক্তির চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। ১৯১৪ সালে বিখ্যাত ইংরেজ আর্টিস্ট রোটেনস্টাইনের উদ্যোগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত পঁচিশটি চিত্রের একটি অ্যালবাম বিলাতে মুদ্রিত হয়।

এই শিল্পপ্রাণ কর্মবীর মানুষটি কর্মহীন হয়ে বসে থাকতে পারেন নি। নাটক-প্রহসন রচনা তিনি করেছে, স্বরলিপি রচনা করেছেন, চিত্র অঙ্কন করেছেন, সেই সঙ্গে তাঁর অনুবাদ-কার্যের পরিমাণও কম নয়। ইংরেজি থেকে, ফরাসি থেকে, মারাঠি থেকে তিনি অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ তো করেছেনই, সংস্কৃত থেকেও তিনি যতগুলি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তার সংখ্যাও অনেক, ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪— এই পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে তিনি সতেরো খানি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। এই কাজ "তাঁহার স্মৃতির, তাঁহার যোগ্যতার, তাঁহার মেধার, তাঁহার পাণ্ডিত্যের, তাঁহার কবিত্বের অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ হইয়া থাকিবে।"[১]

যখন তিনি সংস্কৃত থেকে অনুবাদকার্য আরম্ভ করেন তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব— এক কালে এই বয়সে নাকি বানপ্রস্থ অবলম্বন করা হত, অর্থাৎ সংসারের কাজ বা কাজের সংসার থেকে অবসর গ্রহণ করা হত। কিন্তু অবসর-গ্রহণ দূরের কথা, তিনি এই সময়ে দ্বিগুণ উৎসাহে নিজেকে কাজেই লিপ্ত করেছিলেন।

এইভাবে তাঁর জীবনের প্রায় ষাট বৎসর কেটে গেল। শেষজীবন তিনি রাঁচীতে অতিবাহিত করেন। সেখানে মোরাবাদী নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে নির্মাণ করেন 'শান্তিধাম'— জীবনের শেষ শান্তিলাভের জন্যে জীবনের শেষ সতেরো বৎসর এইখানে অতিবাহিত করেন। কিন্তু এই নিরালা-বাসের মধ্যেও

তিনি তাঁর জীবনের ব্রত ভোলেন না। এখানেও তিনি সাহিত্য-সংগীত-চিত্রবিদ্যার অনুশীলনেই যাপন করেন।

কৈশোরে মাতৃবিয়োগ, যৌবনে পত্নীবিয়োগ, ও পরিণতবয়সে পিতৃবিয়োগে তিনি শোকাকুল ছিলেন। অবশেষে রাঁচীর 'শান্তিধামে' মধ্যমভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ এল। তখন তিনি ভগ্নী স্বর্ণকুমারীকে এক পত্রে লেখেন—

রবিবার [৯ই ডিসেম্বর ১৯২৩]

ভাই স্বর্ণ,

তোমার আন্তরিক শুভকামনা পেয়ে খুব তৃপ্তিলাভ করলুম। মেজদাদা [সত্যেন্দ্রনাথ, মৃত্যু ১৯২৩] গেলেন, দিদি [সৌদামিনী, মৃত্যু ১৯২০] গেলেন, শরৎ [শরৎকুমারী, মৃত্যু ১৯২০] গেলেন, একে একে সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আমাদের পুরাতন বন্ধুবান্ধব আর একজনও নেই। এইবার আমার পালা।⋯

সেই পালা অবশেষে এল। ১৯২৫ সালের ৪ মার্চ তারিখে সায়াহ্নে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচীতে পরলোকগমন করেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে আত্মপরিচয় দেওয়ার উপলক্ষ্যে লিখেছেন—

ভাতে যথা সত্য হেম মাতে যথা বীর
গুণজ্যোতি হরে যেথা মনের তিমির ;
নব শোভা ধরে যেথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি।

গুণ ও জ্যোতি শব্দ-দুটি কবি লিখেছেন গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে। কিন্তু এর অন্য অর্থও হয়তো অসংগত নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত গুণী পাওয়া কঠিন— তাঁর গুণের জ্যোতি আমাদের মনের অন্ধকার দূর করার জন্যেই যেন বিচ্ছুরিত হয়েছে।

১ মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' গ্রন্থে জন্মতারিখ উল্লিখিত হয়েছে এইরূপ—"সন ১২৫৫ সালের ২২শে বৈশাখ"।

"শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পারিবারিক খাতায় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তাক্ষরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে রাশিচক্র ও জন্মকাল পাওয়া যায়" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১) সে সম্বন্ধে আলোচনা করে রাশিচক্রটি মুদ্রিত করে দেখিয়েছেন—

"জন্ম ১৭৭১ শক। ২২ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ। মে"

কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে হিসাবের একটু ভুল আছে। বলা হয়েছে "ইহা হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্মতারিখ ইংরেজি মতে ২৪ মে ১৮৪৯ পাওয়া যায়।" সম্ভবত এটি মুদ্রণপ্রমাদ, বস্তুত তারিখটি ৪ মে হবে।

২ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'

৩ দ্র° 'ভারতী' ১৩১৩ পৌষ

৪ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রঙ্গালয়' ৪ মাঘ ১৩০৮

৫ মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'

সমসাময়িক সমাজ ও কাল

বাদশাহী আমলের প্রভাব যখন সমাজের অঙ্গ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে যায় নি, এবং তার উপর নতুন শাসকের ইংরেজি প্রভাব সমাজকে যখন নিবিড় ভাবে বেষ্টন করে ধরেছে এমনি এক সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম।

তাঁর জন্মের প্রায় অর্ধশত বৎসর আগে বাংলার গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি, ১৮০১ সালে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে পদ্য রচনা প্রকাশ ও প্রচার আরম্ভ হয়েছে, এবং জ্যোতিরিন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন ১৮৪৯ সালে। তাঁর যখন জন্ম, তখন দেশে ইংরেজিয়ানার ধুম অতি প্রবল।

ইংরেজেরা এ দেশে এসেছিলেন বণিক হয়ে, তাঁদের মানদণ্ড যে একদিন রাজদণ্ড রূপে দেখা দেবে, এ কথা এ দেশের কোনো মানুষ সেকালে কল্পনা করেন নি, এমন-কি স্বয়ং ইংরেজরাও হয়তো সে কথা জানতেন না। ঘটনাচক্রে রাজদণ্ড লাভ করলেন তাঁরা। রাজদণ্ড যখন সহসা এসে পড়ল, যখন রাজা হওয়া গেল তখন রাজকর্তব্য যে পালন করতে হবে— এই সিদ্ধান্তে আসতে তাঁদের কিছু সময় নেয়।

সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এখানে করার আবশ্যক নেই। কেবল এই কথা বলা যেতে পারে যে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানির সনন্দ পেলেন, এবং তারই ফলে তাঁদের কুঠিয়ালরা হয়ে উঠলেন এক-এক জন কলেক্টর। খাজনা আদায় করাই হল তাঁদের কাজ। যার কাছে থেকে খাজনা নেওয়া হয়, সেই প্রজাদের সুখসুবিধার প্রতিও দৃষ্টি যে রাখতে হবে— এ দায়িত্বের কথাটা তাঁদের মাথায় এল না। রাজদণ্ড হাতে এসেছে বটে কিন্তু মনের মানদণ্ডটা তখনও বণিকই রয়ে গেছে। তা না হলে, দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর একটা মর্মান্তিক অধ্যায় হয়ে আছে, যার ফলে বাংলা দেশের তিন ভাগ লোকের মধ্যে এক ভাগকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, সেই বছরেও আদায়ী খাজনার পরিমাণ কম হয় নি। অর্থাৎ জীবিত বা জীবন্মৃত মানুষের কাছ থেকে মৃতের দেয় করও আদায় করা হয়। এমন কাজ অবশ্যই রাজকীয় কাজ নয়।

কিন্তু সে অন্য কথা। অবশেষে রাজকীয় আসনে রাজকীয় মর্যাদা নিয়ে

তাঁরা বসলেন এই দেশে। এইবার তাঁরা প্রকৃতই রাজদণ্ড হাতে নিলেন। তাঁরা দেশের উন্নতির দিকেই মনোনিবেশ করলেন সম্ভবত। এখানে একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটি হচ্ছে দশশালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ১৭৯৩ সালে এই ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে প্রবর্তিত হয়। জমিদারদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতব্যয়িতার জন্যে রাজস্ব ঠিকমত আদায় হত না। জমিদারেরা নিজেদের সুখসুবিধার দিকেই কেবল মনোযোগী। তাঁদের মনোযোগ অন্যত্র ছিল না। এইসব বিষয়ে চিন্তা করেই সম্ভবত জমিদারদের সঙ্গে লর্ড কর্নওয়ালিশ খাজনা আদায়ের এই বন্দোবস্ত করলেন। জমিদারদের দেয় রাজস্ব এর দ্বারা নির্ধারিত হল পাকাপাকি ভাবে। এবং সেইসঙ্গেই এ নিয়মও প্রবর্তিত হল যে, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রাজস্ব দিতে না পারলে জমিদারি নীলামে উঠবে। এবং অচিরেই বহু জমিদারি নীলামে উঠতে আরম্ভ করল।

সমাজে ছিল দুটি শ্রেণী— জমিদার ও রায়ত। জমিদারি নীলামে উঠতে উঠতে আর-একটি শ্রেণী— তৃতীয় শ্রেণী— ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। এই শ্রেণীর নাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী। জমিদারও নয়, রায়তও নয়, এরা চাকুরিজীবী। কোম্পানির নিমক মহলে এবং কুঠিয়ালদের কুঠিতে খাতালেখার কাজে বহাল হতে লাগলেন এঁরা।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলাদেশে এই নতুন সমাজের উৎপত্তি। এই মধ্যবিত্ত সমাজ যখন এ দেশের মাটিতে ও জলহাওয়ায় বেশ বেড়ে উঠেছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম সেই সময়ে— উনিশ শতকের মধ্যভাগে। এই সময়ের একটা নাম দেওয়া যেতে পারে— ইঙ্গমোগলাই কাল।

বাদশাহী আমলের বনিয়াদ ভেঙে পড়েছে বটে, কিন্তু তার ধ্বংসস্তূপ তখনো দেশ থেকে অপসারিত হয় নি। তখনো মানুষের মনে বাদশাহী স্মৃতি বিরাজ করছে, আচারে-আচরণে বেশে-ভূষায় ভাষায়-ভঙ্গিতে তখনো সেই আমলটি আছেই; তার উপর তখন আর-একটি নবীন প্রভাব এসে আচ্ছন্ন করতে আরম্ভ করেছে সমাজ ও সংস্কৃতি— সে প্রভাব ইংরেজ প্রভাব।

তাঁর জীবনস্মৃতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ-বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, "দুইটি বিভিন্ন সভ্যতা বঙ্গদেশকে দুই দিক হইতে যখন এইরূপ সজোরে আঘাত করিতেছে, আমরা ঠিক সেই সময়ে জন্মিয়া দুই রকমই দেখিবার সুযোগ

পাইয়াছিলাম। পূর্বে পোশাক ছিল চোগা চাপকান কাবা পাগড়ি, এখন হ্যাট কোট ওয়েস্টকোট এবং পেণ্টুলন। ভাষায় পূর্বে ফারসী আরবী শব্দেরই আধিক্য ছিল, এখন হইয়াছে ইংরাজী।"[১]

দুই রকম দেখার সুযোগ তাঁর ঘটেছে। মোগলাই সভ্যতা ও ইংরেজি সভ্যতার টাগ-অব-ওয়ার চলেছিল প্রবল ভাবেই। অবশেষে জয় হল ইংরেজি সভ্যতারই। এ একটা বিচিত্র কথা না, কেননা ইংরেজের হাতেই তখন রাজদণ্ড, তাদের জয়ের পথে সুতরাং কোনো বাধা নেই।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী কাল থেকে ইংরেজি আমলের আরম্ভ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। ইংরেজরা এ দেশে পাকাপাকিভাবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দেশে ইংরেজি শিক্ষার ও আচরণের ঢেউ ওঠে। সে ঢেউ প্রথমে আকারে ক্ষুদ্র থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে সেই তরঙ্গ কতটা উত্তাল হয়ে উঠেছিল তার নজির ইতিহাসে আছে।

ইংরেজি শিক্ষা-প্রসারের উদ্যোগ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি স্কুলের উল্লেখ আমরা এখানে করতে পারি।—

১৭৮৪ সালে শেরবোর্ন নামে সাহেব একটি স্কুল স্থাপন করেন, নিজের নাম অনুসারে তার নাম দেন শেরবোর্ন সেমিনারি। দ্বারকানাথ ঠাকুর এখানে শিক্ষালাভ করেন।

ঐ বৎসর (১৭৮৪) চিৎপুরে মহম্মদ রেজা খাঁর সুরম্য প্রাসাদের নিকট জনৈক সাহেব চিৎপুর বয়েজ বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করেন।

১৭৯১ সালে কলুটোলায় রামজয় দত্ত একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন— রামজয় দত্ত স্কুল।

আনুমানিক ঐ সময়েই রামনারায়ণ মিত্র নামে অতি-সামান্য ইংরেজি জানা এক উকিলের কেরানি জোড়বাগানে এক স্কুল খোলেন। এখানে টমাস ডাইস্ (Thomas Dice)-এর স্পেলিং বুক পড়ানো হত।

১৮০০ সালে কয়েকটি স্কুল স্থাপিত হয়— কাসিম নামক সাহেবের দ্বারা কলিকাতা অ্যাকাডেমি, রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪ - ১৮৬৭) এখানে প্রথম ইংরেজি ভাষা শেখেন— ইনি সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য জন্ স্টেব্‌ল্ সাহেবের দেওয়ান রাজা গোপীমোহন দেবের পুত্র এবং মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র;

অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে পালিত হয়েও ইনি বিদ্যানুশীলনে জীবন অতিবাহিত করেন ; হিন্দু কলেজ স্থাপন (১৮১৭) বিষয়ে ইনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। দ্বিতীয়, রিড সাহেবের স্কুল স্থাপিত হয় হাটখোলায়, কোন্নগর-নিবাসী প্রখ্যাত শিবচন্দ্র দেব এখানে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। তৃতীয়, পিট বিবির স্কুল (Mrs Pitt's School for Young Ladies)—প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের জন্যে এই স্কুল স্থাপিত হয়, এবং এ ধরণের স্কুল এই প্রথম।

এর পর ১৮১০ সালে ডেভিড ড্রামণ্ড নামে এক সাহেব ধর্মতলায় এক স্কুল খোলেন। ধর্মতলা অ্যাকাডেমি বা ড্রামণ্ড অ্যাকাডেমি উভয় নামেই এই স্কুল পরিচিত ছিল। ড্রামণ্ড সাহেব কুঁজো ছিলেন, এই জন্যে এ'কে কুঁজো সাহেবের স্কুলও কেউ কেউ বলত। এই স্কুলে প্রথম ইংরেজি ব্যাকরণ প্রবর্তিত হয়। এই স্কুলটিকে চিরস্মরণীয় করেছেন একজন, তাঁর নাম ডিরোজিও (১৮০৯ - ১৮৩১)। এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন ডিরোজিও।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেসঙ্গে যেন একটি নূতন কালের উদ্ভব হল। বাংলাদেশের সমাজে ও সংস্কৃতিতে এই কলেজের প্রভাব কম নয়। এবং এই প্রভাবের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব হয়তো একটি মানুষের, তিনি হলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষকরূপে ডিরোজিও।

রাজনারায়ণ বসু বলেছেন, "ইংরেজি আমলের প্রথম হইতে হিন্দু কলেজ সংস্থাপন পর্যন্ত যে সময় তাহা 'সেকাল' এবং তাহার পরের কাল 'একাল'।" [১]

প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই বঙ্গদেশে বঙ্গচরিত্রে এবং বঙ্গভাষায় ও বঙ্গসংস্কৃতিতে নূতন যুগের প্রবর্তন ঘটল।

১৮১৭ সাল— এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, এই বৎসরই জন্মগ্রহণ করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই নূতন যুগের প্রথম আলোয় তিনি চক্ষু উন্মীলন করেন। তাঁর পুত্রকন্যার মধ্যে প্রায় সকলেই কৃতবিদ্য। এই নূতন আলোর প্রভাবে যে-মানুষ নিজেকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন, তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক নূতনত্বের সন্ধান তাঁর সন্তানেরা লাভ করে থাকবেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লাভ করেছেন। তিনিও নূতন আলোর প্রভায় প্রভাবান্বিত। এইজন্যেই বুঝি তাঁর চরিত্রেও অনেক নূতনত্বের সন্ধান লাভ করা গিয়াছে।

ডিরোজিও-চরিত্রের বিচার করা এখানে আমাদের অভিপ্রেত নয়। কেবল এই কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটির চরিত্রের সম্যক্ বিচার এ পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নি। বিস্ময় বোধ হয় এই কথা ভেবে যে, মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে যাঁর মৃত্যু ঘটেছে, সেই মানুষ কি করে একটি দেশের আচারে-আচরণে একটা উলটপালট ঘটিয়ে দিয়ে গিয়েছেন; এবং সাহিত্য বা সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করতে বসলে যাঁর কথা বার বার উল্লেখ করা ছাড়া আজ পর্যন্ত অন্য পথ নেই।

ডিরোজিওর সংস্পর্শে এসে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যেন বিপ্লব দেখা দিল। পুরাতন সংস্কার পরিহার করে নূতন পথে যাত্রা করার জন্যে ব্যগ্রতা দেখা দিল। অন্যান্য দিকে যেমন তাঁরা অগ্রসর হলেন তেমনি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজনে এবং সুরাপানেও তাঁরা আসক্ত হলেন।

ডিরোজিও লোকান্তরিত হলেন অকালে, কিন্তু তিনি নবযুবকের মনে যে বীজ উপ্ত করে গেলেন তা ক্রমশ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত-পুষ্পিত হল এবং তাতে ফলও ফলল। হয়তো তার সবকয়টিই সুফল নয়।

ডিরোজিও গত হলেন, কিন্তু উত্তরকালকে প্রভাবান্বিত করার জন্যে রয়ে গেলেন তাঁর ছাত্রদল— কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৬৮), প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০)। এঁরা সকলেই স্বনামধন্য। এঁদের প্রভাবে বঙ্গদেশের ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ বিশেষভাবে আলোড়িত ও আন্দোলিত।

আলোড়ন বা আন্দোলনের তাৎপর্য যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে ঐ আন্দোলনের স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দেন। এরকম ঘটনা সে সময়েও ঘটে। তার বিশদ বিবরণ রাজনারায়ণ বসু বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন[১]। সে সময়ে ডিরোজিওর যুবক-শিষ্যদের এমনি ধারণা হয়েছিল যে, মদ ও খানা খাওয়া আলোকপ্রাপ্ত মনের কাজ; এই জন্যে মদ্যপান ও গোমাংস আহারের প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হন। ব্যাপারটা তার পর অনেক দূর গড়িয়ে যায়। রাজনারায়ণ বসু একটি মজার কথা উল্লেখ করেছেন।— "একবার উইলসনের হোটেলে দুই বাঙ্গালী বাবু আহার করিতে গিয়াছিলেন।

এক বাবুর গোরু ভিন্ন চলে না, তিনি খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বীল (veal) হ্যায় ?' খানসামা উত্তর করিল, 'নহি হ্যায় খোদাওন্দ।' বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বীফষ্টিক হ্যায় ?' খানসামা উত্তর করিল, 'ও ভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।' বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অক্স্টং (ox-tongue) হ্যায় ?' খানসামা উত্তর করিল, 'ও ভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।' বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাফ্স্-ফুট-জেলি (calf's foot jelly—বাছুরের খুর দ্রব করিয়া প্রস্তুত খাদ্য) হ্যায় ?' খানসামা উত্তর করিল, 'ও ভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।' বাবু বলিলেন, 'গোরুকা কুচ্ হ্যায় নহি ?' এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয় বাবু, যিনি এত গোমাংসপ্রিয় ছিলেন না তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'ও রে! বাবুর জন্য গোরুর আর-কিছু না থাকে তো খানিকটা গোবর এনে দে-না।' " ²

যখন সমাজে উন্মাদনা এইভাবে প্রবেশ করেছে, হিন্দুধর্মের সবকিছুই মন্দ— এইরূপ মনোভাব যখন দেশের যুবকদের মনে বদ্ধমূল, সেই এক বিভ্রান্তিকর সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম, এবং বাইরের এই আবহাওয়ার অন্তরালে ঠাকুর-বাড়ির ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হচ্ছে।

এ হল সমাজের এক দিক— পুরুষদের দিক। সমাজের অপরার্ধের কথাও এখানে আলোচনীয়। বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্যোগ আরম্ভ হয় হিন্দু কলেজ স্থাপনের আমল থেকেই, অথচ বিক্ষিপ্তভাবে এ ব্যাপারে সামান্য অগ্রসর হওয়া গেলেও প্রকৃতভাবে স্ত্রীশিক্ষার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা নানা প্রতিকূলতার জন্য হয়ে ওঠে না, যেটুকু হয় তাও নাম মাত্র। স্ত্রীশিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য জল্পনা-কল্পনা অবশ্য চলতে থাকে। এখানে সেসবের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার দরকার নেই।

অবশেষে বীটন সাহেব কর্তৃক বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হল। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৯ সালে। বাংলাদেশের পক্ষে এ এক স্মরণীয় বৎসর।

এই স্মরণীয় বৎসরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম।

যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তখন স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপার নিয়ে বিশেষ আন্দোলন সমাজে চলেছে। রক্ষণশীলেরা মেয়েদের শিক্ষাদানের ঘোরতর বিরোধিতা করতে লাগলেন, এবং সমাজসংস্কারকগণ শিক্ষাপ্রচারে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। এই দুই বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিশুকাল

কেটেছে ; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কন্যাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, এর দ্বারা পিতার, বা গৃহের, প্রগতিবাদী মনের পরিচয়ও তিনি লাভ করেন।

সে-আমলের সমাজের সম্পূর্ণ চিত্র কল্পনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সেই সমাজে নারীদের শিক্ষা দেওয়া একটি অসম্ভব কাণ্ড বলেই বিবেচিত হত।

নারীদের এই স্বাধীনতা দেওয়ায় গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রও ব্যঙ্গ করে লেখেন—

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে ;
আর কিছু দিন যাক রে ভাই, পাবেই পাবে দেখতে পাবে
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

সে-আমলের কেউ আজ জীবিত নেই, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভবিষ্যংবাণী যে সফল হয়েছে, তাঁরা তা দেখতে না পেলেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। অথচ এর দ্বারা ব্যাপক ভাবে সমাজের যে কোনো ক্ষতি হয়েছে, এমন কথা মানা হয়তো যায় না।

পরের একটি অধ্যায়ে, যথাস্থানে আমরা দেখতে পাব যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনও প্রথম দিকে কিছুটা রক্ষণশীল ছিল, অর্থাৎ তদানীন্তন সমাজের প্রভাব তাঁর উপর তখনও কাজ করছিল, এইজন্যে তিনি ব্যঙ্গ করে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটক লিখলেন। কিন্তু তার কিছুদিন পরেই যে সেই নাট্যকার স্বয়ং তাঁর স্ত্রীকে ঘোড়ায় চাপিয়ে জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ি থেকে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বেরতে পারেন, তা কল্পনা করা যায় না।

কল্পনা করতে অসুবিধে আছে এমন অনেক নূতন কাজ তিনি করতে পেরেছিলেন, এইজন্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হয়তো ছিলেন ঠাকুরবাড়ির নূতন, এবং অনুজ-অনুজাদের নূতনদা। নিত্যই তাঁর মন নূতনের জন্যে ব্যাকুল হত, যা কেউ করেনি এমনি কাজ করার জন্যে লালায়িত তিনি ছিলেন। সেইজন্যে, মনে হয়, তিনি যোগ্য আখ্যাই লাভ করেছেন।

সংসারে তখন নূতন হাওয়া এসেছে। নবযুবকেরা নূতনের বীজ বপনের জন্যে সমাজের ভূমি কর্ষণ করে চলেছেন, সংস্কারপন্থীরা নূতন সমাজ গঠনের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এমনি এক সামাজিক পরিবেশে মানুষ হতে লাগলেন ঠাকুরবাড়ির এই নূতনদা।

চারদিকেই নূতনত্বের সাড়া পড়েছে। সমাজের আমূল সংস্কারসাধনের জন্যে রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) সময় থেকেই বিভিন্ন কর্মোদ্যম চলেছে। ধর্মের নামে যেসব গ্লানি সমাজে বিরাজ করছিল সেসব দূর করার জন্যে তাঁর প্রচেষ্টার কথা সুবিদিত। রামমোহন রায়ের উদ্যোগেই ১৮২৯ সালে সতীদাহ-প্রথা নিবারিত হয়। তিনি লোকান্তরিত, কিন্তু তাঁর উত্তরসাধক হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বিরাজিত। তাঁর প্রভাবও বঙ্গসমাজে ও ঠাকুরপরিবারে বিশেষভাবে বর্তমান।

কিন্তু এখানে আমরা অন্য-এক পুরুষসিংহের কথা উল্লেখ করতে ইচ্ছা করি। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। নিজের চরিত্রের বলে ও ব্যক্তিত্বের বলে তিনি তখন বঙ্গসমাজের একজন বরেণ্য নেতারূপে গণ্য হয়েছেন। এই নির্ভীক পুরুষটির প্রতিভায় সে আমলের বঙ্গসমাজ প্রদীপ্ত। বিভিন্ন শুভকর্মের পথ ধরে তাঁর যাত্রা অব্যাহত গতিতে। বলা যায়, তন্দ্রাচ্ছন্ন বঙ্গসমাজ এই পুরুষটির প্রবল আলোড়নে যেন জাগ্রত হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

এই সময়ে (১৮৫৬) বিদ্যাসাগর আর-একটি কাজে নবীন উৎসাহে আত্মনিয়োগ করলেন। এ কাজটি হল বিধবাবিবাহ-প্রচলন। যে সমাজে নারীর কোনো ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত নয়, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যে সমাজ উদাসীন, তার জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজ-মনে একটা প্রবল ধাক্কা অবশ্যই, কিন্তু তার উপর তাদের দুঃখ-মোচনের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগরের এই নতুন প্রচেষ্টা সমাজের চোখে ঘোরতর বিভীষিকা ব'লে মনে হয়েছিল। এই কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে কোনো চেষ্টারই ত্রুটি হয় নি। প্রতিপক্ষের আপত্তি-খণ্ডনের জন্যে তিনি গ্রন্থরচনা করতে আরম্ভ করলেন, বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ করার জন্যে নানারূপ চেষ্টা করতে লাগলেন, এবং বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত করার জন্যেও বিভিন্ন উদ্যোগ চলল।

সমাজের আবহাওয়া তখন উত্তপ্ত। এই তপ্ত ভূমিতে মানুষ হয়ে উঠতে লাগলেন শিশু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

এ গেল একটি দিক। এই সঙ্গেই আর-একটি ঘটনার কথাও এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সে ঘটনা হল সিপাহী-বিদ্রোহ (১৮৫৭)। সিপাহী-বিদ্রোহকে প্রথম-স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলে আখ্যাত করতে যদি কারো আপত্তি

থাকে তা হলে তা খণ্ডন করার ইচ্ছে আমাদের নেই ; কিন্তু এই ঘটনাকে অন্য-ভাবেও দেখা যেতে পারে— এই ঘটনাটি হচ্ছে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে প্রথম অভ্যুত্থান।

প্রথমে কলকাতার উপকণ্ঠ ব্যারাকপুরে এর সূচনা, তার পরে মীরাট থেকে এর ব্যাপক প্রসার ; এবং অচিরেই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই বিদ্রোহ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সেই সময়ে এইরূপ জনরব উঠেছিল বলে জানা যায় যে, বিদ্রোহী সিপাহীরা কলকাতার দিকে আসছে, কলকাতার সমগ্র ইংরেজকে হত্যা করা ও শহর লুণ্ঠন করাই নাকি তাদের উদ্দেশ্য।

সে সময়ের কলকাতাবাসীর মনে এই জনরব কতটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল তা অনুমান করা চলে। প্রতি গৃহে এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা যে চলেছিল এবং আবালবৃদ্ধবনিতা এই ঘটনায় ও রটনায় যে শঙ্কিত হয়েছিল, তাও অনুমান করায় অসুবিধা নেই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন আট-নয় বৎসর বয়স্ক বালক। একেবারে শিশু নন। তাঁর মনেও এই বিদ্রোহের প্রতিধ্বনি যে না পৌঁছেছে এমন নয়। বালককালের স্মৃতি উত্তরকালে নবীন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যা আলোআঁধারে ঘেরা একটা রহস্যের মত প্রথমে প্রতীয়মান হয়, কালে তা স্পষ্ট দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-গঠনে এই ঘটনাটিকেও উপেক্ষা করা যায় না।

বস্তুতপক্ষে ঊনবিংশ শতকের এই অংশটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। সমাজের ও সাহিত্যের হিতকর বহু কাজ ও বিবিধ উদ্যম এই সময়ে প্রত্যক্ষ করা যায়।

বাংলায় গদ্যসাহিত্যের উৎপত্তি এই শতকের গোড়ার দিকে, সে কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তার পর সাহিত্যের উন্নতিসাধন ঘটেছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩০ সালে, তার পর মাঝে দু-একবার বন্ধ হলেও গুপ্ত-কবির উৎসাহ বন্ধ হয় না, তিনি পুনরায় তা প্রকাশ করেন। এবং অবশেষে গুপ্ত-কবি সেকালের তরুণ সাহিত্যিকদের ফ্রেণ্ড ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড রূপে অভিষিক্ত হন। গুপ্তকবির শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা উত্তরকালে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তাঁদের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্য-রূপ সরোবরে রাজহংস-রূপে কেলী করার উপযোগী করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এঁদের নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

এখানে 'সংবাদ-প্রভাকরে'র কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, এই পত্রিকাতে হাত মক্‌সো করার সুযোগ পেয়ে এঁরা বঙ্গসাহিত্যে দান করার জন্যে মুক্তহস্ত হতে পেরেছিলেন। এবং এঁদের সেই দান-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় আমাদের আলোচ্য এই সময়ে— ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদে। অর্থাৎ যে সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর বালককাল অতিক্রম করে যৌবনের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছেন, সেই সময়ে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত -প্রসঙ্গ আলোচনার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও বলার আছে। বাংলার নূতন গদ্য তাঁর হাতে ইতিমধ্যে নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে। ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৫৫ সাল—এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে— বেতাল পঞ্চবিংশতি, বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবনচরিত, বোধোদয়, শকুন্তলা প্রভৃতি। এর দ্বারা বাংলার গদ্যও একটা বিশিষ্ট চেহারা ধারণ করেছে।

ক্ষেত্র এই ভাবে প্রস্তুত হবার পর আমরা কয়েকজন সাহিত্যিকের যুগপৎ আবির্ভাব লক্ষ্য করি। তাঁরা হচ্ছেন গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং কাব্যে মধুসূদন দত্ত। এবং সেই সঙ্গে, বা দু-এক বছর আগে, পাই প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল- দর্পণ' (১৮৬০) ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নক্সা' (১৮৬১)।

বাংলাদেশের সাহিত্যিক পরিবেশও তখন নূতনত্ব লাভ করেছে, আবহাওয়া তখন কল্পনাপ্রবণ মনের পক্ষে উপযোগী।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) বলেছেন, "বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবাবিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও

ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল।"[৩]

এই-যে প্রবল আন্দোলন, এর ফলে মানুষের মনে বিশেষ চেতনা জাগ্রত হবার কথা। এবং সে-মানুষ যদি কল্পনাপ্রবণ হয়, এবং কল্পনাকে কাজে লাগানোর মত কেজো মানুষ হয়, তা হলে তো কথাই নেই। সমাজে যখন এই আন্দোলন উপস্থিত তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে সেই আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠছেন। নিজ হাতে কাজ করার মত শক্তি তখন না হলেও, আন্দোলনের তাৎপর্য কিছু বুঝবার মত বয়স তখন হয়েছে। তখন তাঁর বয়স বারো।

বঙ্গসাহিত্যের কৃতি সন্তানেরা তখন তাঁদের সাধনা ও সৃষ্টি নিয়ে ব্যাপৃত, নবচেতনায় তখন সকলে উদ্বুদ্ধ। মধুসূদন তাঁর অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। নাটক প্রহসন কাব্য -রচনা দ্বারা তিনি নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন— শর্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য (১৮৬০), পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০), মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬) একে একে প্রকাশিত হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় তখন আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসিতেন। আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল। মধুসূদনকে আমার বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে। রং ময়লা, চুলগুলি ইংরাজী-ফ্যাসানে ছাঁটা বেশ কোঁকড়া-কোঁকড়া, মাঝখানে সীঁথি। চোখ দুটি বড় বড়, লোচন প্রতিভাদীপ্ত, চেহারা দোহারা, মুখশ্রী লাবণ্য-সমুজ্জ্বল। তাঁহার গলার আওয়াজ ছিল একটু ভাঙা-ভাঙা। আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের পাণ্ডুলিপি তাঁহার সেই ভাঙা গলায় সারদাবাবুকে শুনাইতেছিলেন। তখনও মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হয় নাই।"[১]

মেঘনাদবধ কাব্য ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতি থেকে সে স্পষ্ট চিত্রটি অঙ্কিত করেছেন তা ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হবার আগের। ১৮৬০ সালের ৩রা অগস্ট তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন এক পত্রে[৪] লেখেন, "I am so happy you like my Meghnad. I

mean to extend it to 9 সর্গs. I have finished the second, and as soon as I can get a copy made, you shall have it··"

সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কর্তৃক উল্লিখিত ঘটনাটি ১৮৬০এর। ঐ সময়ে তাঁর বয়স এগারো। বালকের মনে ঐ তেজস্বী ও প্রতিভাদীপ্ত পুরুষের প্রভাব গভীর ভাবেই পড়েছিল। বহুকাল পরে, জীবনের সায়াহ্নেও, তিনি সেই ব্যক্তিটির কথা স্পষ্ট মনে রেখেছিলেন।

আর-একটি প্রতিভা বঙ্কিম। এই ঘটনার কয়েক বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় (১৮৬৪)।

শিবনাথ শাস্ত্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেয়ে বছর-দুইয়ের বড়, তিনি লিখেছেন, "দুর্গেশনন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই।·· দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল।"[৩]

তাহলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনেও ঐ রচনা যে বিস্ময় উদ্রেক করেছিল এ কথা বলা অসমীচীন সম্ভবত নয়। কেননা ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সাহিত্যের নিবিড় যোগ, এই প্রতিভাধর গ্রন্থকারের রচনা তখন সে-বাড়ির বালকদের গোচরেও অবশ্যই এসেছিল।

সাহিত্যে যেমন নবচেতনা এসেছে, সেই সঙ্গে নাট্যরচনা ও অভিনয়ের উদ্যোগ সেই সময়ে আরম্ভ হয়েছে। যদিও ১৮৭২ সালের পূর্বে বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তবুও এর পূর্ববর্তী কালে শখের নাট্যশালা ছিল এবং সেখানে বিশিষ্ট নাটক অভিনীত হত। এর মধ্যে, বেলগাছিয়া নাট্যশালার কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক এখানে অভিনীত হয় (১৮৫৯)। এবং এই নাট্যশালার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই জন্যে যে, এরই কল্যাণে বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব সম্ভব হয়।

চারদিকে হাওয়াই অনুকূল। এই হাওয়ার মধ্যে বড় হতে হতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনের বাসনা ও কামনা জাগ্রত হতে থাকে, এবং তিনি কর্মে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন।

চতুর্দিকের কর্মের যজ্ঞ প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে, এই যজ্ঞের আহুতি রূপে

নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যে ব্যাকুলতা জাগে কেবল কাজের মানুষেরই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আমরা কাজের মানুষ রূপে দেখেছি, এইজন্যে এই যজ্ঞধূমে তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন না করে এই যজ্ঞাগ্নির উত্তাপে তিনি নিজেকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন।

১ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'
২ রাজনারায়ণ বসু, 'সেকাল আর একাল'
৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'
৪ নগেন্দ্রনাথ সোম, 'মধুস্মৃতি', পরিশিষ্ট

পারিবারিক পরিবেশে

দুই প্রকোষ্ঠে সম্পূর্ণ বিভক্ত ছিল ঠাকুরবাড়ি— বাহির-মহল ও অন্তঃপুর।

বাহির-মহলে সম্মুখের বারান্দা, দক্ষিণের বারান্দা, স্কুলঘরের বারান্দা, স্কুলঘর বা পড়ার ঘর, খড়খড়ে-দেওয়া বারান্দা, চাকরদের ঘর বা তোষাখানা, কাছারিঘর ও দফতরখানা, তেতলার (পিতা দেবেন্দ্রনাথের) ঘর ও বারান্দা, তেতলার ছাদ।

অন্তঃপুরে উঠোনঘেরা বারান্দা, ভিতরের ছাদ, ভিতরের বাগান, ঢেঁকিঘর, গোলাবাড়ি, পুকুর ও বটগাছ, উঠান, দালান।

এবং পাশের বাড়ি— বৈঠকখানাবাড়ি গুণেন্দ্রনাথের বাড়ি, বারান্দা ও বাগান।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে গৃহের বিভাগ ও বর্ণনা এইভাবে ক'রে এই সুবৃহৎ গৃহটির নীরব মর্মবাণী ব্যক্ত করেছেনে।

এ গৃহে রবীন্দ্রনাথের আগমনের বারো বৎসর পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আগমন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় বছর-তিন আগে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু। প্রিন্স দ্বারকানাথের এই নূতন পৌত্রটি যখন এ গৃহে ভূমিষ্ঠ হলেন, তখনও এ গৃহ থেকে রাজসিক বৈভব সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয় নি। যদিও দ্বারকানাথের মৃত্যুর তিন বছর আগে, অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্মের ছয় বছর আগে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র বিষয়বাসনা জলাঞ্জলি দিয়ে নূতন ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর (৭ই পৌষ ১৭৬৫ শক) দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। "এত ঐশ্বর্য্যের প্রভু হইয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা করিত না। সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া একা একা বেড়াইবার ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল।"[১] দেবেন্দ্রনাথের মনের অবস্থা যখন এইরূপ তখন, মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে (১৮৪৬) বিলাত থেকে তাঁর পিতা তার এই উদাসীনতার জন্য তিরস্কার করে তাঁকে পত্র[২] দেন। কিন্তু পুত্রকে সংশোধন করার আগেই তিনি লোকান্তরিত হন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নানারূপ বিত্তে ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এক উদাসীন রাজগৃহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আগমন। যখন পুরাতন ঐশ্বর্যও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত

হয় নি, এবং নূতন কৃচ্ছ্রসাধনাও পূর্ণভাবে আরম্ভ হয় নি এমনি এক নূতন সংসারে তাঁর আবির্ভাব।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বাদশাহী আমলও গত হয় নি ইংরেজি আমলও সম্পূর্ণভাবে আগত হয় নি "দুইটি বিভিন্ন সভ্যতা বঙ্গদেশকে দুই দিক হইতে যখন এইরূপ আঘাত করিতেছে" সেই সময় জন্মগ্রহণ করে দুই রকমই দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছে। এখানে পুনরায় আমরা দেখছি আরও দুইটি রকম— এই দুইটির নাম দেওয়া যেতে পারে বাদশাহী ও দরবেশী। প্রিন্স দ্বারকানাথ নিজের দিক থেকে ছিলেন বস্তুত একজন বাদশাহ, এবং তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বিষয়বিলাসে অনাসক্ত একজন দরবেশ— কেবল নদীপথে ও পর্বতপ্রদেশে ভ্রমণ করাতেই তাঁর আসক্তি।

এই উভয়বিধ অবস্থা মিলিয়ে বলা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেন এসে পৌঁছলেন সমাজ ও সংসারের এক অভিনব চৌরাস্তার ধারে। এখানে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি প্রসারিত হল চতুর্দিকে। কোনো সংস্কার বা সংকীর্ণতা এক্ষেত্রে থাকার কথা না। দৃষ্টির পথে বাধা না থাকলে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয় না। বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে এসে চরিত্রেও বৈচিত্র্য দেখা দেওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু এই পরিবেশ পেলেই যে এই বৈচিত্র্যের অধিকারী হওয়া যাবে, এটা অবশ্য কোনো নিয়ম নয়: একই সময়ে বা একই দিনে জন্মালেই সকলে রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপীয়ার হয় না। তার কারণ, রবীন্দ্র-জবানীতে বলা যায়, 'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে'। ফুল-ফোটাবার জন্যে বিশেষ যে-শক্তির দরকার তা থাকা চাই, এবং সেই সঙ্গে যদি উপযুক্ত জল ও মাটি ও আলো পাওয়া গেল তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

এই শক্তির অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এবং ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে পেয়েছিলেন উপযুক্ত জল-আলো-মাটি-বাতাস।

১৮২৮ সালের ২০ অগস্ট চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে রাজা রামমোহন রায় নূতন ধর্মের মন্ত্র উচ্চারণ করে যান। রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ উত্তরকালে উক্ত ধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। "শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম।"[৩]

রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন; দ্বারকানাথ রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হন নি। কিন্তু তাঁর পুত্র হয়েছিলেন। সম্ভবত এ-ব্যাপারে অপরের সহায়তাও ছিল। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমাদের বাড়িতে [রামচন্দ্র] বিদ্যাবাগীশ সাহস করিয়া আমাকে পড়াইতে পারিতেন না, যে-হেতুক, আমার পিতার একটি কথা শুনিয়া তিনি ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাবাগীশের প্রতি এক দিন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, 'আমি তো বিদ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়া জানিতাম; কিন্তু এখন দেখি যে, তিনি দেবেন্দ্রের কানে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ করিতেছেন। একে তার বিষয়বুদ্ধি অল্প— এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আর বিষয়কর্মে কিছুই মনোযোগ দেয় না'।"*

এখানে একটি কথার উল্লেখ সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যে-মন্ত্র কানে গেলে পুত্র খারাপ হবে বলে তিনি অভিমত দিয়েছেন, এবং নিজে যে মন্ত্রের প্রভাব থেকে দূরে ছিলেন, সেই মন্ত্রের পীঠস্থান ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করেছেন দ্বারকানাথ। রামমোহন ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৩৩ সালে, দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হন ১৮৪৩ সালে, দীক্ষিত হয়ে তিনি সমাজের কর্ণধার হলেন। রামমোহনের অনুপস্থিতি ও দেহান্তর এবং দেবেন্দ্রনাথের, তাঁর আত্মজীবনীর ভাষায়, 'ব্রাহ্মসমাজ অধিকার'— এই সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা পেয়েছিল দ্বারকানাথের সহায়তায়। তাঁর অর্থসাহায্যে এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বেদান্তজ্ঞানের ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগের ফলেই ব্রাহ্মসমাজ টিকে থাকে। ১৮৩৮ সাল থেকে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্ পাঠ আরম্ভ করেন। তখনও ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে তিনি আসেন নি। দ্বারকানাথ যদি অর্থসাহায্য ও তত্ত্বাবধান না করতেন তাহলে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথও কিছু জানতে পারতেন কিনা সন্দেহ। উপনিষদের রসে সিক্ত হয়ে ১৮৩৯ সালের ৬ অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ একটি সভা স্থাপন করেন, নাম দেন তত্ত্ববোধিনী সভা। এই ঘটনার বছর-খানেকের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। এই বৎসরই (১৮৪০) তিনি স্থাপনা করেন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, উদ্দেশ্য "ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মকে পৈতৃক ধর্মরূপে গ্রহণ— এই সকল সাংঘাতিক ঘটনা নিবারণ করা, বঙ্গভাষায়

বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ করিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয়প্রকার শিক্ষা প্রদান করা।"[৫]

১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়। সম্পাদক নিযুক্ত হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। নিজেকে পত্রিকা সম্পাদনার উপযোগী করে তোলার জন্যে তিনি কিছুদিন মেডিকাল কলেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে প্রাণতত্ত্ববিদ্যা রসায়নবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন এই গৃহে আগমন করলেন, তখন গৃহটি জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যসাধনার একটি কেন্দ্রে পরিণত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয়েছে বলে মনে হয় না। কেননা, সৎসাহিত্য প্রচারে এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

গৃহটি তখন সাহিত্যিক আবহাওয়ায় ভারাক্রান্ত। সাহিত্যিকদের বৈঠক এবং আলোচনা নিয়ত চলেছে, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে আলোচনার শেষ নাই। বাংলাদেশের সাহিত্য-মহারথীরা ক্রমশ তত্ত্ববোধিনীকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ মনীষীবৃন্দ এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন। বাড়িটি তখন কেবল ঐ আলোচনাতেই মুখরিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বঙ্গসাহিত্যের একজন অকৃত্রিম সেবক ; সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রভাবও পরিবারে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে।

তার উপর আর-একটি দিকও আছে। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর থেকে ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরবাড়ির একটি অঙ্গ হয়ে পড়ে। এই সমাজের যাবতীয় অনুষ্ঠান এই পরিবারের পারিবারিক অনুষ্ঠানেই পরিণত হয়। উপনিষদ্ ও বেদান্তের আলোচনা এই গৃহেরই প্রকোষ্ঠে-প্রকোষ্ঠে অনুষ্ঠিত হয়।

এই পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনের বনিয়াদ কিভাবে গ্রথিত হয়েছিল বুঝতে অসুবিধা হয় না।

শৈশবে মনের উপর যে প্রভাব পড়ে, তা সহজে মুছে যায় না। শৈশবের

এই ঐশ্বর্য তিনি লাভ করেছিলেন বলেই সেই মূলধন নিয়োগ করে উত্তরকালে নিজেকে তিনি বিবিধ দুরূহ কাজে নিয়োগ করতে সক্ষম হন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে জ্ঞানচর্চার অনুষ্ঠান হৃদয়মন দিয়ে দেখার সুযোগ তিনি পেয়েছেন নিতান্ত শিশুকাল থেকে। এইভাবে একে-একে দিন গত হয়েছে, অবশেষে দেবেন্দ্রনাথের সহায়তায় আর-একটি পত্রিকা প্রকাশিত হল ১৮৬১ সালে— ইণ্ডিয়ান মিরর। কেশবচন্দ্র সেন ও মনোমোহন ঘোষ মিলিত হয়ে এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। ঠাকুরপরিবারের, তথা দেবেন্দ্রনাথের, সঙ্গে এই দুইজনের পরিচয় খুব নিবিড়। উভয়েই দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সুহৃৎ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, "পিতৃদেবের অর্থসাহায্যে ইণ্ডিয়ান মিরর নামক একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র বাহির করেন। মনোমোহনই তাহার প্রথম সম্পাদক হয়েন।"

মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগ অনেক দিনের। এই গৃহে থেকেই তিনি পড়াশুনা করেছিলেন। এমনকি তিনি এই গৃহেরই একজন-রূপে গণ্য হয়েছিলেন। মনোমোহন এই গৃহ ছেড়ে বিলাত যাওয়ার পরেও অনেক দিন যে ঘরটিতে তিনি থাকতেন সেই ঘরটি মনোমোহনের ঘর বলেই উল্লিখিত হত। আর, কেশবচন্দ্রের যোগাযোগ হয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের দ্বারা। ১৮৫৭ সালে। যুবক কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতায় ও ধর্মানুরাগে মুগ্ধ হয়ে পর বৎসর দেবেন্দ্রনাথ এই যুবককে তাঁর শিষ্যদলের মধ্যে গ্রহণ করেন।

অবশেষে এই দুই নবযুবকের উৎসাহে উদ্যোগে ও জ্ঞানস্পৃহায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি উক্ত পত্রিকা প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করে তাঁদের কার্যে সহায়তা করেন।

গুণগ্রাহিতার পীঠস্থান এবং কর্মের যজ্ঞশালা— সংক্ষেপে সেকালের ঠাকুর-বাড়ির এইরূপ পরিচয় হয়তো দেওয়া যায়। সে বাড়ির সন্তানেরা তাদের চোখের সম্মুখে এইসব মহৎ দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়ে নিজেদের উপযুক্ত রূপে গঠনে মনোযোগী হবে বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

আরও নূতন নূতন ঘটনাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘটতে তখন দেখেছেন সমাজে ও সংসারে। তার প্রভাবও বালক-মনে বিশেষ ভাবে কাজ করেছে।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন— এ-ঘটনা সে-আমলের সমাজের একটি অতিবৃহৎ ও মর্মান্তিক ঘটনা, এর দ্বারা সকলের মনই আলোড়িত ও আন্দোলিত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের তিন পুত্র কন্যা— দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ও সৌদামিনী— ইতিপূর্বে হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে পরিণীত হয়েছেন, তার পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম-অনুমোদিত নূতন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি রচনা করেন, এবং এই নূতন পদ্ধতি অনুসারে ১৮৬১ সালে তাঁর কন্যা সুকুমারীর বিবাহ দেন। এর দ্বারা জ্ঞাতিগণ বিশেষরূপে তাঁর উপর ক্ষুণ্ণ হন। পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরবর্তী কন্যা এই সুকুমারী।

সমাজে ও সংসারে তখন সবই নূতন। বাংলা ভাষাকেও নূতন বলতে হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষায় নবজীবন সঞ্চারের জন্যে তখন লেখনীধারণ করেছেন। এঁরা দুজনেই সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃতানুরাগী, তাই এঁদের হাতে বাংলা ভাষা সংস্কৃতবহুল শব্দের দ্বারা অলংকৃত হল। এই ভাষা নিয়ে সে-আমলে অনেক ব্যঙ্গবিদ্রূপও হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "আক্ষয়বাবু যখন সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া 'জিগীষা' 'জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ন করিলেন তখন আমরা কলিকাতায় যে-কোনো শিক্ষিত লোকের বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম 'জিগীষা' 'জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দের সহিত 'চিট্‌টীমিষা' শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে।"[৬]

নূতন-কিছু করতে গেলেই এ-রূপ ব্যঙ্গবিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হয়। মধুসূদন দত্ত বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে -ইয়া -ইল প্রত্যয় যুক্ত করে ক্রিয়া রূপে ব্যবহার করে সার্থক কাব্য রচনা করেও নিষ্কৃতি পান নি, তাঁকে ব্যঙ্গ করেও সে আমলে লিখিত হয়েছিল

টেবিলিল সূত্রধর, কাপড়িল তাঁতি

কিন্তু বিদ্রূপাত্মক এই ছত্রটিই এখন বিদ্রূপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাই হোক, ভাষায় এই সংস্কৃতবাহুল্য পরিত্যাগ করা যায় কি না তার পরীক্ষার জন্যেও তখন চেষ্টা হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ও রাধানাথ সিকদার (১৮১৩-১৮৭০) উভয়ে মিলে ১৮৫৭-৫৮ সালে 'মাসিক

পত্রিকা' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন, উদ্দেশ্য— লোকপ্রচলিত সহজ বাংলাতে রচনা প্রকাশ করা। পত্রিকাটি তখন বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই প্যারিচাঁদ মিত্র প্রকাশ করলেন তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'— টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে।

প্যারীচাঁদের কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন। অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্যারীচাঁদের অন্তরঙ্গতা ছিল।

ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যাঁরা আকণ্ঠ নিমগ্ন, তাঁদের সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য ঘটেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। পরিবারের লোকেরাও তখন সাহিত্যসাধনায় মগ্ন— দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ এবং গণেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই কাব্যরচনায় সংগীতরচনায় তত্ত্বালোচনায় নাট্যপ্রণয়নে ও ইতিহাসরচনায় ব্যস্ত। "বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোট ডেস্‌ক লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ [গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৭৫] লিখিতেছিলেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ববিকাশের পক্ষে বসন্তবাতাসের মত কাজ করিত। বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে।"[১] এই আবহাওয়ার সঙ্গে আরও একটি অত্যাবশ্যক জিনিস ছিল যার নাম দেওয়া যায়— অন্তরঙ্গতা। "তখনকার দিনে মজলিস বলিয়া একটা পদার্থ ছিল•• পরস্পরের মেলামেশাটা তখন খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, সুতরাং মজলিস তখনকার কালের একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী।•• হাসি ও গল্পে বারান্দা ও বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া থাকিত।"[২]

দিনরাত্রি বাড়িতে সাহিত্যের হাওয়া বয়ে চলেছে। সাহিত্যের প্রতি যেমন, ললিতকলায় ও নাট্য-আন্দোলনেও তেমনি অনুরাগ। আমোদ-প্রমোদে মুখরিত এই ঠাকুরবাড়ি এবং ঐ বৈঠকখানাবাড়ি; বৈঠকখানাবাড়ি অর্থাৎ যে বাড়ির অধিবাসী তখন দেবেন্দ্র-অনুজ গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ।

গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায়-সমবয়সী ছিলেন। একসঙ্গে খেলাধুলা ও লেখাপড়া করতেন। "আমরা দুইজনে যেন হরিহরাত্মা ছিলাম।"[৩] পাশাপাশি দুই বাড়ি— এ-বাড়ি আর ও-বাড়ি। বন্ধুবান্ধব নিয়ে কেবল আড্ডা

বসত। গুণেন্দ্রনাথের মাথা ছিল খুব উর্বর— বড় বড় কল্পনায় খুব ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ কল্পনাই উবে যেত, কাজে কিছুই পরিণত হত না। "তবুও ওরই মধ্যে আমি একটু কেজো ছিলাম, কল্পনাকে জুড়াইতে না দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যাইতাম।" একদিন তাঁদের আড্ডায় কথা উঠল যে, বাংলায় এক্‌স্ট্রাভ্যাগাঞ্জা নাট্য নাই। অমনি পুরাতন 'সংবাদ-প্রভাকর' থেকে কতকগুলি মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিয়ে একটা অদ্ভুত নাট্য রচনা করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে এ-বিষয় বিস্তারিত বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথও এই নাট্যের কথা উল্লেখ করেছেন; তিনি তখন ছোট, ওসব ব্যাপার বড়দের। বড় ও ছোটর মধ্যে তখন কেবল বেড়া নয়, একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর বিদ্যমান। ছোটরা তাই তফাত থেকে উদ্‌বৃত্ত আনন্দলাভের চেষ্টায় রত, "আমরা এ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানলার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম।... গানের এক অংশ এখনও মনে আছে—

ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না,
বলছ, বঁধু, কিসের ঝোঁকে—
ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা, হাসবে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ, হাসবে লোকে।[৮]

এত বড়ো হাসির কথাটা যে কি তাহা আজ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই।"[৭]

এখানে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ ভ্রমক্রমে নাট্যটি বড়দাদার রচিত বলে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু যে বাড়ির পিতা রাশভারি, সে গৃহে এ রূপ আমোদ-আহ্লাদ কি ভাবে সম্ভব? দেবেন্দ্রনাথ রাশভারি ছিলেন অবশ্যই, তিনি যখন বাড়িতে থাকতেন বাড়ি গম্‌গম্ করত, কিন্তু বিশুদ্ধ আনন্দের তিনি বিরোধী ছিলেন না। বিশুদ্ধ সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল নিবিড়। আদিব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তী ঠাকুরবাড়ির বেতনভুক গায়ক ছিলেন। মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যার পর দেবেন্দ্রনাথ বিষ্ণুর গান শুনতেন। এবং ভালো ভালো গায়ককে আশ্রয় দিতেন। তাঁদের মধ্যে রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুভট্ট, শান্তিপুরের জমিদার



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর



দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ

মতিবাবুর ভ্রাতা রাজচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেক ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন, এ কাজে তাঁদের হাতেখড়ি হয় এইসব ওস্তাদের গান ভেঙে ভেঙেই।

সংকাজে পিতার কাছ থেকে এইভাবে উৎসাহ পেয়ে এসেছেন তাঁরা। এইজন্যেই সংকার্যসাধনে তাঁদের মধ্যে প্রেরণা এসেছে।

কেউ কোনোরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারলেই দেবেন্দ্রনাথ তাকে উৎসাহিত করেছেন। বাড়ির ছোটদের সকলকে ব্রাহ্মধর্মের শ্লোকপাঠ-অভ্যাস তিনি করাতেন, অল্পবয়সে কেউ উপনিষদের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না জেনেই এর কোনো ব্যাখ্যা না করে কেবল শ্লোক-অভ্যাস করানো হত— যাতে উত্তরকালে এর দ্বারা সুফল লাভ হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ রোজ সকালে ব্রাহ্মধর্ম পাঠ করতেন। এইভাবে কিছুদিন চলার পরে "ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষার জন্য আমাদের বাড়ির পূজার দালানে একটি ছোটখাট পাঠশালাও খোলা হয়। এই পাঠশালায় বাহিরের চারি-পাঁচ জন বিদ্যালয়ের ছাত্রও ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা করিতে আসিত। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশি ব্রাহ্মধর্ম পাঠ করাইতেন, শ্লোকের ব্যাখ্যাও করিতেন। রীতিমত পরীক্ষাও হইত। আমার বাল্যবন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করায় পিতৃদেব একখানা বাঁধানো ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ তাঁহাকে স্বহস্তে পুরস্কার দেন।"* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই কথা বলেছেন।

পিতার কাছ থেকে নিয়মানুবর্তিতা দানশীলতা অতিথিবাৎসল্য অধ্যয়ন-স্পৃহা স্বাস্থ্যানুশীলন প্রভৃতি বিবিধ কর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে জীবনের যাত্রা আরম্ভ হয়। তাঁর কাছ থেকে সংগুণ লাভের সুযোগ তাঁর ঘটে। যে কথা রবীন্দ্রনাথ বহুদিন বাদে লিখেছেন—

আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে ••

দেবেন্দ্রনাথ যেন পুত্রদের জীবনে অনুরূপ প্রেরণা আনয়ন করার জন্যেই তাঁর জীবনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও চালনা করেছিলেন। ঐশ্বর্যকে জীবনের সার বলে গ্রহণ না করে জ্ঞানচর্চার দ্বারা জীবনকে ঐশ্বর্যশালী করার জন্যেই আত্মমন্ত্রে তিনি নিজেকে দীক্ষিত করেন, এবং ভোগবিলাস থেকে সকলকে নিবৃত্ত রাখার জন্যই প্রত্যেককে কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্যে বাস করতে অভ্যস্ত করান।

প্রিন্স দ্বারকানাথের সংসারে কিছু নেই-নেই করেও যা ছিল, তা সামান্য নয়। সেই ঐশ্বর্য যথেচ্ছভাবে হয়তো ব্যবহার করা যেত। কিন্তু তাতে লাভ কতটুকু হত হিসেব করা কঠিন নয়— তাতে দ্বারকানাথের নাতিরা এক এক জন ধনীনন্দন হতে পারতেন, কিন্তু স্বনামধন্য হতে পারতেন কি না সন্দেহ।

পরিবারের প্রভাবই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রভাব। এই পরিবারটি এককালে বঙ্গদেশের একটি আদর্শ পরিবার রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। সমাজসংস্কারের বা নবযুগ' প্রতিষ্ঠার বহুবিধ উদ্যোগ এই গৃহ থেকে হয়। বাইরে এই পরিবারের কর্তা দেবেন্দ্রনাথকে রক্ষণশীল বলে মনে হয়, কিন্তু দেশের হাওয়ার সঙ্গে চলার এবং সকলকে চালাবার শক্তি তাঁর ছিল। এর দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী একদিকে, অপর দিকে সৌদামিনী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এবং স্বর্ণকুমারী সরলা-দেবী (১৮৭২-১৯৪৫) তাঁদের জীবনের শেষ দিকে সে আমলের পারিবারিক পরিবেশের যে স্মৃতিকথা রেখে গিয়েছেন, আমরা তার থেকে সে সময়ের একটা চিত্র পেতে পারি।

ঠাকুরবাড়ি একটি বৃহৎ পরিবার। সেই পরিবার সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী-তনয়া সরলাদেবী লিখেছেন, "প্রতি মহলে মহলে ঘরে ঘরে লোক। কর্তাদাদা মহাশয়ের [দেবেন্দ্রনাথের] ছেলেমেয়ে, জামাই-বউ, নাতি-নাতনি, দাস-দাসীতে বাড়ি ভরা। যে বাড়ির রান্নাঘরে দশ-বারো জন বামুনঠাকুর ভোর থেকে রান্না চড়ায়। যে প্রকাণ্ড রান্নাঘরের দু-পাশে দু ভাগ করা মেঝেতে পরিষ্কার কাপড় পেতে ভাত ঢালা হয়, যে ভাত স্তূপাকার হয়ে প্রায় কড়িকাঠ স্পর্শ করে। তারই পরিমাণে ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করে দিনে সেই ভাত-ব্যঞ্জন ও রাত্রে লুচি-তরকারি লোক গুনে-গুনে পাথরের থালাবাটিতে সাজিয়ে মহলে-মহলে ঘরে-ঘরে দিয়ে আসে বামুনেরা।"[১০] এর থেকে পরিবারের আয়তন সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করা যেতে পারে। এই পরিবার চালনা যিনি করেছেন তাঁকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই সে কাজ সম্পাদন করতে হয়েছে। এ হল ভোজের আয়োজনের কথা, কিন্তু মানসিক আহারের কথা নয়, সে আহার জোগানোর বন্দোবস্তও ছিল, "সকাল বেলায় ৭টার সময় ঘণ্টা বাজে দালানে উপসনায় যাওয়ার জন্যে। বউঝিয়েরা বিবাহের সময় উপার্জিত স্ব স্ব চেলি

পরে সেখানে যান।"[১০] এইভাবে উপাসনা করে ও উপদেশ লাভ করে জীবনের দিক নির্ণয় করার সুবিধা হয়ে থাকে। এর থেকে নিজ আত্মোন্নতির জন্যে যিনি সার সংগ্রহ করে নিতে পারেন তাঁরই লাভ— এটা নির্ভর করে নিজের রুচি ও অভিপ্রায়ের উপর। ফুলে মধু থাকে, মৌমাছি তা থেকে মধুসঞ্চয় করে, কিন্তু উর্ণনাভ সঞ্চয় করে হলাহল।

এই বৃহৎ পরিবার নিয়ে সাধারণ মানুষ স্থাণুবৎ হয়ে পড়ে, যাকে বলে রাঁধা খাওয়া শোয়া— এই নিয়েই জীবন ও সময় কেটে যাওয়ার কথা। এর মধ্যে নূতন প্রাণ ও নূতন চেতনা দেওয়ার চেষ্টাটা সাধারণ কাজ নয়। সেই অসাধারণ শক্তির রশ্মি পুত্রদের মধ্যে বিতরণ করেছেন দেবেন্দ্রনাথ। বিলাসের দ্বারাই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়, সদ্‌গুণের হানি ঘটে, এই সার কথাটা জেনেছিলেন বলেই তিনি বিলাসের লেশমাত্র ভোগ করতে দেন নি কাউকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে জানিয়েছেন শিশুকালে তাঁদের জন্যে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বললেই হয়। তখনকার জীবনযাত্রা সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখলে এখনকার কাল লজ্জায় তার সঙ্গে সকলপ্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করতে চাইবে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। আরও বলেছেন, আহারে শৌখিনতার নাম-গন্ধও ছিল না, কাপড়চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলেদের চক্ষে তার তালিকা ধরলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে।

এই সাধারণ আয়োজনের মধ্যে জীবনযাপন করে চলেছিল ঠাকুরবাড়ির পুত্রকন্যারা।

পুত্রেরা তবু কিঞ্চিৎ মুক্ত, কিন্তু গৃহের প্রথা অনুসারে বাড়িটা যেন একটি অবরুদ্ধ হারেম। প্রকাশ্য-আলোকে মেয়েদের বাহির হওয়ার নিয়ম নাই। এ সম্বন্ধে আমরা স্বর্ণকুমারী দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি "তখন অন্তঃপুরে অবরোধ-প্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখনো মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ বাড়ি হইতে ও বাড়ি যাইতে হইলে ঘেটাটোপ মোড়া পাল্‌কীর সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখনো নিতান্ত অনুনয়বিনয়ে মা গঙ্গাস্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে বেহারারা পাল্‌কী শুদ্ধ তাঁহাকে জলে চুবাইয়া আনে।"[১১]

এই অবরোধ-প্রথার মধ্যে পরিবারের বধূ ও কন্যাদের জীবনযাপন চলেছে।

ব্যাপারটা অনেকটা যেন এইরূপ যে, বাইরের আলো বা বাতাসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এইরূপ একটি নিভৃত নিকেতনের ভিতরে পূর্ণ অন্ধকার বিরাজ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাইরের আলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ না রেখেও অন্তঃপুরকে কিঞ্চিৎ আলোর আভাস দান করার ব্যবস্থা অবশ্য ছিল বলে জানতে পারা যায়। এ ব্যবস্থা সবসময় অপরের দ্বারা আরোপ করা অবশ্য নয়, পুরন্ধ্রীদের দ্বারাই অর্জিত। স্বর্ণকুমারী দেবী জানিয়েছেন[১১] যে এই পরিবারের কেউই মূর্খ ছিলেন না, বরঞ্চ এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যাবতী বলে আদরণীয়াও ছিলেন। আহার বিরাম পূজা অর্চনা যেমন দৈনন্দিন অনুষ্ঠান ছিল, অন্তঃপুরে লেখাপড়াও মেয়েদের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া বলে গণ্য হত।

প্রত্যহ সকালবেলা গয়লানী যেমন দুধ নিয়ে আসত, মালিনী ফুল নিয়ে, তেমনি অন্তঃপুরে বৈষ্ণবী ঠাকুরানী আসতেন বিদ্যাবিতরণের জন্যে। স্বর্ণকুমারীর "ভাগ্যে বৈষ্ণবী ঠাকুরানীর দর্শনলাভ ঘটে নাই", কিন্তু তাঁর থেকে ছয়-সাত বছরের বড় নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বৈষ্ণবীর সাক্ষাৎ ঘটেছে "আমার শৈশবকালে দেখিতাম একজন তিলককাটা বৈষ্ণবী ঠাকরুন আমাদের অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতে আসতেন"[৯] ; এবং জ্যেষ্ঠাভগিনী সৌদামিনীর প্রথম শিক্ষা এই বৈষ্ণবীর নিকটেই "আমাদের প্রথম শিক্ষা একজন বৈষ্ণবীর নিকট হইতে। তাহার কাছে শিশুপাঠ পড়িতাম, এবং কলাপাতে চিঠিলেখা অভ্যাস করিতাম। ক্রমে তাহার কাছে রামায়ণ পড়া পর্যন্ত আমাদের অগ্রসর হইয়াছিল।"[১২]

মেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্যে এইরূপ বৈষ্ণবী নিয়োগ করেই যদি কর্তব্য শেষ করা হত তাহলে তাতে ক্ষোভ করার কিছু হয়তো ছিল না সেকালে। কিন্তু এই গৃহটি সেকালের অন্যান্য সাধারণ গৃহ থেকে কিছু স্বতন্ত্রই ছিল। সেই স্বাতন্ত্র্যটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন ভীষণ ছিল যে, গৃহটি তখন আত্মীয়স্বজন কর্তৃক একঘরে করে রাখবার মত অবস্থায় ছিল। এই জন্যে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে জামাইদের ঘরজামাই করে পর্যন্ত রাখতে হত, কেননা এ গৃহের কন্যার পাণিগ্রহণ করলে সে ছেলেকে নিজ গৃহে প্রবেশের আশা ছাড়তে হত। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর সেকালের শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে

বলেছেন, "আমার পাঁচজন ননদের মধ্যে একজন ছাড়া সকলেই ঘরজামাই ছিলেন। ননদাইরা প্রায় সবাই কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে। হয়ত কলকাতায় পড়তে এসেছেন, সুন্দর ছেলে দেখে ওঁরা ধরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। একজনের বাপ গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ছেলেকে শাপ দিয়েছিলেন বলে শুনেছি।"[১৩]

এই ঘটনাটি আজ আমরা কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করতে পারি। বাইরের সমাজ কর্তৃক পরিবর্জিত অবরোধে অবরুদ্ধ এই গৃহটি নিভৃতে নিজের মনে বয়ে চলেছে কালের স্রোতের সঙ্গে।

বুকে যথেষ্ট সাহস ও আত্মবিশ্বাসে অটল না হলে এইভাবে সংসার চালিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন। যা নূতন এই গৃহ থেকে তারই উৎপত্তি, সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে এ জিনিসটি সহ্য করা সহজ ছিল না। কিন্তু যা সহজ ছিল তাই করেছিল সে সমাজ। পুত্র এই গৃহের কন্যাকে বিবাহ করেছে বলে সেই পুত্রের পিতা এসে অদূরে দাঁড়িয়ে অভিসম্পাত দিচ্ছেন।

বৈষ্ণবী ঠাকরুনের কাছেই মেয়েদের লেখাপড়া চলেছে, অতঃপর গৃহের অভিভাবক মৃদুগতিতে আর-এক ধাপ অগ্রসর হলেন। কেশবচন্দ্র সেনের অন্তঃপুরে মিশনারি মেয়েরা পড়াতে আসতেন। দেবেন্দ্রনাথ সিমলা পাহাড় থেকে ফিরে এসে [১৮৫৮ নবেম্বর ১৫] বাড়ির মেয়েদের জন্যে উক্ত মিশনারিদের নিযুক্ত করলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "পিতৃদেব স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন·· মিস গোমিস প্রভৃতি খ্রীষ্টান মেমেরা বাঙ্গালা শিখাইতে আসিতেন।"[৯]

অন্তঃপুরে কোনো বাহিরের পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কঠোর অবরোধ-প্রথা। কিন্তু ভিতরে ক্রমে ক্রমে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা চলেছে।

বাহিরের পূজার দালানে অযোধ্যানাথ পাকড়াশি ছেলেদের জন্যে পাঠশালা পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন। অবশেষে তিনি প্রবেশাধিকার পেলেন অন্তঃপুরে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস ধীর ভাবে এই রূপে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছে। বাইরের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও সমাজের শাসনকে কোনোরূপে ভয় না করে এই ভাবে অগ্রগমনের স্পৃহা এর দ্বারা গৃহের সন্তানদের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে থাকে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে আছে এই অগ্রগমনের কথা, তিনি তাঁর স্মৃতি-

কথায় খ্রীষ্টান মেয়েদের দ্বারা বাঙ্গালা পাঠ অভ্যাসের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন, "তারপর পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশি আমাদের অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতেন। ইহাই বিশুদ্ধ শিক্ষা।"[৯]

বিশুদ্ধ শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছে। স্ত্রীদের মধ্যে শিক্ষা-বিতরণের উৎসাহ জেগেছে। এমন সময়ে বীটন সাহেব মেয়েদের জন্যে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এই বিদ্যালয় স্থাপনের এবং এতে মেয়েদের যোগদানের ব্যাপার নিয়ে সমাজে ব্যঙ্গবিদ্রূপের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কন্যাকে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন, সে কন্যা সৌদামিনী। সমাজের বিদ্রূপ বা লাঞ্ছনা উপেক্ষা করে, পুনরায় এরূপ একটি 'গর্হিত' কাজ করে দেশের ও দশের, বিশেষ ভাবে পরিবারের প্রত্যেকের, কাছে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন দেবেন্দ্রনাথ।

এই কাজটি করে তিনি ২৫ আষাঢ় ১৭৭৩ শক (১৮৫১) রাজনারায়ণ বসুকে পত্র দেন, "আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।"[১০]

গৃহের কন্যাদের স্কুলে পাঠিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন যেমন হল, তেমনি স্কুলে-পড়া মেয়েদের গৃহের বধূ করে এনে আর-একটি নতুন দৃষ্টান্তও সৃষ্টি করা হল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ আগেই হয়ে গিয়েছে, এর পরে অল্পকালের ব্যবধানে আর দুটি নতুন বধূ এল সংসারে, দুই সহোদরা— নীপময়ী ও প্রফুল্লময়ী — তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ দুই সহোদরের সঙ্গে পরিণীতা হয়ে।

এই দুই বধূর পিতার নাম হরদেব চট্টোপাধ্যায়, ইনি কি ভাবে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তা মনে করতে পারেন নি, কিন্তু বলেছেন, "ইনি ইংরাজি শিক্ষা একেবারেই পান নাই। সেকেলে রীতি অনুসারে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটু বাঙ্গালা ও একটু ফার্শী জানিতেন মাত্র।... যখন মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন-স্কুল খোলা হয় ইনিই সর্বাগ্রে সাহসপূর্বক তাঁহার দুই কন্যাকে বেথুন-স্কুলে পাঠাইয়া দেন। ইহার উক্ত দুই কন্যার সহিত শেষে পর পর হেমেন্দ্রনাথের ও বীরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়।"[১১]

বাড়ির আবহাওয়া চোখের সম্মুখে পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করেছে। নিত্য

নূতন আলোয় যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে পারিবারিক দিগন্তটি। এই পরিবেশের মধ্যে বাস করলে মনে নূতন চেতনারও অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। সেই চেতনার দ্বারা প্রাণমন সতেজ ও সবুজ হয়ে ওঠারই কথা।

গৃহে নূতন বধূদ্বয় এসেছেন নূতন আলো নিয়ে এবং হয়তো নূতন আশ্বাসও। এই দুই বধূর মধ্যে যিনি ছোট, অর্থাৎ বলেন্দ্রনাথের জননী প্রফুল্লময়ী, তিনি তাঁর পিতৃগৃহের ও শ্বশুরগৃহের একটি চিত্র অঙ্কিত করে গিয়েছেন, তিনি অনাবিল ভাষায় আশ্চর্য সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন সেকালের কথা[১৬]। এতে অন্যান্য বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও একটি চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, পিতৃগৃহ থেকে এই নববধূকে নিয়ে আসার এবং এ গৃহে এনে ঘোমটার আড়ালে বধূর মুখটি দেখার জন্যে এই দেবরটির সকৌতুক কৌতূহলের যেন অন্ত ছিল না। চারিদিকে নূতনের হাওয়া লেগেছে, এইজন্যে কোথায় কোন্ নূতন লুক্কায়িত আছে জানার জন্যে তাঁর মধ্যে ইতিমধ্যেই বুঝি দেখা দিয়েছে অধীরতা।

গৃহের অভ্যন্তরে হাওয়াবদলের আহ্বান এসেছে। বাহির থেকেও ডাক আসছে যেন নূতন যুগের হাওয়ারই। ১৬ নবেম্বর ১৮৬৩ তারিখে লণ্ডন থেকে স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে, স্ত্রী-স্বাধীনতার পথিকৃৎ বলে বর্তমানে স্বীকৃত, কিন্তু সেকালে নিন্দিত, সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন, "যেখানে স্ত্রীলোকদের কোন বিষয়েই কর্তৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার, ভর্তার আদেশ ও পরের বাক্যই তাহাদের জীবনের নিয়ম, সেখান হইতে শ্রীসৌভাগ্য এখনো অনেক দূর। স্ত্রীলোক জীবনউদ্যানের পুষ্প— তাহাদের বায়ু ও আলোক হইতে লইয়া কেবল ঘরের মধ্যে শীর্ণ বিশীর্ণ করিয়া রাখিলে কি মঙ্গলের সম্ভাবনা। এ দেশে সর্বদাই আমার এই প্রকার মনে হয়।"[১৭]

এর বছর-চার পরে (১৮৬৭) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের কিছুকাল, সম্ভবত জীবনের সেইটিই উৎকৃষ্টকাল, যখন তাঁর বয়স সতেরো-আঠারো, তাঁর মেজদাদার সঙ্গে বোম্বাইতে কাটান। যে ব্যক্তি দেশাচারের অন্ধ ভক্ত হতে পারে নি, যিনি স্ত্রীজাতিকে জীবনউদ্যানের পুষ্প বলে অভিহিত করেছেন, সেইরূপ উদার মনের অধিকারী সত্যেন্দ্রনাথের নিবিড় সান্নিধ্যলাভও বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের কম লাভ নয়। বিদেশের আলো-হাওয়ায় নিজেকে

অভিসিক্ত করে একটি প্রসন্ন মন নিয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন। সেই আলোর হাওয়ার স্পর্শ তিনি এই নূতন ভ্রাতাটিকে দান করেছিলেন অকৃপণ ভাবে। কেননা, তাঁরই তত্ত্বাবধানে তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যয়ন ও অনুশীলন চলেছে।

পরিশেষে আর দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে করব। সেও এই পরিবারে নূতনত্বের কথা।

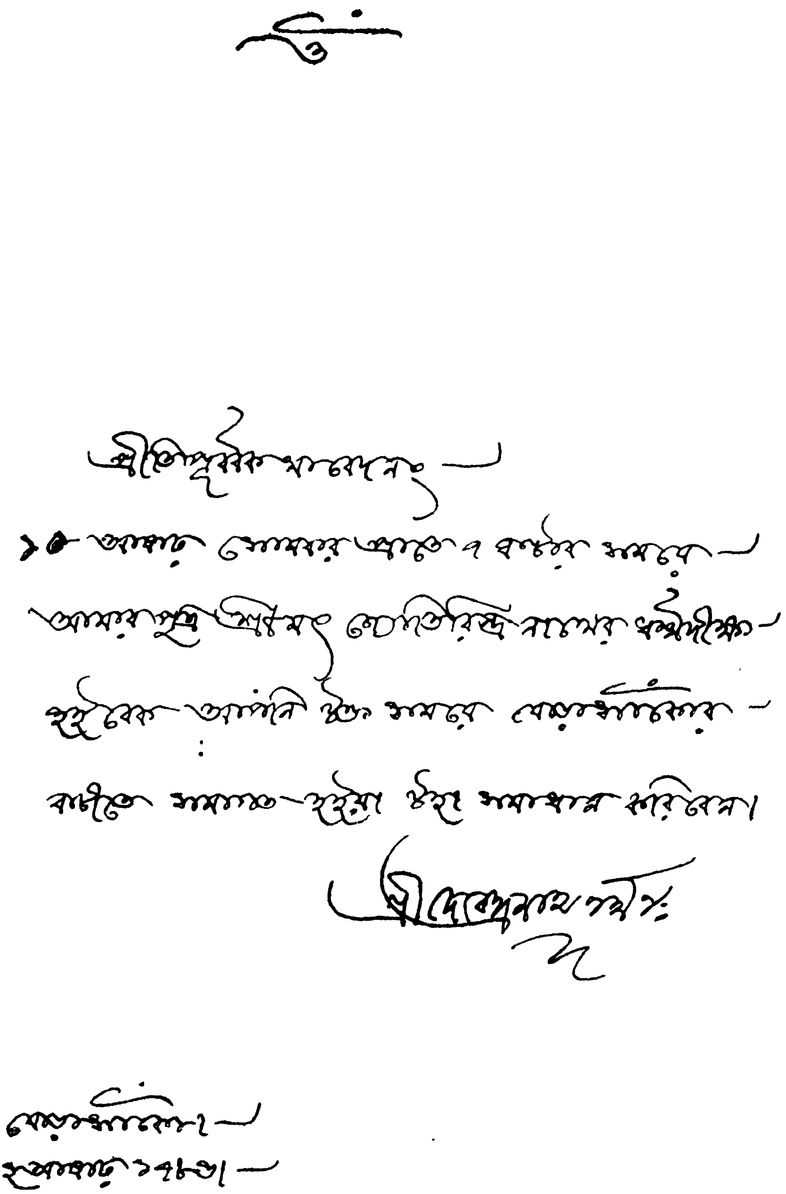
দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমল থেকে এই গৃহে দুর্গাপূজা জগদ্ধাত্রীপূজা সরস্বতীপূজা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দেবেন্দ্রনাথও এক সময়ে এমন বৃহৎ ভাবে সরস্বতীপূজা করেছিলেন যে "সেই পার্বণে শহরে গাঁদাফুল ও সন্দেশ দুর্লভ হয়ে উঠেছিল"[১৮]; অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন, পৌত্তলিকতা ত্যাগ করলেন, তবুও পূজা-অনুষ্ঠানাদি চলতে লাগল, তা স্মরণ ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, তিনি বলেছেন, "জোড়াসাঁকোর বাড়িতে খুব ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব হইত। কুমোরেরা বাড়িতেই প্রতিমানির্মাণ করিতে আসিত",[১৫] অবশেষে একদা সেই রীতি লুপ্ত হল। সৌদামিনী দেবী এ বিষয়ে জানিয়েছেন, "একবার পিতা যখন সিমলা পাহাড় হইতে হঠাৎ বাড়ি ফিরিলেন তখন বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপূজা। সেদিন বিসর্জন। তিনি বাড়িতে প্রবেশ না করিয়া ব্রাহ্মসমাজে গিয়া বসিয়া রহিলেন— বাড়ির সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কোনো প্রকারে ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হইলে তিনি ঘরে আসিলেন। তাহার পর হইতে আমাদের বাড়িতে প্রতিমা-পূজা উঠিয়া যাইতে লাগিল।"[১১]

পুরাতন প্রথা দূরীভূত হল। যে প্রতিমাকে কেন্দ্র করে বাড়ির ছেলেদের এত আনন্দ-উচ্ছলতা—"খরবাঁধা, একমাটি দোমাটি, রং দেওয়া, মুণ্ড-বসানো প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিমাখানি যখন ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিত তখন আনন্দের সীমা থাকিত না।"— এ কথাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, তাঁর জীবনস্মৃতির। সেই বালকদের চোখের সম্মুখ থেকে এই প্রথা উঠে গেল।

এল নতুন অনুষ্ঠান— মাঘোৎসব।

এই ভাবে নিত্য নবীনের আবির্ভাবের সঙ্গে চলেছে তাঁদের জীবন।

আমরা পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্র-অনুজা স্বকুমারীর বিবাহ-অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ



ওঁ

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার নিবেদনং —

১০ আষাঢ় সোমবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে — আমার পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নাথের ধর্ম্মদীক্ষা — হইবেক আপনি উক্ত সময়ে যোড়াসাঁকোর — বাটীতে সমাগত হইয়া উহা সমাধান করিবেন।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

যোড়াসাঁকো। —

৫ আষাঢ় ১৭৮৬। —

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধর্মদীক্ষা

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বেচারাম চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত দেবেন্দ্রনাথের পত্র, ১৮ জুন ১৮৬৪

করেছি। দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত নূতন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে সেই বিবাহ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনেও এমনি একটি অনুষ্ঠান ঘটে। তিনি লিখেছেন, "আমার উপনয়ন প্রচলিত প্রথা-অনুসারেই হইয়াছিল। আমার দীক্ষা ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। আমার বোধ হয়, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান।"[৯]

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোম্বাইতে কিছুকাল কাটিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর (১৮৬৮) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তাঁর জীবনে এক নবীনা আবির্ভূতা হলেন— কাদম্বরী দেবী। ইনি এলেন অভিনব রুচি নিয়ে, অসামান্য সাহিত্যবোধ নিয়ে, ও অসাধারণ মন নিয়ে। বাড়ির উপরের ছাদটাকে টবে-টবে আর ফুলে-ফুলে সাজালেন-- চামেলি গন্ধরাজ রজনীগন্ধা করবী দোলনচাঁপা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তিনি কেবল যেন সহধর্মিণী নয়, সহচরী হিসেবে এলেন। এঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে ও 'ছেলেবেলা'য় অনেক কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনারও প্রেরণাদাত্রী হলেন এই কাদম্বরী দেবী। কাদম্বরীকে কেন্দ্র করেই যেন গড়ে ওঠে ঠাকুর-বাড়ির একটি সাহিত্যচক্র। এই বধূটি এই গৃহে এনে দিলেন যেন নতুন ঋতু।

এই নবীনা সঙ্গীকে পেয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন নূতনতর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর জীবনের নব নব উদ্যমের সঙ্গী হন। এমনকি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন, স্বামীর এই শখকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে তিনিও অশ্বারোহণ করে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন উদ্যান পর্যন্ত বেড়াতে গিয়েছেন। লোকনিন্দার ভয় তিনি করেন নি। এর দ্বারা বাড়ির আবহাওয়ার মধ্যে নূতন প্রাণের সঙ্গে নবীন সাহসেরও সঞ্চার করেছিলেন।

এক অভিনব পরিবেশে লালিত ও পালিত হয়ে অবশেষে এক অভিনব জীবনসঙ্গিনী লাভ ক'রে তাঁর জীবনই অভিনব হয়ে ওঠে, এবং নিত্যনূতন অভিযানের জন্যে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন। সংসারে যা নেই তাই সৃষ্টি ক'রে তোলার প্রতি তাঁর ঝোঁক, দেখা যায়, অতি প্রবল।

এই প্রবলতাও তাঁর জীবনের সঙ্গী হয়ে ছিল বরাবর। নিত্য নতুন প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি নির্ভীক ভাবে। এসব কাজে তাঁর যেন

কোনো ক্লান্তি নেই; শ্রান্ত হয়ে পড়তে তিনি জানতেন না। চিরাচরিত কাজে তাঁকে লিপ্ত হতে বড়-একটা দেখা যায় না। তাঁর আকর্ষণ নূতনের দিকে।

তাঁর এই নতুনদাদার মেজাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে।"[১৯]

১ 'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত', চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

২ দ্র° 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী,' পত্র ১৪৫

৩ 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত', পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৪ তদেব, অষ্টম পরিচ্ছেদ

৫ তদেব, পরিশিষ্ট ১৭

৬ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', বাড়ির আবহাওয়া

৮ "শেষ ছত্র ব্যতীত গানটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত। দ্র° 'বোধেন্দুবিকাশ' ১৮৬৩।"—সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ৬৮

৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি'. প্রবাসী ১৩১৮ মাঘ

১০ সরলা দেবী, 'জীবনের ঝরাপতা'

১১ স্বর্ণকুমারী দেবী, 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার', প্রদীপ ১৩০৬ ভাদ্র

১২ সৌদামিনী দেবী, 'পিতৃস্মৃতি', প্রবাসী ১৩১৮ ফাল্গুন

১৩ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, '৺জ্ঞানদানন্দিনী দেবী', প্রবাসী ১৩৪৮ ফাল্গুন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, 'পুরাতনী'

১৪ 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী', পত্র ৩০

১৫ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'

১৬ প্রফুল্লময়ী দেবী, 'আমাদের কথা', প্রবাসী ১৩৩৭ বৈশাখ

১৭ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, 'পুরাতনী', পত্র ২

১৮ সৌদামিনী দেবী, 'পিতৃস্মৃতি', প্রবাসী ১৩১৮ চৈত্র

১৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা', অধ্যায় ১০

জাতীয়-চেতনা

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সিপাহী-বিদ্রোহই এ দেশে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম অভ্যুত্থান। "১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ" শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের এ উক্তির বিষয়েও পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রকৃতই তখন দেশের হাওয়া নূতন। দেশে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। দেশে জাতীয়তার সূত্রপাত হয়েছে। বিদেশী শাসকের অধীনে দেশের দুর্দশার বিষয় সুধীসমাজ চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। শিক্ষাবিস্তারের নানা ব্যবস্থা তখন হয়েছে, কলকতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (১৮৫৭)। যাঁরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছেন, সমাজের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হচ্ছে, দেশের লোকের মধ্যে তাঁদের কথা শিরোধার্য করার মনোভাব গড়ে উঠছে। গবর্নমেণ্টের পক্ষে এটা ভয়ের কথা, সেই জন্যে এইসব শিক্ষিতদের সরকারি চাকরি দিয়ে হাতে রাখার নীতি গবর্নমেণ্ট তখন গ্রহণ করছেন; শিক্ষিতদের মধ্যেও সরকারি চাকুরির প্রতি আকর্ষণ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু উভয়েই সরকারি চাকুরে হয়েছিলেন।

কিন্তু চাকুরি দিয়ে সকল শিক্ষিতের মন সম্পূর্ণ ক্রয় করা সম্ভব হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) রচনা করেছেন, এবং বন্দেমাতরম্ সংগীতের মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকার নবীন মূর্তি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এবং কমলাকান্তের জবানীতে তিনি দেশমাতৃকার বন্দনা করেছেন। আর, ইংরেজদের অত্যাচারে পীড়িত নীলচাষীদের নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র রচনা করলেন 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)। এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উদ্দীপনা তখন এমনই যে, মাত্র একটি রাত্রির মধ্যে এই অনুবাদ সম্পন্ন হয় (১৮৬১)।[১] মধুসূদনও তখন সরকারি কাজে নিযুক্ত— কলকতা পুলিশকোর্টের ইণ্টারপ্রিটার। রেভারেণ্ড লং সাহেবের উৎসাহে এই অনুবাদকার্য হয়, এইজন্যে লং সাহেবের অর্থদণ্ড হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার সেই অর্থ দান করেন।

ইতিপূর্বে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' প্রকাশিত হয়েছে (১৮৫৮), তাঁর সেই বিখ্যাত ছত্র-দুটি তখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে—

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়
দাসত্বশৃঙ্খল, বলো, কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়।

পরাধীনতার তিক্ততা অনুভূত হতে আরম্ভ করেছে। তখন দেশের মধ্যে দুটি বিপরীত ধারা বর্তমান— ইঙ্গবঙ্গদের ইংরেজিয়ানার উপদ্রব এবং দেশমাতৃকার সুযোগ্য সন্তানদের মধ্যে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন।

এমন সময়ে দেখা দিলেন ন্যাশনাল নবগোপাল। মহর্ষির অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত 'ন্যাশনাল পেপারে'র (প্রথম প্রকাশ ৭ আগস্ট ১৮৬৫) তিনি সম্পাদক। ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ও দেবেন্দ্রনাথের অনুষঙ্গী নবগোপাল মিত্র তখন তাঁর কর্মধারার জন্যে উক্ত নামে অভিহিত ছিলেন। জাতীয়তাবোধের দ্বারা তিনি এরূপভাবে নিজেকে জারিত করেন যে, তাঁর প্রত্যেকটি উদ্যমের সঙ্গে তিনি ন্যাশনাল-কথাটি যুক্ত করতেন। সংবাদপত্রের নাম 'ন্যাশনাল পেপার', কুস্তীর আখড়ার নাম 'ন্যাশনাল জিমনাশিয়াম', সভার নাম 'ন্যাশনাল সোসাইটি'। এইজন্যেই দেশের লোক স্নেহবশে তাঁকে ঐরূপে সম্বোধন করতেন— ন্যাশনাল নবগোপাল।

রাজনারায়ণ বসু তাঁর জীবনের সম্পাদিত কার্যের ফর্দে বলেছেন, "আমা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া নবগোপাল মিত্রের দ্বারা হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন।"[২]

রাজনারায়ণ বসু 'জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী-সভা' নামে এক সমিতি সংস্থাপন ক'রে দেশের লোকের মধ্যে জাতীয়তার বীজ উপ্ত করার ব্যবস্থা করেন, এই সভার কার্যবিবরণী অবলম্বন করে ১৮৬১ সালে তিনি 'Prospectus of a Society for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal' নামে প্রস্তাবনা-পত্র প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকা থেকেই নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা ও পরে জাতীয় সভা স্থাপনের প্রেরণা লাভ করেন।

সে সময়ে ইংরেজিয়ানার ঢেউ উঠেছে প্রবলভাবে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সব সময় সব কথায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করার দিকে প্রবল ভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এই বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করে জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী-সভার সভ্যেরা good night না বলে সুরজনী বলতেন। পয়লা জানুয়ারি তারিখে নববর্ষের

অভিনন্দন না জানিয়ে পয়লা বৈশাখ জানাতেন। বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মিশাল না দিয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলতেন। ভুলক্রমে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের শাস্তি-স্বরূপ প্রতি ইংরেজি শব্দের জন্য এক পয়সা করে জরিমানা হত।

এইভাবে জাতীয়তার নবমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হয়। দেশের জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়-চেতনা সঞ্চার করার জন্যে প্রকাশিত প্রস্তাবনা-পত্রটি পাঠ করার পর নবগোপাল মিত্র যে হিন্দুমেলা গঠন করেন সেই মেলায় সর্বপ্রথম শিক্ষিত সমাজ সমবেতভাবে স্বদেশের কথা বলার সুযোগ লাভ করেন। এই মেলা গঠনে নবগোপাল মিত্রের প্রধান সহায় ছিলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই মেলার প্রথম অধিবেশন হয় ১২৭৩ বঙ্গাব্দে চৈত্রসংক্রান্তিতে— ইংরেজি ১২ এপ্রিল ১৮৬৭। অন্যতম উদ্দেশ্য— "আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোনো বিষয়-সুখের জন্য নহে, কোনো আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য— ইহা মাতৃভূমির জন্য।"

কলকাতায় যখন এই ঘটনা ঘটছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে আমেদাবাদে ভাষা-শিক্ষায় ও সেতার-শিক্ষায় রত। এর পর সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থতার জন্য দীর্ঘদিনের ছুটি (১৬ অক্টোবর ১৮৬৭ থেকে ১৫ জুন ১৮৬৮) নিয়ে কলকাতায় আসেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে এলেন। যথাকালে চৈত্রসংক্রান্তির দিন, ১১ এপ্রিল ১৮৬৮, চৈত্রমেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র সহকারী-সম্পাদক। গণেন্দ্রনাথ ইতিহাসচর্চার জন্য খ্যাত ছিলেন, তিনি বিক্রমোর্বশী অনুবাদ করেন, এবং অনেক ব্রহ্মসংগীতও রচনা করেছেন, হিন্দুমেলার এই দ্বিতীয় অধিবেশনে গণেন্দ্রনাথের এই গানটি প্রথম গাওয়া হয়—

লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে••

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন আঠারো বৎসর বয়সের বালক। কিন্তু জ্যোতির জ্যোতি বুঝি প্রচ্ছন্ন থাকে না। ন্যাশনাল নবগোপালের চোখে তখন জাতীয়তার স্বপ্ন; তিনি সর্বক্ষণ সেই স্বপ্নে যেন বিভোর, তিনি এই সময়ে জ্যোরিন্দ্রনাথকে পেয়ে এই বালককে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্যে যেন

বদ্ধপরিকর। কিন্তু বাহির থেকে মন্ত্র আরোপ করে সেই মন্ত্র-উচ্চারণ করানোই বুঝি তাঁর উদ্দেশ্য নয়। এই বালকের মনের অভ্যন্তরে কোনো বীজ আছে কিনা, সেই বীজ অঙ্কুরিত করে পল্লবিত পুষ্পিত করা সম্ভব কিনা, এই বুঝি তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল।—

"নবগোপালবাবু দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় ভাবের কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিবাবু এ-সময়ে কবিতা লিখিতেন না, বা ইহার পূর্বেও কখন লেখেন নাই। কিন্তু ক্রমাগত অনুরুদ্ধ হওয়ায়, তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন।"*

এই কবিতাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম কবিতা। সমগ্র ভারতবর্ষকে নিজের স্বদেশ বলে স্মরণ করার মত মন তখনই তিনি অর্জন করেছেন। তাই তিনি অকুণ্ঠভাবে অঙ্কিত করতে পেরেছিলেন ভারতমাতার এই মূর্তিটি, কবিতার প্রথম দিকের কিয়দংশ উদ্‌ধৃত হল—

উদ্বোধন

জাগ জাগ জাগ সবে ভারতসন্তান !
মাকে ভুলি কত কাল রহিবে শয়ান ?
ভারতের পূর্বকীর্তি করহ স্মরণ,
রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন ?
দেখ দেখি জননীর দশা একবার,
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর, অস্থিচর্মসার ;
অধীনতা অজ্ঞানাদি রাক্ষস দুর্জয়
শুষিছে শোণিত তাঁর বিদরি হৃদয় ;
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড,
সর্বাঙ্গসুন্দর দেহ করে খণ্ডখণ্ড !
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে ?
যে-জননী পয়ঃ-সুধা শত নদী ধারে
পিয়াইছে নিরবধি আমা-সবাকারে ;

যে-জননী মৃদু হাসি সব দুঃখ ভুলি
উপাদেয় নানা অন্ন মুখে দেন তুলি ;
এমন মায়েরে ভোলে যে-কোন সন্তান
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ-সমান।

কবিতাটি রচনার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে 'ভারতী' ১৩১৩ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) কবিতাটি পঠিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ছিল বলে হেমেন্দ্রনাথ বজ্রগম্ভীর স্বরে এটি পাঠ করেন, এই সঙ্গে শিবনাথ ভট্টাচার্যের (পরে শাস্ত্রী) ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীরও দুটি কবিতা পঠিত হয়।

একজনের অনুরোধ রক্ষা করার জন্যই কি শুধু স্বদেশের চিত্র ঐ তরুণের কলমে ঐ ভাবে স্ফুট হয়ে উঠল। মনের গঠন যদি জাতীয়তাবোধের দ্বারা প্রস্তুত না হয় তাহলে সহসা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বদেশের প্রতি মমতা অমন অন্তরঙ্গভাবে ব্যক্ত হতে পারে না। এই মন যে ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান তার বনিয়াদ ছিল স্বদেশী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছে। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা ও দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষায় চর্চা করিয়া আসিয়াছেন।"[৪]

সে-সময়টা যে 'দেশের ভাষা ও দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া' রাখার কাল ছিল তা আমরা পূর্বেই উপলব্ধি করতে পেরেছি। এই মনোভাব দূর করার জন্যেই রাজনারায়ণ স্থাপন করেছিলেন 'জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী', যার পরিণাম এই হিন্দুমেলা, এবং যার সূত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে কার্যকর ভাবে স্বাদেশিকতার উদ্বোধন।

পিতার অনুপ্রেরণাতেই অবশ্য এই জাতীয়-মনোভাব গৃহের পুত্রদের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু এই মনোভাবের মধ্যে পিতৃকুলের অন্যান্যদের অনুপ্রেরণা আছে। বংশের ট্র্যাডিশন বলে যে একটা কথা আছে তা অস্বীকার করা যায় না। প্রিন্স দ্বারকানাথ এমনই এক বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন যে, তিনি বিলাতে থাকা কালে প্রতি মাসে খরচের জন্যে তাঁকে এক লক্ষ টাকা পাঠাতে হত। তিনি বিত্ত অর্জন করেছেন, এবং অর্জনের জন্যে যা-কিছু করণীয় তা তিনি করেছেন, তখনকার প্রতিপত্তিশালী ইংরেজদের খানা দিয়েছেন, এই ভোজসভার একটি চিত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অঙ্কিত করেছেন, "যখন এখানে গবর্নর জেনারেল লর্ড অক্‌লণ্ড ছিলেন [১৮৪০], তখন আমাদের বেলগাছিয়ার বাগানে অসামান্য সমারোহে গবর্নর জেনারলের ভগিনী মিস্ ইডেন প্রভৃতির অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেবদিগের এক ভোজ হয়। রূপে গুণে পদে সৌন্দর্যে নৃত্যে মদ্যে আলোকে-আলোকে বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল।"[৫]

এই ইন্দ্রপুরীর ইন্দ্রসদৃশ ছিলেন দ্বারকানাথ। তিনি নিজে এইরূপ ভোজের আয়োজন করেছিলেন তাঁর ব্যবসায়ের খাতিরে, অর্থোপার্জনের সুবিধার জন্য, বড় বড় মানুষের সঙ্গে মাখামাখি না থাকলে কাজের সুবিধা হয় না বলেই তাঁর এ আয়োজন; তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা মিটাবার জন্যে বিদেশীদের নিয়ে এই প্রমোদ-সভার আয়োজন যে নয় তা অনুমান করতে পারা যায়, যখন দেখা যায় যে, তিনি তাঁর পুত্রকে নিষেধ করে যান যে, কখনো যেন কোনো বিদেশীদের নিয়ে এরূপ আয়োজন না হয়। দেবেন্দ্রনাথকে দ্বারকানাথ এইরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দ্বারকানাথ দ্বিতীয় বার (১৮৪৫) বিলাত যাওয়ার সময়ে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথকে (১৮২৯-১৮৫৮) সঙ্গে নিয়ে যান। নগেন্দ্রনাথ অত্যন্ত শৌখিন পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন বাবু তেমনি বিলাসী। বিলাতে পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময়ে সকলে তাঁকে দেখার জন্যে উৎসুক হয়, তিনি কিরূপ পোশাকে জাহাজ থেকে নামেন তা দেখার জন্যে দেশের লোকের কৌতূহলও কম ছিল না। অমন শৌখিন মানুষ বিলাতে বাস করে কত সায়েব হয়েছে দেখার আকাঙ্ক্ষাটাই অবশ্য ছিল এই কৌতূহলের কারণ। কিন্তু জাহাজ যখন এসে গঙ্গার ঘাটে ভিড়ল, তখন

সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে এক বাঙালীবাবু জাহাজ থেকে নামলেন, ধুতি-পাঞ্জাবি-পরিহিত নগেন্দ্রনাথ।

এইসব ঘটনা থেকেই এই বংশের ধারা লক্ষ্য করা যায়। বাড়ির ছেলেদের মন এইজন্যে দেশীভাবে গড়ে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সেই ছেলেদের মধ্যে একজন। মনের মধ্যে ভাব জমা হয়ে আছে, কিন্তু সেই ভাব ব্যক্ত করার জন্যে চাই উৎসাহ। নবগোপাল মিত্র এলেন সেই উৎসাহ নিয়ে। অমনি বাঁধ ভেঙে গিয়ে দেখা দিল প্রস্রবণ। রবিকর-স্পর্শে যেন স্বপ্নভঙ্গ ঘটল নির্ঝরের।

হিন্দুমেলার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ। মধ্যমভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথও এই সভার জন্যে রচনা করেন—

মিলে সব ভারতসন্তান, একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান

-গানটি। মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে এইটিও প্রথম গাওয়া হয়।

কয়েক বছর পরে (১৮৭৫) রবীন্দ্রনাথ এই মেলায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।[৬]

তরুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে হিন্দুমেলার এই অধিবেশনটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তাঁর কবিতা-রচনার হাতেখড়ি, ইতিপূর্বে সেই অদ্ভুত নাট্যরচনার ঘটাটিকে রচনাকার্য বলে ধরা যায় না। কেননা, সে-কাজটি ঠিক সৃষ্টিকার্য নয়, সূচীকার্য; অপরের কতকগুলি রচনা একত্র করে গেঁথে নেওয়া। হিন্দুমেলাই তাঁকে আত্মপরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করে—এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর জীবন বুঝি উদ্বোধিত হয়, তাই হয়তো কবিতাটির নামও হয় উদ্বোধন।

কবিতা-রচনার হাতেখড়ি যেমন এই উপলক্ষে ঘটল, সেই সঙ্গে জাতীয়তার নানা কর্মের কর্মীরূপেও তিনি দীক্ষা লাভ করলেন। জাতীয়তার একজন অত্যুৎসাহী ও নির্ভীক সৈনিক রূপে দেখা দিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

এই মেলা কেবল স্বদেশী আলোচনা এবং স্বদেশী সংগীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জনচিত্তে দেশানুরাগ জাগ্রত করার জন্য মেলায় জাতীয়-শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হত, এবং দেশীয় ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়াম প্রদর্শিত হত। ১৮৬৯

সালের ১৬ মে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ মেলার সম্পাদক হন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল থেকেই প্রকৃতপক্ষে দেশে স্বদেশীভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতের অতীত-গৌরবকাহিনী লিখে তখন আত্মবিস্মৃত জাতির মনে দেশানুরাগের সঞ্চার করতে আরম্ভ করেন।

যখন এইভাবে দেশে জাতীয়তাবোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে, এমন সময়ে সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কার -বিষয়ে মতভেদের জন্য দেবেন্দ্র-কেশব বিচ্ছেদ ঘটে (১৮৬৫); কেশবচন্দ্র সেন তাঁর দলবলসহ আদিব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন, তখন নবগোপাল মিত্র প্রমুখ কয়েকজন দেশহিতৈষী ব্যক্তি স্বদেশী ভাব প্রচারের জন্য বিশেষ উৎসাহী হন। এই উৎসাহে প্রেরণা স্বরূপ দেবেন্দ্রনাথের অর্থসাহায্যে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ন্যাশনাল পেপার' (৭ আগস্ট ১৮৬৫)। নবগোপাল হন সম্পাদক।

এইভাবে দেশে নতুন হাওয়া এল। সেই হাওয়ার মধ্যে লালিত ও পালিত হতে লাগল ঠাকুরবাড়ির এই নূতন পুত্র। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, "নবগোপালের সময় থেকে এই 'ন্যাশনাল' শব্দটা দাঁড়াইয়া গেল। ন্যাশনাল সংগীত রচিত হইতে আরম্ভ হইল।"[১]

অতি অন্তরঙ্গ ভাবে এই নবগোপালকে জেনেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এঁর কাছ থেকেই জাতীয়তার মন্ত্র লাভ করেছেন তিনি; সে কথা তিনি কখনো বিস্মৃত হন নি। দেশকে মনে-প্রাণে ভালোবাসবার যে আগ্রহ তারই বশে নবগোপাল সর্বপ্রথম বাঙালি সার্কাসের সূত্রপাত করেন। শেষজীবনেও সেই স্মৃতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে জাগরূক ছিল। তিনি তাই তাঁর দীক্ষাগুরুকে স্মরণ করে বলেছেন, "কতকগুলা মড়াখেগো ঘোড়া লইয়া নবগোপালবাবুই সর্বপ্রথম বাঙালি সার্কাসের সূত্রপাত করেন। আজ [১৯১২] যে বোসের সার্কাসের কৃতিত্ব ও নানা প্রশংসাবাণী শুনা যায় উহা তাহারই পরিণতি এবং নবগোপালবাবুর অনুষ্ঠিত সেই প্রথম বাঙালি সার্কাসেরই চরম ক্রমোন্নতি বলিতে হইবে। তিনি এত করিলেন, অথচ এখন তাঁহার নামও কেহ করে না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এ দেশে তাঁহার ন্যায়

স্বদেশানুরাগী নীরব কর্মবীরের একটা স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন থাকা নিতান্ত আবশ্যক।”[৩]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আক্ষেপের কথাটি পুনরুক্তি করি, ‘তিনি এত করিলেন, অথচ এখন তাঁহার নামও কেহ করে না’ ; নবগোপাল-সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন, জ্যোতিরিন্দ্র-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যও তাই, আক্ষেপও তাই। অনেক-কিছু করা দেশের ও দশের পক্ষে মঙ্গলজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু যিনি এমন অনেক-কিছু করেন তাঁর পক্ষে বুঝি মঙ্গলজনক নয়। দেশ ও দশ বহুমুখী প্রতিভাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। এইজন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ন্যায় মানুষের নামও এখন কেউ করে না।

সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা নিয়ে যে ব্যক্তি জীবন অতিবাহিত করলেন, দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার প্রবল আগ্রহে সেই ব্যক্তিই যে নবগোপাল মিত্রের ন্যায়ই আত্মজ্ঞান হারিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পালের (১৮৫৮–১৯৩২) উক্তি স্মরণীয়, তিনি বলেছেন, “শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই তাঁতে তৈয়ারী গামছা মাথায় বাঁধিয়া হিন্দুমেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন— লোকে বলে নাচিয়াছিলেন।”[৮]

হিন্দুমেলা সম্বন্ধে আলোচনা কথঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে করার তাৎপর্য এই যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উত্তরজীবন এই মেলার কার্যক্রম দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। দেশের প্রতি অনুরাগ তাঁর মর্মে এমনভাবে দৃঢ়মূল হয়ে বসেছিল যে, কি উপায়ে দেশের কথা দশের কাছে উপস্থিত করা যেতে পারে, এ-বিষয়ে তাঁর চিন্তার ও চেষ্টার অন্ত ছিল না। হিন্দুমেলার সঙ্গে যোগও কখনো ছিন্ন হয় নি। ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ জ্যোতিরিন্দ্র মেলার সংশ্লিষ্ট সম্পাদক ছিলেন।

কিন্তু মেলা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিন্তু যে প্রেরণা দেশবাসীর মধ্যে এই মেলা দিয়েছিল, তারই পরিণামে গঠিত হয় ভারতের জাতীয়-কংগ্রেস। হিন্দুমেলা তিরোহিত হল বটে, কিন্তু এ বুঝি তিরোধান নয়— বিবর্তন।

হিন্দুমেলা কিভাবে বন্ধ হয়ে যায় বিপিনচন্দ্র পাল তারও বর্ণনা দিয়ে বলেছেন[৯] যে, শেষবার মেলাতে জাঁকালো রকম মারামারি হয়। হ্যাটকোট-ধারী একজন পুরুষ একটি মেমসায়েবকে সঙ্গে নিয়ে মেলায় উপস্থিত হয়ে চেয়ার

ছেড়ে দেওয়ার জন্য রূঢ়ভাবে হুকুম করেন, এবং আদেশ পালিত না হওয়ায় চৌকি থেকে বিপিনচন্দ্রকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইলেন। এই অন্যায় ব্যাপার নিয়ে সায়েবে-বাঙালিতে রীতিমত মারামারি বেধে গেল। পুলিশ এল। পুলিশকেও ইঁট ছুঁড়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হল।

যাই হোক, গত হল হিন্দুমেলা। গত হল বটে, কিন্তু মন থেকে তার প্রভাব মুছে গেল না।

"হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত— কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকের ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে"[৩]—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই মনোগত অভিলাষের অভিব্যক্তি হয়ে দেখা দিল তাঁর রচিত নাটক 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪)। এই নাটকের অন্তর্গত গানের কয়েক ছত্র উদধৃত করা যায়—

এত স্পর্ধা যবনের স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ
তারা কি করেছে মনে সমস্ত ভারতভূমে
পুরুষ নাহিক একজন ?

দেশানুরাগের প্রেরণাতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যকাররূপে অভিষেক। এর পরেও তিনি এই ভাবের আরও নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু সে আলোচনা পরে।

যৌবনে যে মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হন, সেই মন্ত্রের দ্বারা তাঁর মন অনুরণিত অবশ্যই ছিল। জীবনের বিবিধ কাজ ও বিবিধ কর্তব্য পালনের মধ্যেও তাঁর মনে ঐ ভাবটি জাগরূকই ছিল। সাহিত্যসাধনা চিত্রসাধনা সংগীতসাধনা ইত্যাদি নিয়েই তিনি বিভোর। কিন্তু মনের মধ্যে স্বদেশচিন্তার ভাবটি বর্তমান।

এই স্বদেশচিন্তার থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মাথায় এল একটি সভা গঠনের সংকল্প— একটি গুপ্তসভা। এর নাম দেন 'সঞ্জীবনী সভা', গুপ্তভাষায় যার নাম হয় হাম্‌চুপামূহাফ্‌।

তাঁরা বাল্যকালে যখন অদ্ভুতনাট্য নিয়ে মেতে আছেন তখন তাঁরা নানারূপ উৎসব করতেন। বাড়ির বারান্দায় বসত আড্ডা, একদিন কথা উঠল Free Mason -এর অনুরূপ একটা-কিছু করলে কেমন হয়। প্রস্তাবটা শুনে গুণেন্দ্রনাথের ভালো লাগল, তিনি প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন। অমনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই কাজে লেগে গেলেন। আসলে Free Mason সম্বন্ধে সে সময়ে তাঁদের বিশেষ কিছু ধারণা ছিল না— কেবল জানা ছিল যে, যা-কিছু করা হবে সবই গোপনে করতে হবে, যা শুনব দেখব করব তার কিছুই প্রাণান্তেও বাইরে প্রকাশ করা হবে না। কিন্তু সেসব না হয় হল, কিন্তু এই দলে পরিচ্ছদ কি রকমের হবে, সেইটেই হল সমস্যা। দরজি এল, তাকে নিয়ে সকলে মিলে পোশাক সম্বন্ধে জল্পনাকল্পনা হল। এবং অচিরেই এই নূতন দলের আড্ডাও বসেছিল।— এটি হল তাঁদের জীবনের নানাবিধ বাল্যলীলার একটি।

কিন্তু এবার যে সভা তৈরি হল, তা অনেকটা ঐ Free Mason -এর অনুরূপ হলেও এর আদর্শ একটা ছিল— তা হল দেশহিতব্রত।

যখন এ দেশে হিন্দুমেলার উৎপত্তি, সেই সময়ে ইউরোপে জাতীয়-আন্দোলন — মাৎসিনি-গারিবল্ডি-কাভুরের উদ্যোগে ইতালির স্বাধীনতা-আন্দোলন— যেমন চলেছে, তেমনি আমেরিকাতেও ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলন চলেছে। বিভিন্ন দেশে এইরূপ আন্দোলনের দ্বারা ভারতেও অনুরূপ আন্দোলন উৎসাহিত হয়।

মাৎসিনি তাঁর যৌবনে ইতালির স্বাধীনতা-অর্জনের জন্যে কার্বোনারি নামে গুপ্তসভার সভ্য হন। কার্বোনারির অর্থ কাঠপোড়ানি (charcoal burners)— এই সভার সভ্যদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় (mystic religious language) কথাবার্তা চলত।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্রায় অনুসারে মাৎসিনির আত্মজীবনী অবলম্বন করে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তৎসম্বন্ধে 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (ভাদ্র ১২৮২ অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে) যোশেফ ম্যাট্‌সিনি নব্য ইতালী প্রবন্ধ প্রাকাশ আরম্ভ করেন।[৯] তার পরে এ দেশের যুবকদের মধ্যে উক্ত কার্বোনারির আদর্শে নানাস্থানে গুপ্তসভা স্থাপনের উৎসাহ হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তখন যুবক। আনুমানিক ১৮৭৭ সালে তিনি স্থাপন করেন এই গুপ্তসভা— সঞ্জীবনী সভা, সাংকেতিক ভাষায় যার নাম হামচুপামুহাফ্।[১০]

সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর বিবিধ কার্যের অনুষ্ঠান। সভার অনেক নিয়মাবলী ছিল, তার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি— অর্থাৎ এই সভায় যা বলা হবে করা হবে বা শোনা যাবে, এই সভার সদস্য নয় এমন কারো কাছে প্রকাশ করা যাবে না। নূতন কোনো সদস্যকে সভার অন্তর্ভুক্ত বা দীক্ষিত করার দিনে সভার অধ্যক্ষ লাল পট্টবস্ত্র পরে আসতেন। "ইহার দীক্ষা-অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ গাম্ভীর্য ছিল। দীক্ষাকালে নবদীক্ষার্থীর সর্বাঙ্গ একটা অজ্ঞাত ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিত।"[৩] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এ উক্তি সম্ভবত ঠিক, কেননা এই সভার টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা রাখা হত, সেই মড়ার মাথার চক্ষুকোটরে বসানো হত দুইটি জ্বলন্ত মোমবাতি। সবই সংকেতের বিষয়— মড়ার মাথাটি ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন, বাতি দুইটি মৃতভারতের প্রাণসঞ্চার ও জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে তোলার সংকেত। সভা আরম্ভ হত 'সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্' বেদমন্ত্রের দ্বারা। আদিব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয় থেকে লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের পুঁথি এনে সভায় রাখা হত। সভার কার্যবিবরণী লিখিত হত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত সাংকেতিক ভাষায়।

ঠনঠনের একটা পোড়ো বাড়ি ছিল সভার কার্যালয়। অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্রও এই সভার সভ্য হন। অবশেষে কিশোর রবীন্দ্রনাথও সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতা টাউন হলে যে রবীন্দ্রজয়ন্তী (১১ পৌষ ১৩৩৮) অনুষ্ঠিত হয়, সেই উপলক্ষে লিখিত ও কয়েকদিন পরে ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক সেনেট হলে অনুষ্ঠিত (১৫ পৌষ ১৩৩৮) রবীন্দ্রজয়ন্তী-উৎসবে পঠিত প্রতিভাষণে রবীন্দ্রনাথ কৈশোরস্মৃতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়োবাড়িতে তার অধিবেশন; ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি, আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান। রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত, সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।"[১১]

তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তেও রবীন্দ্রনাথ এই স্বাদেশিক সভার বিস্তৃত বিবরণ

দিয়েছেন। খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে চলত এই সভা, সেখানে লজ্জা ভয় সংকোচ কিছুই ছিল না। প্রধান কাজ ছিল উত্তেজনার আগুন পোহানো।

সে সময়ে জাতিবর্ণের ভেদ ছিল প্রবল। সামাজিক এই সংস্কারটিও এই সভা বর্জন করেছিল— সঞ্জীবনী সভার সভ্যদের মধ্যে জাতিবর্ণ বিচার না করে আহারের বিধি ছিল। সভ্যদের মধ্যে কুলীন ব্রাহ্মণ থেকে শুঁড়ি পর্যন্ত সব শ্রেণীর লোকই ছিল।

দেশহিতব্রতই যখন সভার ব্রত, তখন এও একটা কর্তব্য কাজ ব'লে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

দেশের কাজ করা হচ্ছে, কিন্তু দেশের মানুষের ঐক্যসাধনের জন্যে সার্বজনিক পোশাক নেই। অতএব তার ব্যবস্থার জন্যে একদিন সভায় জ্যোতিরিন্দ্র এ সম্বন্ধে এক প্রস্তাব করায় ভারতের আন্তর্জাতিক পোশাকের পরিকল্পনার ভার পড়ল তাঁরই উপর। তারই ফলে পোশাক ঠিক হল। পরনে মালকোঁচা মেরে কাপড়, মাথায় শোলার টুপীর উপর পাগড়ি বসিয়ে শিরস্ত্রাণ। সকলে সোৎসাহে এ-সাজ অনুমোদন করলেন। দরজির দোকানে গিয়ে মালকোঁচা-মারা কাপড় সেলাই করতে ও শিরস্ত্রাণটি তৈরি করতে দেওয়া হল। ঐ সাজ তৈরি হয়ে এলে, কিন্তু কে ঐ পোশাক পরে রাস্তায় বের হবে? প্রথম সৈনিক হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি ঐ সাজে সেজে কলকাতা শহর ঘুরে এলেন।

এই পরিচ্ছদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জ্যোতিদাদা অম্লান বদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন— আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।"[৪]

এই অসাধারণ মনোবলের অধিকার নিয়ে তিনি কাজে নেমেছিলেন। এই জন্যেই তিনি দেশী তাঁতে তৈরি গামছা মাথায় বেঁধে হিন্দুমেলায় উপস্থিত হতেও পেরেছিলেন।

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সত্ত্বেও এ-সাজ দেশের কেউ গ্রহণ করে নি। এজন্যে ভগ্নোৎসাহ'না হয়ে দেশহিতের জন্যে অন্যদিকে তিনি মনোযোগ দিলেন। দেশের শিল্পবাণিজ্যের জন্য কল-প্রতিষ্ঠার কাজে। সর্ব-প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল দেশলাইয়ের কল। অনেক অর্থব্যয় করে ও বহু পরিশ্রম করে কয়েক বাক্স দেশলাই তৈরি হল বটে, কিন্তু পরতা বেশি পড়ায় দামও যেমন বেশি করতে হল, অন্যদিকে জিনিসও বিশেষ ভালো হল না— উপযুক্ত কাঠির অভাবে এতে যে-কাঠি ব্যবহৃত হল তা জ্বলে না। অসুবিধা অনেক। এইসব বিবেচনা করে সঞ্জীবনী সভার সভ্যরা ঠিক করলেন অন্য-কোনো সহজ কাজে হাত দেওয়াই সংগত।

সভ্যরা প্রত্যেকে তাঁর আয়ের দশমাংশ চাঁদা দিলেন। এতে যে টাকা সংগ্রহ হল তা দিয়ে কেনা হল কাপড়ের কল। এই কলের সঙ্গে সঙ্গে আরো কত তাঁত বসানো হবে, একটা বাড়িও তৈরি করতে হবে— এই রকম উদ্দাম কল্পনার উপর ভর করে চলল এই উদ্যম। অবশেষে এই কাপড়ের কল থেকে একদিন প্রস্তুত হল একটা গামছা। এই গামছা নিয়ে সভ্যদের মধ্যে আনন্দের তাণ্ডব শুরু হল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠে গেল কল— ঐ গামছাখানি ছাড়া আর অন্য-কিছু ঐ কলে তৈরি হয় নি।

এই খ্যাপামির এই তপ্ত হাওয়াতেই কাজ চলত সভার। দেশের মানুষের মনের বল বৃদ্ধি, দেশের প্রতি ও দেশের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করা, দেশের হিতসাধন করা, দেশের মানুষের মধ্যে ঐক্যসাধন করা— ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্যই এইসব প্রচেষ্টা।

যেসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা দিতে হবে, যেসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশা ধ্বনিত করে তুলতে হবে বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন অনেকদিন পরে (১৩০০ বঙ্গাব্দ), সেইসব মানুষের মধ্যে সৎসাহস বর্ধিত করার জন্যেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ কম ছিল না। তিনি এজন্যে বন্দুক ছোঁড়ার ও শিকারের প্রবর্তন করেছিলেন। রবিবারে-রবিবারে দলবল নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিকারে বের হতেন— এই দলে এসে জুটত অনেক চেনা-অচেনা লোক, তাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সব শ্রেণীর লোকই ছিল।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে এ-বিষয়ে অনেক মজার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনিও শিকারী-দলের একজন হয়ে জ্যোতিদাদার সঙ্গেসঙ্গে যেতেন।

এসব তাঁর যৌবনের উদ্যম ও উৎসাহ। তার পর জীবনের অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে, গিয়েছে অনেক সাধনা ও আরাধনা; কিন্তু তার মধ্যেও দেশপ্রাণতা ছিল অটুট। তাঁর জীবনসায়াহ্নেও তিনি রচনা করলেন জাতীয়-সংগীত। প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময়ে ফরাসি রাষ্ট্রসংগীতের বঙ্গানুবাদ ও মূল সুরের অনুরূপ স্বরলিপি প্রকাশ করেন[১১]—

আয় রে আয় দেশের সন্তান
গৌরবের দিন এসেছে;
অত্যাচার ঐ ছাখ— গগনে
রক্তধ্বজা তুলেছে।
শুনিছ না ক্ষেত্রমাঝে
ভীষণ সৈন্যের হুঙ্কার?
ওরা আসে বুকের 'পরে
করিতে স্ত্রীপুত্র সংহার।
ধর অস্ত্র পৌরজন
কর ব্যূহ সংগঠন,
চলো— চলো— মোদের ক্ষেত্রে
শত্রু-রক্ত হোক সিঞ্চন।

এই অনুবাদ-সংগীতের সঙ্গে আর-একটি মৌলিক রচনার বিষয়েও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তার প্রথম কয়েক ছত্র এই—

চল্ রে চল্ সবে ভারতসন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান
বীরদর্পে পৌরুষগর্বে
সাধ্ রে সাধ্ সবে দেশের কল্যাণ। ••

তাঁর পুণায় বাসকালে এটি রচিত হয়। এবং ১৩০৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'বীণাবাদিনী'তে প্রকাশিত হয়।

জাতীয়তাবোধের দ্বারা তাঁর জীবন কিভাবে জারিত ছিল এর থেকেই তা অনুমান করা যেতে পারে।

১ "The actual translation was made by the immortal poet of the *Meghnadbadh,* Michael Madhusudan Dutt. The translation was hurried through a single night".—L. C. Mitra, ***History of Indigo Disturbance in Bengal*** ।—নগেন্দ্রনাথ সোম, 'মধুস্মৃতি'।

২ 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত'

৩ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', স্বাদেশিকতা

৫ 'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', অষ্টম পরিচ্ছেদ

৬ কবিতাটির নাম 'হিন্দুমেলার উপহার'। সাধারণের সমক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম উপস্থিতি।—দ্র° রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

৭ বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', দ্বিতীয় পর্যায়

৮ বিপিনচন্দ্র পাল, 'হিন্দুমেলা ও নবগোপাল মিত্র,' বঙ্গবাণী ১৩২৯ অগ্রহায়ণ; প্রবাসী ১৩২৯ পৌষ: কষ্টিপাথর

৯ "I persuaded Babu Jogendranath Vidyabhuson and Babu Rajanikanta Gupta, both distinguished Bengalee writers to translate into our language ,the life and work of Mazzini ·· so as to place them within the reach of those who did not understand English."—S. N. Banerjea, *A Nation in Making* । সাহিত্যসাধকচরিতমালা ৬৮।

১০ সাংকেতিক ভাষার কৌশলটি এইরূপ—

আকার স্থানে অকার॥ অকার স্থানে আকার॥ ই স্থানে উ॥ ঈ স্থানে ঊ॥ উ স্থানে ই॥ ঊ স্থানে ঈ॥ এ স্থানে ঐ॥ ঐ স্থানে এ॥ ও স্থানে ঔ। ঔ স্থানে ও। ক খ গ ঘ স্থানে গ ঘ ক খ॥ চ ছ জ ঝ স্থানে জ ঝ চ ছ॥ ট ঠ ড ঢ স্থানে ড ঢ ট ঠ॥ ত থ দ ধ স্থানে দ ধ ত থ॥ প ফ ব ভ স্থানে ব ভ প ফ॥ শ ষ স স্থানে হ॥ হ স্থানে স॥ র স্থানে ল॥ ল স্থানে র॥ ম স্থানে ন॥ ন স্থানে ম॥

ঐ সংকেত অনুযায়ী—

স ন্ জী ব নী স ভা

হা ম্ চূ পা মূ হা ফ্

—দ্র° 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'

১১ দ্র° রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মপরিচয়'

১২ দ্র° 'প্রবাসী' ১৩২২ ভাদ্র

আত্মগঠন

প্রকৃত স্রষ্টার চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য থাকে, সেই বিশিষ্ট চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্যে প্রবল প্রেরণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁর না-ছিল কোনো পুরস্কারপ্রাপ্তির ইচ্ছা, না-ছিল কোনোরূপ কীর্তিলাভের অভিলাষ।

অর্জনে ও বিতরণে একপ্রকার অপার আনন্দ আছে। জীবনে সেই আনন্দলাভ করাই ছিল তাঁর উচ্চাশা। গীতার চর্চা গৃহে হয়েছে ; তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজের গীতাভাষ্যটি[১] দেখে, এবং গীতার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ যে ছিল তারও প্রমাণ তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি তাঁর উত্তরজীবনে—জীবনের সায়াহ্নে, বালগঙ্গাধর টিলক -কৃত বৃহৎ গ্রন্থ গীতাভাষ্যের যখন তিনি অনুবাদ[২] করলেন মরাঠি থেকে। গীতার বাণীই তিনি তাঁর জীবনবাণী বলে গ্রহণ করেছিলেন কি না, এ কথা তিনি কথা দিয়ে প্রকাশ হয়তো করেন নি, কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করেছেন জীবন দিয়ে এবং জীবনের কর্ম দিয়ে।—কোনোরূপ ফল কামনা না করে তিনি কেবল কাজই করে গিয়েছেন। একটা জীবনে এত প্রকারের কাজ করা সামান্য শক্তির পরিচয় না। কর্মশক্তির পরিচয়ও যেমন তিনি দিয়েছেন, মর্মশক্তির পরিচয়ও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে অবিকল সেই অনুপাতেই। মনের জোর ছিল বলেই তাঁর মন কোনো প্রলোভনে লুব্ধ হয় নি। সুনাম সুযশ না চায় কে ? তিনি যদি সেসব আকাঙ্ক্ষা করতেন তা হলে অত কাজের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত না ক'রে কেবল নাট্যরচনা করেই বঙ্গসাহিত্যে কীর্তি রেখে যেতে পারতেন। যখন নাট্যকার রূপে তিনি কীর্তিত ও প্রশংসিত এবং নাট্যচূড়ামণি রূপে অভিনন্দিত তখনই তিনি পরিত্যাগ করলেন সে কাজ। হেতু ? জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক রচনার আর প্রয়োজন নাই।"[৩] এ কথা মনের জোরের পরিচয়ও বটে, মনের উদারতারও। যশের আকাঙ্ক্ষা না করে সাহিত্যসাধনাকে তিনি তাঁর জীবনের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছিলেন।

যাঁরা সাহিত্যের অকৃত্রিম সাধক তাঁরা স্বীকার করবেন যে, ঘরে বসে এক

মনে লেখনী চালনা করলেই সাহিত্যিক হওয়া যায় না। নিজেকে এই কাজের উপযুক্ত করে নির্মাণ করার জন্যে 'প্রয়াসও দরকার। সাহিত্যে আকস্মিকতা বলে কোনো কথা নেই— আবির্ভাব নেই, আছে উদয়। হঠাৎ একটা রচনা অতি উৎকৃষ্ট হয়ে গেল অমনি সাহিত্যের সম্মান লাভ হল, এটা ঠিক পথ নয়। সম্মান প্রাপ্য বটে, তা দেওয়া হোক; কিন্তু তদ্দ্বারাই কারও সাহিত্যিক জীবনের জরিপ করা যেন না হয়। যতদিন জীবন ধারণ করা হবে ততদিন একটানা শ্রম ও অনুশীলনের দ্বারাই সাহিত্যের মর্যাদা রক্ষা হয়।

এই মূল কথাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জানা ছিল, এইজন্যে যশস্বী না হলেও তিনি নমস্য। মাইকেল মধুসূদনের জীবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন সৎছাত্রের মত রুটিন তৈরি ক'রে তদনুযায়ী তিনি পাঠাভ্যাস করে কি ভাবে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করেছেন— এর দ্বারা তিনি নিজের কাব্যরচনার আগে নিজেকে রচনা করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকেও আমরা বলতে পারি তিনি নিজেকে গঠন করে নিয়েছেন অকাতর শ্রম ও অনুশীলনের দ্বারা; 'সন্ধ্যাসংগীত' বা 'প্রভাতসংগীতে'র কবি উত্তরজীবনে বিশ্বকবি রূপে বন্দনা পেতে পারেন এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন— কিন্তু সেই কিশোর কবির মনের মধ্যে লুকায়িত ছিল পুঞ্জীভূত প্রেরণা, সেই প্রেরণার শাণে নিজেকে ঘষে পালিশ করে ক্ষয় করে তিনি এক আশ্চর্য উজ্জ্বলতা লাভ করলেন— যার দীপ্তিতে পৃথিবীর কাব্যালোক আলোকিত হল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনও সেইরূপ একটি আত্মগঠনের জীবন। জীবনের প্রথম লগ্নে তাঁর প্রাণের মধ্যে প্রকৃত স্রষ্টার বীজ উপ্ত হয়, তাঁর চেষ্টার নিষ্ঠার শ্রমের ও একাগ্রতার জল-হাওয়া-আলো-সার দিয়ে তাকে তিনি অঙ্কুরিত পল্লবিত পুষ্পিত ও সাফল্যমণ্ডিত করেছেন।

জীবনের বনিয়াদ তৈরি হয়েছিল পাকাপাকি ভাবেই। চরিত্রগঠনের সেটি উদ্যোগপর্ব— যখন পিতার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ ও নির্দেশ তিনি লাভ করেন। কিন্তু পতিত জমিতে বীজ ছড়ালে কোনো কাজ হয় না। পিতার কাছ থেকে জীবনের ব্রতপালনের দীক্ষা তিনি লাভ করেন, উর্বর ভূমিতেই এই দীক্ষামন্ত্রের বীজ ছড়ানো হয়েছিল। সেইজন্যে সুফলও পাওয়া গিয়েছে।

পিতৃদেবের কাছ থেকে জীবনের কি কি মন্ত্র তিনি লাভ করেছেন, সেই বাল্যকালের স্মৃতির একটা মোটামুটি বিবরণ তিনি তাঁর জীবনের অপরাহ্ণে দিয়েছেন[৭]। তার থেকে আমরা জানতে পারি, সময়নিষ্ঠা, সাহিত্যে ও সংগীতে অনুরাগ, অতিথিবাৎসল্য, দানশীলতা, অর্থের প্রতি অনাশক্তি, উপনিষদের শ্লোক অভ্যাস— এইরূপ নানা বিষয়ের প্রতি বালকের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়। এবং সেই সময়ে আরও একটি বিষয় ছিল। বেশির ভাগ সময়ই পিতা দেবেন্দ্রনাথ বাইরে থাকতেন, যখন বাড়ি আসতেন তখন তাঁদের নানারূপ উপদেশ দিতেন, এবং সেইসঙ্গে শিক্ষাও দান করতেন। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে মুখেমুখে তিনি বলে যেতেন, তাঁর সেই মৌখিক ভাষণ ক্ষিপ্রহস্তে লিখে নিতেন সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মসমাজে বা পারিবারিক উপাসনামণ্ডপে দেবেন্দ্রনাথের ভাষণও এইভাবে লিখে নিয়ে, পরে পরিষ্কার করে কপি করে দেবেন্দ্রনাথকে দেখালে তিনি তা কিছুকিছু সংশোধন করে দিতেন। এই ভাবে ভাষণের অনুলেখন ইতিপূর্বে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথও করেছেন।

এইসবের দ্বারা এই নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যেও নতুন প্রেরণা এসেছে। জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানান্বেষণ করার স্পৃহা জাগ্রত হয়েছে।

কিন্তু বাহ্যতঃ সবই বিপরীত মনে হয়। জ্ঞানান্বেষণের স্পৃহা যাঁর জাগ্রত হয়েছে তিনি অকস্মাৎ কলেজ ত্যাগ করলেন। এফ. এ. পড়তে পড়তে হঠাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন ধাবিত হল অন্যত্র। তিনি আরম্ভ করলেন ফরাসি ভাষা শিখতে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন আনুমানিক সতেরো। সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু মনোমোহন ঘোষ সেই সময়ে (১৮৬৬) ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরেছেন। বন্ধুর এই প্রত্যাগমনে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কর্মস্থল বোম্বাই থেকে ছুটিতে এসে কলকাতার উপকণ্ঠস্থ কাশীপুরের বাগানবাড়িতে অবস্থান করছেন। জ্যোতিরিন্দ্রও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর কাছে আরম্ভ করলেন ফরাসি শিখতে। ভাষাশিক্ষায় এই তাঁর হাতেখড়ি। এই ভাষাশিক্ষার সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলেই পরে ফরাসি সাহিত্যের থেকে তিনি বাংলায় ভাষান্তর করতে পেরেছেন অনেক গ্রন্থ।

যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এইখানে ভাষাশিক্ষায় ব্যস্ত তখন তাঁদের উদ্যোগে

প্রতিষ্ঠিত জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় 'নবনাটক' অভিনয়ের উদ্যোগ চলেছে। নাটকের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি ভাষাশিক্ষাকে পরিহার করতে পারেন নি। এই নাটকে তিনি অংশও গ্রহণ করেছেন। তবুও অভিনয় শেষ হবার পর তিনি বোম্বাই চললেন তাঁর মেজদাদার সঙ্গে।

এই সময়টিকে বলা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আত্মগঠনের উদ্যোগপর্ব।

কলেজের পাঠের প্রতি বীতরাগ না হলেও সে পাঠ তাঁর মনঃপূত হয় নি, তিনি বোম্বাইতে গিয়ে পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ করলেন অধ্যয়ন। অনেক ইংরেজি ও সংস্কৃত বই তিনি গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। যেসব সুকুমার কলার প্রতি তাঁর মনোযোগ ইতিপূর্বে আকৃষ্ট হয়েছে বলে আমরা উল্লেখ করেছি, এখানে এসে তিনি কার্যকর ভাবে তারই চর্চা ও অনুশীলন আরম্ভ করলেন। সাহিত্যপাঠও চলেছে, সেতারশিক্ষাও চলেছে, সেই সঙ্গে চিত্রাঙ্কনবিদ্যার পাঠ— একদা বালককালে স্কুলের ক্লাসে বসে মাস্টার-মহাশয়ের চিত্র তিনি এঁকেছিলেন, এবার আরম্ভ হল তার অনুশীলন।

গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের ইংরেজি পত্রাংশের অনুবাদ* থেকে এ বিষয়ে একটা আভাস পাওয়া যাবে। বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বুঝি নিজেকে জ্যোতির্ময় করার চেষ্টায় তখন ব্যাপৃত।

সত্যেন্দ্রনাথের উক্ত পত্রাংশ হচ্ছে—

"১১. ৫. ৬৭— জ্যোতি আমার নিকট ফরাসি ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে। আমি তাহার জন্য একজন ড্রয়িং-মাস্টারও নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি, কিন্তু জ্যোতি পারিবে কিনা জানি না।

"২. ৬. ৬৭— জ্যোতি সেতার শিক্ষা করিতেছে।

"৪. ৯. ৬৭— জ্যোতি সেতার শিখিতেছে। ইহাই তাহার একমাত্র আমোদ। আমি তাহাকে ফরাসি শিখাইতেছি। সে খুব খাটিতেছে। বড় লাজুক, সমাজে মিশিতে পারে না। বোধ হয় বাড়ি যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।"

এই ব্যাকুলতা বুঝি কেবল গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্যে নয়, তাঁদের রচিত নাট্যশালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগের জন্যও। এই সময়ে (১৪ জুলাই ১৮৬৭) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গুণেন্দ্রনাথকে পত্র দেন, লেখেন—"The origin of the

Jorasanko Theatre is now hidden in the deep folds of rusty antiquity !!..." এই নাট্যশালার প্রতি আকর্ষণও তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তনের ব্যাকুলতার অন্যতম কারণ হতে পারে।

যাই হোক, আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বোম্বাই-প্রবাসকে তাঁর আত্মগঠনের উদ্যোগপর্ব বলে গ্রহণ করতে পারি। বিদ্যায়তনে শিক্ষাভ্যাস করে একরকমের উন্নতি সম্ভব, সে-উন্নতি নিজের রুচিমত সকলের হয় না, সে-শিক্ষার দ্বারা অপরের পরিকল্পনা-অনুসারে ছাত্রগঠন হতে পারে। কিন্তু ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বিভিন্ন রুচির বিভিন্ন উদ্যমের ছাত্র থাকে। সেই পরিকল্পনার সঙ্গে সকলের মনের চাহিদার খাপ খায় না। এইজন্যে এই ধরণের ছাত্রদের ইচ্ছে হয় নিজের ইচ্ছানুযায়ী খাতে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু সকলের যোগ্যতা সমান নয়, সকলে পরিবেশও পান না মনের মতন, এইজন্যে অনেকের সেই ধারা নিরুৎসাহের বা নিরুদ্যমের মরুপথে হয়তো হারিয়ে যায়।

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল অসীম, উদ্যম অফুরন্ত ; এবং সেই-সঙ্গে তিনি পেয়ে গেলেন তাঁর মনের চাহিদার মনের মত জোগান।

আমেদাবাদে এসে তিনি মেজদা সত্যেন্দ্রনাথকে পেলেন তাঁর সহায়। আত্মগঠনের উদ্যোগপর্বে ত্রিধারায় তিনি বইয়ে দিলেন তাঁর মনের স্রোত—

১ ফরাসিশিক্ষা
২ ড্রয়িংশিক্ষা
৩ সেতারশিক্ষা

তাঁর উত্তরজীবনে তিনি এ সবই যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়েছেন। ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন, চিত্র অঙ্কন করেছেন, সংগীত সাধনা করেছেন।

শিক্ষার এটি তাঁর একটি পর্ব। দ্বিতীয় পর্ব আমরা পাই পুনরায় মেজদাদার কাছেই— সাতারায়।

১৮৯৭ সালের প্রথম দিকে সত্যেন্দ্রনাথ অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ সালের মার্চ মাস থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ সাতারায় ছিলেন। এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেখানে যান, ও মেজদাদার পুণার বাসায় অবস্থান করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ পার হয়েছে, কিন্তু তখনো শিক্ষার্থীর মনোভাব তাঁর অটুট। তাই, তিনি সেখানে শিক্ষা আরম্ভ করলেন, একজন

মরাঠি পণ্ডিতের কাছে তিনি মরাঠি ভাষা অধ্যয়ন আরম্ভ করলেন। তারই ফলে সেই সময়েই (১৮৯৫) তিনি 'সাধনা' পত্রিকায় মারাঠি ও বাঙ্গলা (বৈশাখ ১৩০২) ও তুকারামের অভঙ্গ (ভাদ্র ১৩০২) ও অন্যান্য প্রবন্ধ রচনা করেন। এবং অবশেষে, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত হয় লোকমান্য টিলকের মরাঠি 'গীতারহস্য' গ্রন্থের তাঁর কৃত বাংলা অনুবাদ (১৯২৪)।

নিজেকে নির্মাণ করার তিনি কুশলী কারিগর ছিলেন ; এবং নির্মিত সেই নিজেকে কুশল কাজে নিয়োগ করে পরিচ্ছন্ন কারুকাজ করার তিনি ছিলেন দক্ষ শিল্পী।

দ্বিবিধ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি— ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী। তাঁর এই দ্বিতীয় প্রতিভার পরিচয় যাঁদের কাছে সে আমলে স্পষ্ট হয়েছে তাঁরা তাঁর উপর অর্পণ করেছেন কাজের দায়িত্ব ; এবং তিনি তাঁর মনের মত কাজ পেলে তা গ্রহণে ও সম্পাদনে আলস্যবোধ করেন নি। আমরা এইজন্যে তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের কাজেও নিযুক্ত দেখতে পাই। ১৮৬৭ সালের অক্টোবরে তিনি আমেদাবাদ থেকে দেশে ফিরে আসেন ভাষাশিক্ষায় চিত্রাঙ্কনবিদ্যায় ও সংগীতে কিছুটা অগ্রসর হয়ে। দেশে ফেরার পর তিনি হিন্দুমেলার কাজে দীক্ষিত হন (১১ এপ্রিল ১৮৬৮) এবং তার পরই তাঁর বিবাহ হয় (৫ জুলাই ১৮৬৮)— এসব আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। জীবনের নূতন দীক্ষা ও জীবনের নূতন সঙ্গিনী পেয়েও তাঁর কাজের উদ্যম ও উৎসাহ থামেনি, তিনি দুরূহ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করে গিয়েছেন। ১৮৬৯ সালে তিনি নিযুক্ত হন আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, এই কাজে দীর্ঘকাল তিনি বহাল ছিলেন, ১৮৮৪ পর্যন্ত। ১৮৭২ সালে তিনি নবগোপাল মিত্র সহ ব্রাহ্মধর্ম-বোধিনী-সভার সম্পাদক হন, আনুমানিক ১৮৭৪ পর্যন্ত এই কাজ করেন। এই সভার কাজ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৭২ সালের ১০ই মার্চ আদিব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন, উদ্দেশ্য "ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া সাধারণ লোককে ব্রাহ্মধর্ম উপদেশ প্রদান।" এই সভার অস্তিত্ব ছিল বছর-দুই— আয়ুষ্কালের সম্পূর্ণটাই সম্পাদক হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সভার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন।

নবগোপাল মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হিন্দুমেলার উপলক্ষ্যে, সেই পরিচয় ক্রমশ অন্তরঙ্গ হয়েছে এবং ব্রাহ্মধর্মবোধিনী-সভায় একত্র কাজ করার দরুন পরিচয় আরো নিবিড় হয়েছে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যোগ্যতারও পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এই সভার আয়ু শেষ হল, সঙ্গেসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর অর্পিত হল অন্যকাজ— ১৮৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নিযুক্ত হলেন হিন্দুমেলার সংশ্লিষ্ট সম্পাদক, এক বছর তিনি এই পদে বহাল ছিলেন— ১৮৭৫এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

এইসব কাজের সঙ্গে তাঁর অন্যান্য কাজও চলছে— ব্রহ্মসংগীতরচনা, নাট্যরচনা, জমিদারি-পরিদর্শন, এবং কনিষ্ঠভ্রাতা রবীন্দ্রনাথকে প্রমোশন দিয়ে নিজেদের দলে গ্রহণ করে উৎসাহ দান। সেসব কথা যথাস্থানে হবে।

যে সময়ে তিনি হিন্দুমেলার সংশ্লিষ্ট সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন (১৮৭৪) সেই সময়েই, সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বশতই, তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যাপৃত হন, সে প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে 'বিদ্বজ্জন-সমাগম'। এইরূপ সমাগমের দ্বারা সাহিত্যসেবীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা যাতে সম্ভব হয় এবং তদ্দ্বারা নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়— এই উদ্যোগের এই ছিল উদ্দেশ্য। সাহিত্যিকদের এই সম্মিলনীর নামকরণ করেছিলেন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ। এই 'সমাগমে' বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকবর্গ নিমন্ত্রিত হতেন। এখানে নাটকাভিনয় গীতবাদ্য ও কবিতাদি-পাঠ হত। 'বিদ্বজ্জন-সমাগমে'র প্রথম অধিবেশন হয় জোড়াসাঁকো-বাটীতে ১২৮১ বঙ্গাব্দের ৬ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল ১৮৭৪)[৫]। এই প্রথম অধিবেশনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত 'পুরুবিক্রম' নাটকের উদ্দীপনা অংশ পাঠ করা হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা' এই সমাগমে অভিনীত হয় ১৬ ফাল্গুন ১২৮৭ (১৮৮১)[৬]। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই সম্মিলনী উপলক্ষ্যেই বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত হয়।"[৭] তাঁর দ্বিতীয় গীতিনাট্য 'কালমৃগয়া'ও 'বিদ্বজ্জন-সমাগম উপলক্ষে অভিনয়ার্থ রচিত'; এবং ১৮৮২ সালের ২৩ ডিসেম্বর অভিনীত হয়। ইতিপূর্বে ১৮৭৭ সালের অধিবেশনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসন ও ১৮৮০ সালের অধিবেশনে গীতি-নাটিকা 'মানময়ী' ও তৎপরে ১৮৮৪ সালে

'হঠাৎ নবাব' প্রহসন অভিনীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে অলীকবাবুর ভূমিকাভিনয় করেন, এই তাঁর জীবনে প্রথম অভিনয়।' এবং 'কালমৃগয়া' নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অভিনয় করেন দশরথের ভূমিকা।

বিদ্বজ্জন-সমাগম কয়েক বৎসর জীবিত ছিল, এবং শেষ অধিবেশন হয় সম্ভবত ১৮৮২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'কালমৃগয়া' নাটকাভিনয় দ্বারা।"

বিদ্বজ্জন-সমাগমের আয়ু যতটুকুই হোক, সেই স্বল্পায়ুজীবনেই এই সমাগমের দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের কিছুটা উপকার সাধিত হয়েছে। তৎকালীন সাহিত্যরথীরা সকলে এখানে মিলিত হয়ে সাহিত্যিক আবহাওয়া যেমন প্রসন্ন করে তুলতে পেরেছিলেন, সেইসঙ্গে এই উপলক্ষে তরুণ সাহিত্যিকেরাও নাটিকাদিরচনার উৎসাহ পেয়ে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন।

এই সমাগমের আয়ু সংকীর্ণ হলেও এই প্রতিষ্ঠান-গঠনের পিছনে মনের যে উদার বাসনা ছিল তার প্রমাণ রূপে অচিরেই দেখা দিল আর-একটি প্রতিষ্ঠান, তার নাম 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন', বা সংক্ষেপে, 'সারস্বত সমাজ'। এর প্রথম অধিবেশন হয় ২ শ্রাবণ ১২৮৯ (১৭ জুলাই ১৮৮২)— ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর গলিতে।

দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্যে তিনি বিবিধ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, সেসকলের উল্লেখ পরে করছি। সাহিত্য-বিষয়ক কর্মোদ্যমের কথা যখন আরম্ভ হয়েছে, সুতরাং সেই প্রসঙ্গে এই কলিকাতা সারস্বত সম্মিলনীর কথা বলে নেওয়াই সম্ভবত সমীচীন। এই সম্মিলনী-স্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তিনটি— ১. বঙ্গভাষার অভাবমোচন, ২. বাংলা গ্রন্থাদির আলোচনা করে বাংলা সাহিত্যের উন্নতিসাধন এবং সাহিত্যরচনায় উৎসাহবর্ধন, ৩. সাহিত্যের অনুরাগীদের পরস্পরের মধ্যে সখ্য স্থাপন।

এই সম্মিলনী-গঠনের কল্পনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মাথায় উদয় হওয়া মাত্র তিনি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে পরামর্শ নিতে যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, "তোমরা বড়মানুষের ছেলে, কোনো বদ্‌খেয়ালি না করিয়া এইসব লইয়া যদি সময় কাটাও তো সে ভালোই। কিন্তু, বাবা, একটা কথা আমি তোমাদের বলিয়া দিতেছি। বড় বড় হোমরা-

চোমরা লোকদের ইহার মধ্যে লইও না— তাহা হইলেই সব মাটি হইয়া যাইবে।"[৯]

বাল্যকালের এ ঘটনার কথা রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট মনে ছিল, তিনি এর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর জীবনস্মৃতিতে।

হোমরা-চোমরাদের এর মধ্যে নিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিষেধ করে-ছিলেন, অনেক দেখে ও অনেক ঠেকেই সম্ভবত তিনি এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু ছোটরা কোনো-একটা কাজে নামার সময়ে বড়দের সহায় রূপে চায়ই। সুতরাং হোমরা-চোমরাদের নিতেই হল। রবীন্দ্রনাথের মতে, "রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা।"[৭]—এমন লোককে ছাড়া গেল না। তিনি হলেন সভাপতি এবং রবীন্দ্রনাথ হলেন অন্যতর সম্পাদক।

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ এই সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের যে বিবরণ রচনা করেন রবীন্দ্রসদনে তা রক্ষিত আছে, তার থেকে কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করি—

"অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে বর্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের কর্মচারীরূপে নির্বাচিত হইলেন—

সভাপতি। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র

সহযোগী সভাপতি। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ডাক্তার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদক। শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"[১০]

স্থির হয়, বিদ্যার উন্নতিসাধন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য। তার পরে অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে কয়েকটি নামের মধ্য থেকে প্রতিষ্ঠানটির নাম ঠিক হয়— সারস্বত সমাজ। বঙ্কিমচন্দ্র এর নাম প্রস্তাব করেছিলেন অ্যাকাডেমি অব বেঙ্গলি লিটারেচর, অর্থাৎ, যার বাংলা করা যেতে পারে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। তখন এই বাংলা নামও গৃহীত হয় নি বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, "বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বর্তমান সাহিত্য-পরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সংকল্পিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।"

ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়েই এই সমাজ প্রথম উদ্যোগী হয়। পৃথিবীর

সমস্ত দেশের নাম সেই-সেই দেশে যে ভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে তদনুযায়ী সেইসব দেশের নাম লিপিবদ্ধ করার সংকল্পও এই সভার ছিল। এই ভৌগোলিক পরিভাষা রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই সমাজের সভাপতি ১২৮৯ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ তারিখের অধিবেশনে এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, বিভিন্ন গ্রন্থকার তাঁদের প্রণীত ভূগোল বইতে নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, মানচিত্রেও এইরূপ রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। এইসব অসামঞ্জস্যের দরুন শিক্ষার্থীদের বিশেষ অসুবিধা হয়। এর বিস্তর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে পরিভাষা রচনা কতটা প্রয়োজন তা বিবৃত করা হয়। এইজন্য সভায় স্থির হয় যে, কয়েকজন সভ্য দ্বারা একটি সমিতি গঠিত হোক, প্রথমত তাঁরা পরিভাষা সম্বন্ধে একটা মীমাংসায় উপনীত হয়ে সাধারণ সভায় তা পেশ করবেন। এই সমিতি গঠিত হয়, তার সভ্য মনোনীত হন— কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর একটি পত্র এখানে উদ্ধার করা সমীচীন মনে হয়। সারস্বত সমাজের প্রস্তাব কতটা গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হত, এর দ্বারা তার কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে।—

৪ আষাঢ় [১২৯০ ?] তারিখ সম্বলিত দেওঘর থেকে সারস্বত সমাজের সম্পাদক মহাশয়কে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে) লিখিত পত্রে বলা হয়—

"আপনার প্রেরিত 'ভৌগোলিক পরিভাষা' বিষয়ক মুদ্রিত প্রস্তাব পাইয়াছি। ব্যবহার উন্মত্ত মাতঙ্গ : তাহা অঙ্কুশ মানে না। ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্র বসিয়া বসিয়া নিয়ম করেন, সে তাহা না মানিয়া হাস্য করত প্রচণ্ড বেগে চলিয়া যায়। বিদ্যারূপ দেশের লোক সাধারণতন্ত্রের লোক, কেহ কাহার কথা শুনে না। তাহাদিগকে বশে আনা মুশকিল। 'Irritabile vates-trition'। আমার অনুরোধ এই, আমাদিগের সমাজকে ব্যবহারের নিকট অপমানিত না হইতে হয়। যেসকল পারিভাষিক শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা উচিত নহে; যথা, উপদ্বীপ প্রণালী যোজক অম্লজান উদজান প্রভৃতি; যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে কেহ শুনিবে না। যেসকল অপপ্রয়োগ ভাষায় সবে ঢুকিতেছে অর্থাৎ দুই-তিনখানি বহিতে সবে

মুখ বাহির করিয়াছে তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানো কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত যেসকল ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দ আমাদিগের ভাষায় ঢুকে নাই কিন্তু পরে ঢুকিবার সম্ভাবনা তাহার প্রতিশব্দের অভিধান এই বেলা করিয়া রাখিলে ভালো হয়। তদ্দ্বারা ভাবী গ্রন্থকর্তাদিগের বিশেষ উপকার হইবে। আপনার প্রেরিত প্রস্তাবটিতে যেসকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে কোনো সুবোধ ব্যক্তি কিছুমাত্র আপত্তি করিতে পারেন না— সেগুলি এত পরিপাটি হইয়াছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের প্রতি না খাটাইয়া অন্য প্রকার শব্দের প্রতি খাটাইলে ভালো হয়। যখন ব্যবহার দাঁড়াইয়াছে তখন আমরা কি করিব? এ বিষয়ে আমাদিগের হাত-পা বাঁধা। কোনো কোনো শব্দ উপযুক্ত নহে তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কি করা যাইবে? English Channel একটি উপসাগরের নাম, Channel শব্দে কেবলমাত্র জল যাইবার রাস্তা বুঝায়, তাহা এরূপ উপসাগরের প্রতি কখনো খাটিতে পারে না। কিন্তু কি করা যায়? তাহা ইংরাজিতে পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর উপায় নাই। সেইরূপ যোজক প্রভৃতি শব্দ জানিবেন। যোজক শব্দের পরিবর্তে এখন 'স্থলসংকট' ব্যবহার করিতে গেলে লৌকিক বিদ্যাড়ম্বরসূচক (pedantic) মনে করিবে। ইতি

বশম্বদ

শ্রীরাজনারায়ণ বসু"[৩]

অসীম উৎসাহ নিয়ে কাজে নেমেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। কিন্তু এর কোনো কর্মকর্তার মধ্যে তাঁর নাম নেই। নাম নেই, কিন্তু তিনি ছিলেন এর প্রাণ-স্বরূপ। যা নেই তা গড়ে তোলার প্রতি তাঁর আগ্রহের প্রমাণস্বরূপ দেখা দিয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান।

এই প্রতিষ্ঠান-গঠনের পিছনে তাঁর অনেক চিন্তা ও সময় যে ব্যয়িত হয়েছে তারও প্রমাণ আছে। ২ শ্রাবণ ১২৮৯ তারিখে এর প্রথম অধিবেশ বসে। তার পূর্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর খসড়া গঠনপ্রণালী সাধারণ্যে পেশ করেন। ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী'তে তিনি 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি প্রথমেই ঘোষণা করেন, "বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ও বঙ্গ-হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই বোধ হয় শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, কলিকাতা

সারস্বত সম্মিলন নামক বঙ্গ-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-সংগীত প্রভৃতি বিষয়িণী একটি সমালোচনী সভা কলিকাতায় স্থাপিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে।"[১১] এই ঘোষণার পর তিনি এই সম্মিলনের অনুষ্ঠান-পত্র ও নিয়মাবলী থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে বলেন, "বিদ্বজ্জনগণের একত্র সম্মিলনের অনেকগুলি শুভফল আছে।"

বিদ্বজ্জন-সমাগমেরই পরিণত অবস্থা, অথবা রূপান্তর, এই সম্মিলন।—পরে অবশ্য নামটি স্থির হয় সারস্বত সমাজ।

সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে মতের আদান-প্রদানে পরস্পরের মধ্যে সৌহৃদ্য সৃষ্টি দ্বারা সাহিত্যের ব্যাপক উন্নতিসাধনই এই সমাজের উদ্দেশ্য। সেই উন্নতি কিভাবে সাধিত হতে পারে তার প্রস্তাবও উক্ত রচনায় পেশ করা হয়েছে— এখানে গ্রন্থাদি সমালোচিত হবে নিরপেক্ষ ভাবে। এইরূপ সমালোচনায় রচয়িতারা তাঁদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে যেমন তা সংশোধনে তৎপর হবেন, রচনার সৌকর্য সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে উৎসাহিতও হবেন— এই হচ্ছে এই কার্যের উদ্দেশ্য। লেখকবর্গকে উৎসাহিত করার জন্যে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়ার বিষয়ও উল্লেখ করা হয়। এর শুভফল আছে— যদি বিচার ত্রুটিশূন্য হয়, সেই শুভফলের আশায়ই এই প্রস্তাব। এ ছাড়া, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য অনুশীলনের সুবিধার জন্যে নূতন কথা সৃষ্টি করে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ অভিধান রচনা ও বিদেশী ভাষার শব্দ বাংলা অক্ষরে যাতে লেখা যেতে পারে, তার জন্যে নূতন অক্ষরের উদ্ভাবন— জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রস্তাবের মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। তাঁর কল্পনা ও পরিকল্পনা সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে বা সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের আয়তন বৃদ্ধি করার জন্যে তিনি সুনির্দিষ্ট একটা প্ল্যান তৈরি করে নিয়ে তবে নেমেছিলেন এই সংস্থাটি গঠনের কাজে। তিনি যে প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন সেই প্রস্তাব তিনি পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করে সুধীসমাজের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট করেন। বাংলা সাহিত্যের উন্নতিসাধনের জন্যে তাঁর ব্যগ্রতার লক্ষণ এতে প্রকাশিত হয়েছে অতি পরিচ্ছন্নভাবে।

তিনি সাহসের সঙ্গে এই প্রস্তাব নিয়ে যখন উপস্থিত হলেন তখন নিশ্চয় আশা ছিল যে, তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে। কিন্তু সাহসের সঙ্গে

সংশয়ও তাঁর ছিল। উপসংহারে তাই তিনি বলেছেন, "সভার স্থায়িত্বের প্রতি এখন কেবল একটি মাত্র সংশয় আছে। আমাদের সাহিত্যসংসারে অনেকগুলি দলপতি। প্রায় সকল দলপতিই একস্থানে সমবেত হইয়াছেন; এক্ষণে যদি তাঁহারা ক্ষুদ্র দলাদলির ভাব ত্যাগ করিয়া, নিজের ক্ষুদ্র অভিমান বিসর্জন করিয়া, উৎসাহের সহিত এক-হৃদয়ে সরস্বতীর সেবায় নিযুক্ত হন তবেই সারস্বত সম্মিলনের পক্ষে মঙ্গল, নচেৎ যে আয়োজন করা হইতেছে সে কেবল বাঙালির আর-একটি কলঙ্ক-ধ্বজা স্থাপনের নিমিত্ত।"

কিন্তু দলপতি সর্বকালেই আমাদের মধ্যে আছেন, এবং এইজন্য দলপতি সর্বকালেই আমাদের নিত্যসহচর। যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এই সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল, সে উদ্যমের ভার কেবল একজনের বহন করা সম্ভব নয়। এই সমাজের পরিকল্পনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, তিনিই এর নায়ক, কিন্তু নেপথ্য-নায়ক; কর্মকর্তাদের মধ্যে তাঁর নাম নেই। সভাপতি রাজেন্দ্রলালই প্রায় সব কাজ করতেন। কিন্তু দশের কাছে যা সোজা, একের পক্ষে তা বোঝা। কিন্তু কর্মীপরিষদে অন্যান্য যাঁদের নাম আছে তাঁদের সকলকে কার্যক্ষেত্রে পাওয়া যায় নি। "বঙ্কিমচন্দ্র সভ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।"—এ কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন, এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ না করে হোমরা-চোমরাদের নিয়েই তাঁরা কাজ আরম্ভ করেন, এবং তার পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, "দুই-তিন অধিবেশন পর্যন্ত বেশ কাজ চালিয়াছিল— কিন্তু তাহার পরেই নানা কারণে সভা বন্ধ হইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল।"[৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্যরথী ও অন্যান্য সাহিত্যানুরাগীদের নিয়ে তিনি যে কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, এবং অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে যার পরিকল্পনা তিনি পেশ করলেন 'ভারতী' পত্রিকায়, অনতিকালের মধ্যেই সে কাজে পরিসমাপ্তি ঘটল। পরিসমাপ্তি ঘটল বলা হচ্ছে বটে, কিন্তু তা বুঝি ঠিক নয়। মাটি তখন উর্বর ছিল না, বীজ তাই অঙ্কুরিত হতে পারে নি; কিন্তু অবশেষে সেই মাটি যখন সরস হয়ে উঠেছে তখন সেই অমর বীজটি মৃত্তিকার স্নেহরস লাভ করে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল নূতন নামে, সে নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

আমরা উল্লেখ করেছি, বঙ্কিমচন্দ্র সারস্বত সমাজের নাম প্রস্তাব করেছিলেন অ্যাকাডেমি অব বেঙ্গলি লিটারেচর, সে ঘটনা ১৮৮২ সালের জুলাই মাসের সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশনে। তার কয়েক বছর পরে, ১৮৯৩ সালের (১৩০০ বঙ্গাব্দের) জুলাই মাসে, কলকাতার গ্রে স্ট্রীটে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের গৃহে স্থাপিত হল বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচর। অচিরেই, ১৩০১ বঙ্গাব্দে, অ্যাকাডেমির নাম বদল হল, ইংরেজি নাম রূপান্তরিত হল বাংলা নামে, নাম হল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

বিদ্বজ্জন-সমাগমের সঙ্গে কলিকাতা সারস্বত সম্মিলনের কিছুটা সাদৃশ্য থাকায় এ দুটির কথা পর পর উল্লেখ করা হল। কিন্তু ইতিমধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর-একটি বৃহৎ ও মহৎ কাজে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। যে পত্রিকায় তিনি কলিকাতা সারস্বত সম্মিলনের প্রস্তাব দাখিল করেন সেই 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে সেই মহৎ কাজ। সে কাজ সারস্বত সম্মিলন বা সারস্বত সমাজ স্থাপনের কয়েক বছর আগের ঘটনা। ভারতীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে, ইংরেজি জুলাই ১৮৭৭।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্বদাই তৎপর, সর্বদাই নূতন কোনো কাজে হাত দেওয়ার জন্যে ব্যগ্র। সেইজন্যে সামান্য আলোচনাকে কেন্দ্র করে তিনি এক-একটা কাজের নিশানা যেন লাভ করতেন। একদিন তাঁদের তেতলার ঘরে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। কথায় কথায় ঠিক হল যে, সাহিত্যবিষয়ক একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করতে হবে। যেমন কথা তেমনি কাজ। বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তখনি এই সংকল্পের কথা জানাতেই দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর সম্মতি দিলেন।

এতে একটা বাধা যেন কেটে গেল, পথ বুঝি পরিষ্কার হয়ে গেল। পত্রিকা যে প্রকাশিত হবে এ বিষয় স্থির হয়ে গেল অবিলম্বেই। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল নাম নিয়ে। পত্রিকাটির কি নাম হবে। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'সুপ্রভাত' নাম করলেন, কিন্তু সে নাম জ্যোতিরিন্দ্রের ভালো লাগল না, এই নামের মধ্যে যেন একটু স্পর্ধার ভাব আছে, যেন এই পত্রিকার দ্বারাই বঙ্গসাহিত্যের আকাশে সুপ্রভাত আনা হচ্ছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিমত শুনে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্পর্ধাহীন একটি নাম উল্লেখ করলেন—'ভারতী'।



জ্ঞানদানন্দিনী সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবী



কাদম্বরী দেবী । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রতিকৃতি

বিভিন্ন কর্মে আত্মনিয়োগ তিনি করেছেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন কিন্তু কোনোটিরই আয়ু দীর্ঘ হল না। কিন্তু এই ভারতী— এই পত্রিকাটি দীর্ঘজীবন লাভ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যাবতীয় কর্মের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করে গিয়েছে।

এই পত্রিকাটি নিঃসন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানসকন্যা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহধর্মিণী পত্রিকাটির ছিলেন যেন জনক-জননী। এটি প্রস্তুত করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এবং একে লালন করেছেন কাদম্বরী দেবী।

"বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন"[১]— ভারতী প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ষোলো, কিন্তু উত্তরজীবনে তিনি বাল্যকালের ঐ ঘটনাটিকে ঐ ভাষায় স্মরণ করেছেন। আসলে দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক হলেও পত্রিকা প্রস্তুতের দায়িত্ব সম্পূর্ণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই। কেননা, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের মত একখানি কাগজ প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই যখন এই পত্রিকার উদ্ভব, তখন এটিকে ঠিক নিজের মনের মত করা চাই। বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৮৭২ সালে। তার পাঁচ বছর পরে ভারতীর উদয়। বঙ্গদর্শনের আয়ু দীর্ঘ হয় নি, কিন্তু ভারতী পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশিকাল টিকে ছিল। সাহিত্যপ্রচারে ও নূতন লেখক সৃষ্টি করার দিক থেকে বঙ্গদর্শনের সঙ্গে ভারতীর সাদৃশ্য আছে— এদিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে, কিন্তু বঙ্গদর্শনে ও ভারতীতে পার্থক্য এই যে, ভারতী লাভ করেছিল দীর্ঘ একটি জীবন। পত্রিকার ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ইচ্ছার জোর ছিল, তাঁর কাছে নতি স্বীকার করতেই হয়, দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, "জ্যোতির ঝোঁক হইল একখানা নূতন মাসিক-পত্র বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ভালো করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় ভারতী প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল।"[১২]

সবই জ্যোতির। জ্যোতির পরিকল্পনা, জ্যোতির ইচ্ছা, জ্যোতির ঝোঁক। সম্পাদক-নির্বাচন জ্যোতির। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর।

সবই জ্যোতি। কিন্তু পাদপ্রদীপের সামনে জ্যোতি নাই। জ্যোতির আসন সাজঘরে। নাটককে পুরোদস্তুর নাটকীয় করা চাই, তার প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা চাই; এককথায় আয়োজন যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় তার জন্যে যথোচিত পরিশ্রম দিতে হবে বলে নিজেকে প্রস্তুত রাখা চাই; এইজন্যে নিজ অঙ্গে সাজ না চাপিয়ে তিনি অন্তরালে রইলেন নিজস্ব পোশাক প'রে। এখানেও তিনি নেপথ্যনায়ক।

ভারতী প্রকাশের ব্যাপার নিয়েই নূতন বন্ধুলাভ হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। তিনি হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল চক্রবর্তী। পত্রিকাটির নাম সুপ্রভাত রাখা হল না, কিন্তু এ বুঝি সত্যিই সুপ্রভাত নিয়ে এল; কেননা এরই সঙ্গেসঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন এই নূতন কবিটি গলায় নতুন গান নিয়ে, বঙ্গসাহিত্যে নিশিভোরের ঘোষণা নিয়ে। ভারতীর জন্যে লেখা জোগাড় করার জন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এঁর গৃহে প্রায়ই যেতেন, সেই সূত্রে তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ নিবিড় হয়ে উঠল। বিহারীলাল তখন খ্যাতিমান কবি।

ঠাকুরপরিবারে তাঁর মর্যাদা যথেষ্ট। কয়েক বৎসর পূর্বে, ১৮৭৪ সালে, আর্যদর্শন পত্রিকায় বিহারীলালের সারদামঙ্গল প্রকাশিত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী এই কাব্যের মাধুর্যে মুগ্ধ, এর অনেকটা অংশ তাঁর মুখস্থ। তিনি কবিকে নিমন্ত্রণ করে মাঝেমাঝেই খাওয়াতেন এবং নিজের হাতে একখানি আসন[১৩] বুনে কবিকে উপহার দেন, তাতে সারদামঙ্গলের প্রথম সর্গের কয়েক ছত্র বোনা।

পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে গৃহে সাহিত্যিক আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। ঠাকুরপরিবারের পুত্রকন্যারা এতে তাঁদের নিজনিজ যোগ্যতা নিয়ে উপস্থিত।

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনা করে বাংলা সাহিত্যের একটি নূতন দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন। কবির জীবনের প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' ভারতী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পত্রস্থ হয়, দ্বিতীয় সংখ্যায় গল্পটি সমাপ্ত হয়। বাংলা সাহিত্যের এই নূতন বস্তুটি পরিবেশিত হয় তা হলে এই পত্রিকারই মারফত।

কিন্তু সেইটেই সব কথা নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্ববিধ চিন্তার বাহন

হয়েছিল এই ভারতী। সামান্য কয়েকপ্রকার কাজের মধ্যে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি, সহস্রপ্রকার কাজের মধ্যে নিজেকে মগ্ন করার অভাবনীয় প্রতিভার তিনি আধার।

দেবী-ভারতীর বন্দনা করার জন্যে তিনি যেন স্থাপন করেছিলেন এই বেদী। এই বেদীমূলে বসে তিনি নীরবে ধ্যান করেছেন, এবং সেই ধ্যানের দ্বারা যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তা সর্বসাধারণকে দান করার জন্যে তা অর্পণ করেছেন এই ভারতীতেই। তাঁর বহু রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতী প্রকাশের কথা ওঠে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে নানা প্রকার কথা বলতে বলতে, এ বিষয় আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। অক্ষয়চন্দ্র ভারতীর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁর পত্নী বিবিধ গ্রন্থরচয়িত্রী শরৎকুমারী চৌধুরানী, সেই আমলের একটি স্মৃতিচিত্র রচনা করেন— ১৩২৩ সালে শ্রাবণ মাসে ভারতীর চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে তা রচিত। পত্রিকাটিতে লেখক হিসাবে ছাড়া অন্যভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু তিনিই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং অশেষ স্নেহে একে লালন করেন— এ কথা সর্বজনবিদিত হলেও তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত যেন নয়। শরৎকুমারী চৌধুরানীর উক্ত রচনা থেকে ভারতী পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কি ভূমিকা ছিল তা বিশদ ভাবে জানা যায়। শরৎকুমারী লিখেছেন, "যদিও শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামটি কখনোই 'ভারতী'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'ভারতী' জ্যোতিবাবুরই মানসকন্যা। আমি পঞ্জাব হইতে আসিয়া শুনিলাম যে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের কল্পনাজল্পনা চলিতেছে; প্রবন্ধাদি রচিত ও সংগৃহীত হইবার আয়োজন হইতেছে। একটি হল্‌দে রংএর বাক্স হইল 'ভারতী'র ভাণ্ডার; প্রথমে সেটি জ্যোতিবাবুর কাছেই থাকিত।... সে সময়ে প্রতি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীর ভাণ্ডার লইয়া আমাদের বাড়িতে [মানিকতলা স্ট্রীট] আসিয়া 'ভারতী' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে 'তাঁহাকে' [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী] লইয়া ৺বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইতেন এবং সেখান হইতে জোড়াসাঁকো ফিরিয়া যাইতেন।... কোনো কোনো দিন বৈকালে

৺জানকীবাবুর [জানকীনাথ ঘোষাল] রামবাগানস্থ বাড়িতে যাইতাম—সেখানে ন-বৌঠাকুরানী, নতুন বৌ [কাদম্বরী দেবী], জ্যোতিবাবু, রবিবাবু প্রভৃতিও আসিতেন।…সকলে মিলিত হইলে 'ভারতী'র জন্য রচিত নূতন প্রবন্ধাদি পাঠ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের গান হইত, পরে আহারাদি সমাপনান্তে বাড়ি ফিরিতে রাত্রি দশ-এগারোটা বাজিয়া যাইত।…দেখিতে দেখিতে শ্রাবণ মাসে একদিন 'ভারতী' প্রকাশিত হইল।…পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইলেন সম্পাদক।"[১০]

যে পত্রিকা দীর্ঘকাল ধরে বহু প্রতিভাবান সাহিত্যিক-সাহিত্যিকার রচনা প্রকাশ করে বঙ্গভারতীর সেবায় নিযুক্ত ছিল, এই ঘরোয়া চিত্রটি থেকে তার প্রাথমিক উদ্যোগের ও উদ্যোক্তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নির্লিপ্তভাবে বসে বসে প্রাপ্ত রচনা ছাপাখানায় পাঠিয়ে পাঠিয়ে মাসান্তে একটি করে কাগজ বের করা— ঠিক এরকম মনোভাব নিয়ে এ পত্রিকা বের হয় না। এর পিছনে নিষ্ঠা ছিল, চেষ্টা ছিল; প্রকৃত একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করতে হলে সাহিত্যের প্রতি যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা থাকা দরকার, তাও অবশ্যই ছিল। একটি কল্পনাকে রূপ দেবার জন্যে সামান্য শৌখিন বিলাসিতা থেকে যে পত্রিকাটির জন্ম নয়, তাও পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে ঐ চিত্র থেকেই। গৃহে গৃহে গমন ও গবেষণা, আলোচনা ও বৈঠক— সকলের অভিমত জেনে নিয়ে এবং সকলের পরামর্শ নিয়ে ভারতীকে অলংকৃত করার জন্যে স্বর্ণকারের এ যেন স্বর্ণসন্ধান।

পতির পুণ্যেই সতীর পুণ্য বটে, কিন্তু পতির উদ্যোগের পিছনে সতীর প্রেরণা যদি থাকে, সতীর পক্ষে সেটি স্বোপার্জিত পুণ্য। কাদম্বরী দেবী সেই পুণ্যবতী। 'ভারতী' বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই উৎসাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর পত্নীর সহযোগিতা। বাংলাদেশ যাঁকে মনে না রেখে হতভাগ্য করেছে, তিনিও যে ভাগ্যবান্ ছিলেন, শরৎকুমারী তারও সামান্য বর্ণনা দিয়েছেন, বলেছেন, "ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি-পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল [কাদম্বরী দেবী, মৃত্যু ১৯ এপ্রিল ১৮৮৪]— ভারতীর সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, মালা গাঁথেন না, ভারতী ধূলায় মলিন।"[১০]

সাহিত্যানুরাগী এই মহিলার তিরোধানের পরই পত্রিকার পরিচালকেরা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁদের অন্যতম—স্থির করলেন পত্রিকা আর প্রকাশিত হবে না। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঘোষণা করলেন "ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।"

কিন্তু প্রকাশ রহিত হল না। স্বর্ণকুমারী দেবী দায়িত্ব গ্রহণ করে 'ভারতী'-প্রকাশে আত্মনিয়োগ করলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর পত্নীর সম্বন্ধে এই কথাটুকু না বললে চিত্রটি সম্ভবত অসম্পূর্ণ থাকত। কিন্তু চিত্র সম্পূর্ণ হল বটে, কিন্তু পত্নীবিয়োগে জ্যোতিরিন্দ্রের জীবন বুঝি অসম্পূর্ণ হয়ে গেল। তাঁর জীবনে একটা বড় রকমের ফাঁক এসে গেল।

কর্মপ্রাণ মানুষ সে ফাঁক পূরণে সিদ্ধহস্ত। অবিলম্বে আমরা তাঁকে পাই নূতন কর্মে আত্মমগ্ন। পত্নীবিয়োগের পর এক মাস কয়েক দিন মাত্র গত হয়েছে, বরিশালে স্বদেশী ষ্টিমার পরিচালনায় রত হয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (২৩ মে ১৮৮৪)।

১ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গীতাপাঠ'

২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র : বালগঙ্গাধর টিলক-কৃত 'গীতারহস্য' নামক মরাঠি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। প্রকাশ ১৯২৪

৩ মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'

৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি', প্রবাসী ১৩১৮ মাঘ

৫ 'ভারত-সংস্কারক' সংবাদপত্রের ২৪ এপ্রিল ১৮৭৬ সংখ্যায় সভার প্রথম অধিবেশনের বিবরণ প্রকাশিত হয়। দ্র° ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সেকালের কথা', প্রবাসী ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', গ্রন্থপরিচয়। সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৬৮।

৬ এই তারিখটি উদ্ধার করেন ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন। দ্র° বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি'

৮ রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, "আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার এই সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল, ইহাই শেষবার।" রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফেরেন

১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, তৎপরে, ১৬ই ফাল্গুন ১২৮৭ (১৮৮১), সমাগমের একটি অধিবেশন হয়— বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনীত হয়। অতঃপর 'কালমৃগয়া' অভিনীত হয় ১৮৮২ সালের এক অধিবেশনে। সুতরাং তাঁর প্রথম বিলাত-প্রত্যাগমনের পরই এর শেষ অধিবেশন নয়।

৯ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'

১০ শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও সারস্বত সমাজ', বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

১১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রবন্ধমঞ্জরী'

১২ বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', দ্বিতীয় পর্যায়

১৩ আসনটির নাম 'সাধের আসন'। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এটি রক্ষিত আছে। বিহারীলাল উত্তরকালে এই আসনটি উপলক্ষ্য করে কাব্যরচনা করেন, সে কাব্যের 'সাধের আসন'। কাব্যের ভূমিকায় তিনি লেখেন, "কোনো সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী আমার সারদামঙ্গল পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া চারি মাস যাবৎ স্বহস্তে বুনিয়া একখানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন।...সেই আসনদাত্রী দেবী এখন জীবিত নাই।...এই ক্ষুদ্র খণ্ড-কাব্যের উপহৃত আসনের নামে নাম রহিল 'সাধের আসন'।"

১৪ 'ভারতীর ভিটা'—রচনা আষাঢ় ১৩২৩। বিশ্বভারতী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা।

নাট্যশালাস্থাপন ও নাট্যাভিনয়

বাংলাদেশে নাট্যশালা প্রথম স্থাপিত হয় ১৭৯৫ সালে এক বিদেশীর দ্বারা—তাঁর নাম হেরাসিম লেবেডেফ। এই রুশ ভদ্রলোক কয়েক বছর পরেই এ দেশ ত্যাগ করেন, কিন্তু তিনি একটি কীর্তি রেখে গেলেন, বঙ্গদেশে তিনি নাট্যালয়ের সূত্রপাত করলেন। তাঁর এই নাট্যশালায় অভিনয় করতেন এই দেশের লোকেরাই। কিন্তু যেহেতু এর প্রতিষ্ঠাতা দেশী লোক নন, এই জন্যে একে পুরো দেশী প্রতিষ্ঠান বলা চলে না।

তার পর কিছুকাল গত হয়, এ দেশে নাট্যালয় আর প্রতিষ্ঠিত হয় না। ১৮২৬ সাল পর্যন্ত এইরূপ অবস্থার বিষয় জানা যায়, ঐ সময় 'সমাচারচন্দ্রিকা' বাংলায় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

অবশেষে তেমন পাকাপোক্ত ভাবে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত না হলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে শখের দলের নাট্যাভিনয় হতে থাকে। খেউড় বা কবিগান দ্বারা চিত্তবিনোদনে বীতস্পৃহ হয়েই ক্রমশ শখের দলের উৎপত্তি হতে আরম্ভ করে। এবং ধীরে ধীরে নাট্যালয়-গঠনের জন্য সুধী ও ধনী মহলে উৎসাহের সঞ্চার দেখা যায়।

এ আমলে আমরা যে জিনিসের অভাব প্রত্যক্ষ করি, সে আমলে সেই জিনিসের প্রাচুর্য ছিল। সে জিনিসটি হচ্ছে শখ। শখ না হলে সেকালে সুখ ছিল না। সেইজন্যে সেকালের মানুষের জীবনধারণের নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে যেমন পাওয়া যায় ঘুড়ি-ওড়ানো, বুলবুলির লড়াই, তেমনি আরও একটা দিকও আছে, যেমন নাচগান আমোদপ্রমোদ নাটকাভিনয়। এই রকম শৌখিনতার অনেক গল্প আছে। এসব জানার কথা আমাদের নয়; জানার কোনো উপায়ও সম্ভবত থাকত না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেকালের মানুষ যাঁরা একাল অবধি বেঁচে ছিলেন, তাঁরা তাঁদের জীবনসায়াহ্নে তাঁদের বাল্যকালের স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে ঐসব কথা আমাদের জানিয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), তাঁর 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইতে এসব কথা আছে।

অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ইনিই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবিধ প্রকার শখের সঙ্গী ছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শিল্প জিনিসটা কি, তা বুঝিয়ে বলা বড় শক্ত। শিল্প হচ্ছে শখ। যার সেই শখ ভিতর থেকে এল সেই পারে শিল্প সৃষ্টি করতে, ছবি আঁকতে, বাজনা বাজাতে, নাচতে, গাইতে, নাটক লিখতে— যাই বল।"¹

অবনীন্দ্রনাথের উক্তি যদি আমরা মানি, তা হলে আমাদের মানতে হবে— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন একজন সেরা শৌখিন লোক। তিনি উল্লিখিত শিল্পের প্রায় সব-কয়টাতেই তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে গিয়েছেন।

সেকালের মানুষের মনে এই শখ ছিল বলে ধীরে ধীরে বাংলাদেশে শখের নাট্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল— কলকাতা শহরে ও মফস্বলে। গত শতকের মধ্যভাগে কলকাতার নাট্যজগতে নবজীবনের সূত্রপাত হল। বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হল সাতুবাবুর বাড়িতে। এই উৎসাহের পূর্ণবিকাশ ঘটল বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায়। এই নাট্যশালায় অভিনীত হল মাইকেল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'। এ ঘটনা ১৮৫৯ সালের। তার পর পাথুরিয়াঘাটায় ও শোভাবাজারে নাট্যশালা স্থাপিত হয়। শোভাবাজারে মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৫ সালের ১৮ই জুলাই।

এর পরের উল্লেখযোগ্য নাট্যশালা হল জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে গঠিত হয়। এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। গোপাল উড়ের যাত্রা শুনেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংকল্প জাগে।

শখের কথা আমরা বলেছি। তখন শখ ষোলো-আনা। বাড়িতে গান-বাজনা লেগেই আছে। বড় বড় গায়কদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন সংগীতচর্চাতেই বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। নাটক অভিনয় করার দিকেও প্রবল ঝোঁক ছিল। অভিনয়-ব্যাপারে সঙ্গী গুণেন্দ্রনাথের অনুরাগ যথেষ্ট। তাঁরা দুইজনে মিলে বাড়িতেই একটি নাট্যগোষ্ঠী সৃষ্টি করলেন। অভিনয় সংক্রান্ত বিবিধ কাজের জন্যে তৈরি হল একটি কমিটি, তার নাম দেওয়া হল কমিটি অব ফাইভ; অর্থাৎ এ হল নাটকের

এক পঞ্চায়েৎ। এর পাঁচজন সভ্য হলেন— কৃষ্ণবিহারী সেন, অক্ষয়কুমার চৌধুরী, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

এই সময়ে তাঁরা একটা ক্লাবও গড়েছিলেন, নাম ঈটিং ক্লাব (eating club)। ক্লাবের কাজ ছিল পালা করে এক-এক জনের বাড়িতে খাওয়া। সে ভোজের আয়োজন বেশি ছিল না। লুচি কচুরি সন্দেশ ইত্যাদিই খাওয়া হত। এও একরকমের শখ।

কৃষ্ণবিহারী হলেন কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা। ইতিপূর্বে তিনি 'বিধবা-বিবাহ' নাটকে অভিনয় করেন। নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় মেট্রোপলিটন থিয়েটরে ১৮৫৯ সালে, কেশবচন্দ্র ছিলেন রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ। সম্ভবত কৃষ্ণবিহারী এই সময়েই অভিনয় করেন। তিনি অভিনয় জানেন, সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের এই দলের তিনিই হলেন অভিনয়শিক্ষক। এ ঘটনা ১৮৬৫ সালের। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোলো। সেই সময়ে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল এই নাট্যশালা। এই নাট্যশালাই ইতিহাস-ভুক্ত হয়েছে 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা' নামে।

তাঁদের সেই ছেলেখেলার— সেই অদ্ভুত নাট্যের— পরিণতি এখানে।—

ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না,
বলছ, বঁধু, কিসের ঝোঁকে—

সেই গানের অন্তস্তলের ঝোঁকটি কোথায় তা বুঝি জানা গেল এইবার।

নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠার পর এখানে প্রথমে অভিনীত হয় মধুসূদনের 'কৃষ্ণ-কুমারী'; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রী-ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন— তিনি কৃষ্ণকুমারীর মাতা অহল্যা দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। তার পর মধুসূদনেরই প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হয়। এই নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন পুরুষভূমিকা, তিনি সাজেন সারজন।

স্ত্রী ও পুরুষ ব'লে নয়, দুইটি চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। একটি হচ্ছে স্নেহশীলা মাতার, অপরটি একটি ফিরিঙ্গির— যে বাংলায় কথা বলতে পারে না, আর বুলি না-হিন্দি না-বাংলা না-ইংরেজি, যার মেজাজ সব সময় তিরিক্ষে।

এই দুই ধরণের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। কেননা, "দুই বারই অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল"[৩]।

অভিনয়ে তাঁর এই দক্ষতার খবর আমরা পাই। এই সাফল্যের জন্যে কৃষ্ণবিহারীর শিক্ষকতা অথবা অভিনেতার যোগ্যতা যা-ই কেননা দায়ী হোক, অভিনয়ে যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবণতা ছিল তা অবশ্যই বোঝা যায়।

এঁদের উদ্যোগে গড়ে উঠল নাট্যশালা। দুটি অভিনয়ও হল। কিন্তু একই নাটক বার বার অভিনয় করা চলে না, বিশেষত এই শখের নাট্যালয়ে। সুতরাং নূতন নাটকের খোঁজ আরম্ভ হল।

অভিনয়োপযোগী অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাংলা নাটকের বিশেষ অভাব তাঁরা অনুভব করতে লাগলেন। ঠাকুরবাড়ির গৃহশিক্ষক ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির প্রধানশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর শরণাপন্ন হয়ে তাঁরা সামাজিক নাটকের উপযোগী বিষয় নির্বাচন করে দেবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানালেন। তিনি বিষয় ঠিক করে দিলেন, এবং ঠিক হল নির্বাচিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট নাটক রচনার জন্যে সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। বিষয় ঠিক হল তিনটি— ১. বহুবিবাহ, ২. হিন্দুমহিলাগণের দুরবস্থা, ৩. পল্লীগ্রামের জমিদারদের অত্যাচার।

প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে নাটক রচনার জন্যে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ'এ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় (১৮৬৫)। কিন্তু উপযুক্ত কোনো নাটক হস্তগত না হওয়ায় স্থির হল পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-১৮৮৬) উপর এই বিষয়ে নাটক রচনার ভার দেওয়া হোক। অপর দুইটি বিষয়ে নাটক রচনার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ১৮৬৫ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পাক্ষিক সংবাদপত্রে।

রামনারায়ণ তখন বিখ্যাত নাট্যকার, নাটকরচনার জন্যে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত এবং নাটুকে রামনারায়ণ নামে তিনি তখন পরিচিত। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক লিখে তখন তিনি যশস্বী হয়েছেন। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা আছে; দ্বিজেন্দ্রনাথ এঁর কাছে সংস্কৃতপাঠ নিতেন।

পণ্ডিত রামনারায়ণ নাটকটি রচনা করলেন, নাম দিলেন দীর্ঘ— 'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক'। ১৮৬৬ সালের মে মাসে নাটকটি প্রকাশিত হয়। ইনি ইংরেজি জানতেন না, খাঁটি দেশীয় আদর্শে নাটক রচনা করাই এঁর রীতি ছিল, এই নাটকটিও তিনি সেই আদর্শেই রচনা করেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

মতে তিনি "আমাদের বাঙ্গালার সর্বপ্রথম ন্যাশনাল ড্রামাটিস্ট— জাতীয় নাট্যকার"। কিন্তু এই নাটকে বিদেশী আদর্শের সামান্য মিশ্রণ অবশ্য ছিল; দেশী নাটক, অর্থাৎ সংস্কৃত নাট্য, বিয়োগান্তক হয় না; ইঙ্গবঙ্গদের রুচিকে প্রশ্রয় দিয়ে রামনারায়ণ এই নাটক বিয়োগান্তক করেন।

বাড়ির অল্পবয়স্ক ছেলেদের উৎসাহে ব্যাপারটি এতদূর গড়িয়েছে দেখে বড়র দল এগিয়ে এলেন। ছেলেরা নাট্যশালা স্থাপন করেছে, এবং নাটক পর্যন্ত লিখিয়ে নিয়েছে। বড়র দল এলেন, এঁদের মধ্যে একজন হলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ গৃহে নাট্যাভিনয়ের রেওয়াজ আগে থেকেই আছে, গণেন্দ্রনাথের পিতা গিরীন্দ্রনাথ 'বাবুবিলাস' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন।[৫]

যাই হোক, বড়র দলই অভিনয়ের আয়োজন করতে লাগলেন। দোতলার হল-ঘরে স্টেজ বাঁধা হল। পটুয়ারা সীন আঁকল। ভূমিকা বণ্টন হবার পর খুব ঘটা করে রিয়ার্সেল বসে গেল।

নবনাটকের প্রথম অভিনয় হল জোড়াসাঁকোর নাট্যশালায়—জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। অভিনয় দেখার জন্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

সেরা পটুয়ারা সীন্ এঁকেছিলেন, এবং রঙ্গমঞ্চটিও খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। "দৃশ্যগুলি বাস্তব করিতে যত দূর সম্ভব চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীন্‌খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকি পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর ও সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত।"[৬]—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বর্ণনা দিয়েছেন, এর দ্বারা আমরা তাঁদের উৎসাহের পরিচয় লাভ করি।

১৮৬৭ সালের ৫ জানুয়ারি (২২ পৌষ ১২৭৩) প্রথম অভিনয় হল এই নাট্যশালায়। অভিনয় উচ্চাঙ্গের হয়েছিল, ৯ জানুয়ারি তারিখের NATIONAL PAPER এই অভিনয় সম্বন্ধে লেখেন—

"**Jorasanko Theatre.** On Saturday night last we had the pleasure of witnessing the Jorasanko Theatre, established at the family house of Baboo Gonendra Nath Tagore, grandson of late Baboo Dwarka Nath Tagore. The subject of the performance was the celebrated *nobo natoek* .. the acting on the stage, which was pronounced by all present on the

occasion to be of the most superior order. To choose out one or two or more amateurs for especial commendation, would, we fear, be doing gross injustice to the rest, each acquitted himself so creditably. Beginning with the graceful bow of the *natee*, the representation of every succeeding character, elicited loud shouts of applause from all sides, and rendered the whole scene an object of peculiar amusement to the audience. The concert was excellent. It had no borrowed airs, and was quite in keeping with national taste."[৫]

এই অভিনয়ের আসরে নাট্যকার রামনারায়ণও উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় দেখে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন; অভিনয়ান্তে তিনি তাঁর নাটকের সমালোচকদের উদ্দেশে বলেন, 'যারা পলাট [plot] নাই, পলাট নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক।' এই বলে তিনি নাটকের সাফল্যে নাকি বিস্তর আস্ফালন করেছিলেন।

এই নাট্যাভিনয়ের সংবাদ পেয়ে ১৮৬৭ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখে দেবেন্দ্রনাথ পত্রযোগে উৎসাহ দেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর অনুমোদন জানান।[৬]

ন্যাশনাল পেপার যার উল্লেখ করে লিখেছেন, "Beginning with the graceful bow of the *natee*" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নাটকে সেই নটীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। কেবল অভিনয় নয়, তিনি গানও করেন। সংস্কৃতে রচিত একটি বসন্তবর্ণনার গান।

তাঁর সাজসজ্জা ও অভিনয় যে সুখকর হয়েছিল তার কথা উক্ত সংবাদপত্রের মন্তব্য থেকেই আমরা জানতে পারি।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে আমরা তাঁকে যে দুইটি বিভিন্ন চরিত্রে পাই, এখানকার চরিত্রটি সে দুটি থেকেও ভিন্ন। অভিনয়কলায় পারদর্শিতা না থাকলে এই ভাবে নানাবিধ চরিত্র-অভিনয় করা সম্ভব নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই পারদর্শিতার অধিকারী ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উক্ত চরিত্রাভিনয় সম্বন্ধে একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করা যায়। এই ঘটনার দ্বারা বোঝা যাবে যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নটী-বেশে মেক-আপও

কতটা নিপুণ হয়েছিল। ঘটনাটি এই— নটীর ভূমিকা অভিনয় ছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কনসার্টের হার্মোনিয়াম বাজিয়েছিলেন। সেদিনের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি সীটন কার্ (Seton Car)। কনসার্ট শোনার জন্যে, এবং কনসার্টে কি কি বাজনা বাজানো হচ্ছে দেখার জন্যে তিনি কনসার্টের ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরে ঢুকেই তিনি, 'Beg your pardon—Zenana, Zenana' বলে অপ্রতিভ হয়ে বেরিয়ে যান। পরে তাঁকে অবশ্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ওখানে জেনানা কেউ ছিলেন না, যাঁকে দেখে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসেন, তিনি নটী-সাজে সজ্জিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।[৪]

অবনীন্দ্রনাথের জন্ম তখনও হয় নি। কিন্তু তিনি তাঁর 'ঘরোয়া'য় এই অভিনয়ের কথা বলেছেন, "দাদামহাশয় [গিরীন্দ্রনাথ] করেছিলেন 'নববাবুবিলাস', তাঁর ছেলে করলেন 'নবনাটক'। এই দোতলার হলে থিয়েটার হয়। স্টেজ-কপিখানা যে কোথায় আছে জানিনে, তার মধ্যে কে কী পার্ট নিয়েছিলেন সব লেখা ছিল। তবু যতটা মনে পড়ে বলছি— নট সেজেছিলেন ছোটোপিসেমশায়—নীলকমল মুখোপাধ্যায়। নটী জ্যোতিকাকামশায়।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুদর্শন পুরুষ ছিলেন, এই জন্যে তাঁকে দেখে সহসা ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। রসরাজ অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেয়ে বছর-চারেকের ছোট। অমৃতলাল যখন হিন্দুস্কুলে পড়েন তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সেটা ১৮৬৫ সাল। এক-একদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গাড়ি আসতে দেরি হলে গাড়ির অপেক্ষায় তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে থাকতেন তখন অমৃতলাল তাঁর গাড়িতে বসে এক দৃষ্টে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে থাকতেন, ঐ সৌন্দর্য দেখে তাঁর মনে হত যে idea of Greek beautyর যে impression তখন তাঁর মনে ছিল তিনি নাকি তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন। পরে অমৃতলাল তাঁর কৈশোরের এই মনোভাবটির কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অনেকবার বলেছেন।[৫]

অমৃতলাল যে সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হন তার বছর-দুই পরেই এই নটীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই

জন্যে সীটন কার্ সাহেবের ভ্রম হওয়াটা সম্ভবত অসংগত হয় নি।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, ১৮৮২ সালে, বিদ্বজ্জন সমাগমে রবীন্দ্রনাথের 'কালমৃগয়া' নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকায় অভিনয় করেন—এ কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি নাট্যাভিনয়ে যা-যা প্রয়োজন তার সবগুলির মধ্যেই আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে পাই। নাট্যশালা-স্থাপনে তিনি আছেন, নাটকের চরিত্রাভিনয়ে তিনি আছেন, দৃশ্যসজ্জা-ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগ আছে; এমনকি কনসার্ট বাজানোতেও তিনি আছেন।

'নবনাটক' উপলক্ষ্যে তাঁদের যে কনসার্ট বাজে, তাতে এই যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়— হার্মোনিয়ম, বেহালা, পিকলো, ক্ল্যারিয়োনেট, বড় বাস্ বেহালা, করতাল, ঢোল, তবলা, মন্দিরা।—এই যন্ত্রাবলী দেখার জন্যেই সীটন কার্ সাহেবের কৌতূহল জেগেছিল।

হার্মোনিয়ম তখন এদেশে প্রায় নূতন। তখন সেতারের খুব চলন। ব্রাহ্মসমাজের জন্যে টেবিল-হার্মোনিয়াম এসেছিল। বাংলা গানের সঙ্গে হর্মোনিয়ম বাজানো ব্রাহ্মসমাজেই প্রথম আরম্ভ হয়। প্রথমে সমাজে গানের সঙ্গে হার্মোনিয়ম বাজাতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁরা যখন ছেড়ে দিলেন, তখন তা বাজানোর ভার পড়ল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর। সেই থেকেই বিষ্ণু চক্রবর্তীর গানের সঙ্গে এই যন্ত্রটি বাজাতে আরম্ভ করেন তিনি। পূর্বে বিষ্ণু চক্রবর্তীর গানের সঙ্গে বাজত সারেঙ্গ।

হার্মোনিয়মে এই ভাবে হাত পাকিয়ে তিনি তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় কনসার্টে ঐ যন্ত্রটির ভার গ্রহণ করেন।

ঘোষণা অনুযায়ী 'নবনাটক' রচনার জন্য রামনারায়ণ পুরস্কার লাভ করেন। নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই— ১৮৬৬ সালের ৬ মে তারিখে— টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারিচাঁদ মিত্রের সভাপতিত্বে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এক প্রকাশ্য সভায় রামনারায়ণকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

অন্য যে দুইটি নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তার মধ্যের একটি বিষয়ের উপর লিখিত 'হিন্দুমহিলা নাটক' পাওয়া যায়, নাটক-রচয়িতা বিপিনমোহন সেনগুপ্তকে ১৮৬৮ সালে পুরস্কারও দেওয়া হয়। কিন্তু

জোড়াসাঁকো-নাট্যশালায় উক্ত নাটক আর অভিনীত হয় নি। নাটকটির 'বিজ্ঞাপনে' উল্লিখিত আছে যে, ১৮৬৭ সনেই জোড়াসাঁকো 'নাট্যশালা-সমাজ বিগত-জীবন' হয়।

জোড়াসাঁকো-নাট্যশালার জীবন সমাপ্ত হল বটে, কিন্তু এর কাহিনী শেষ হল না— নাট্যশালার ইতিহাসে এটি স্থানলাভ করল।

জানুয়ারি মাসে (১৮৬৭) তাঁদের নাট্যশালায় নবনাটক অভিনীত হল। দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রশংসা তাঁরা লাভ করলেন, সংবাদপত্রে তাঁদের প্রচেষ্টার সুখ্যাতি প্রকাশিত হল। বড়দের কাছ থেকে উৎসাহ পেলেন, এমনকি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও এ ব্যাপারে শুভেচ্ছা জানালেন। সত্যেন্দ্রনাথ কয়েক মাসের ছুটিতে এসেছিলেন (২৮ অক্টোবর থেকে ৭ এপ্রিল ১৮৬৭)। এপ্রিল মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেজদাদার সঙ্গে গেলেন বোম্বাইতে— এসব বৃত্তান্ত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এখানে প্রয়োজন-বোধে পুনরায় উল্লিখিত হল।

বোম্বাইতে গিয়ে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন বিভিন্ন বিদ্যা-অনুশীলনে, কিন্তু তাঁদের প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালাটির কথা তাঁর মনে পড়ে; বোম্বাই যাওয়ার কয়েক মাস পরেই (১৪ জুলাই) এই প্রসঙ্গে তিনি গুণেন্দ্রনাথের চিঠির উত্তরে তাঁকে যে চিঠি লেখেন তার থেকে জোড়াসাঁকো-নাট্যশালার উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানা যায়। সামান্য একটি উপলক্ষ্য থেকে যে বৃহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি হতে পারে, একটি সামান্য ক্ষুদ্র বীজ থেকে যে বিশাল মহীরুহের উৎপত্তি ঘটে, তার প্রমাণ এই নাট্যশালা। তাঁদের সেই ডিটিং ক্লাবের মত নগণ্য একটি সংঘ থেকে এই নাট্যশালার সৃষ্টি। সেই নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে সে সময়ে নিশ্চয়ই যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে কোনো দাবি উঠেছিল, তিনি নিজেকে সম্ভবত অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলে দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত পত্রপাঠে আমরা জানতে পারি যদুনাথের দাবি ন্যায্য নয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনসায়াহ্নে তাঁদের কমিটি অব ফাইভের সভ্যদের মধ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি সারদাপ্রসাদের নামের পরিবর্তে অন্যতম ভগিনীপতি যদুনাথের নাম করেছেন, যদুনাথ নাটকে অভিনয় অবশ্য করেছিলেন — চিত্ততোষের ভূমিকায়। কিন্তু তাঁর উক্ত চিঠি থেকে এ বিষয়ে এবং

নাট্যশালার উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশদভাবে জানা যায়। পত্রটি উদ্ধারযোগ্য বিবেচনায় এখানে তার পূর্ণাংশ লিপিবদ্ধ হল, আঠারো বৎসর বয়সের বালকের লেখা চিঠি—

14th July [1867].
Ahmedabad

My dear Goonoodada,

It is but a few days ago that I received a letter from yourself and one from Jadoo [Nath Mookerji] and I have already replied to them. You can't expect any letters to reach you, at least in less than 10 days. The origin of the Jorasanko Theatre is now hidden in the deep folds of rusty antiquity ! ! It is well that some worthy historian should bring it out into light, and expel that gloom which still hangs about it. Who knew at that time—in those jolly days of our Eating Club, that acorn would grow into an oak ?—that small beginnings would give birth to mighty things ?—that smoke would blaze into a tremendous conflagaration ? Who, I say, then looked into the seeds of time or would peep into the womb of futurity ? who knew in fact that a mouse would give birth to a mountain ? Had all this been known to us, we certainly would have taken good care to note down every particular of its birth, would have marked, with a vigilant eye, every symptom which it presented in its embryo state. If we but carry ourselves a couple of years back, we would perhaps find ourselves seated in the snug little room of old, where we passed the brightest moments of our existance, which was the usual haunt of a few merry souls, which used to be convulsed with roars of laughter, and with the loud chorus of a dozen voices. Where we used to enjoy the delicious songs of *Bama*, and pleasant buffooneries of Jadoo, where about all "hot hot" কচুরি's and ছোকার used to be heaped up in pyramids ; and it was there in the self-same place that this

Jorasanko Theatre got its being!!! Now let me leave aside all metaphors and rather be homely. It was *Gopal Ooriah's Jatra* that suggested us the idea of projecting a theatre. It was Gangooly [Saradaprasad], you and I that proposed it ; and I don't think that Jadoo can claim the credit of being one of its projectors. I do think that he had no hand in the matter.

Yours affly
J. N. Tagore

পত্রটি ঈষৎ দীর্ঘ, কিন্তু পত্রটি একটি দলিল। নাট্যশালাটি গঠিত হওয়ার মাত্র দুই বছরের মধ্যেই এর উৎপত্তির ইতিবৃত্ত নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। এই পত্রটি না থাকলে, এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে হয়তো সম্পূর্ণ ঘটনাটাই অন্ধকারাবৃত হয়ে যেত। দুই বছরের মধ্যেই worthy historian -এর কথা উঠেছিল যিনি এর প্রতিষ্ঠার মূল এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম সন্ধান করবেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তেমন ঐতিহাসিকের প্রয়োজন হল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই, নিজের অজানিতেই, এই দলিলটি রেখে গিয়েছেন।

১ দ্র° Asiatic Journal, August 1826.
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)'

২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঘরোয়া'

৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)'

৪ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'

৫ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস'—"মেজকাকা [গিরীন্দ্রনাথ] বাবুবিলাস নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, একবার তার অভিনয় হয়েছিল⋯অভিনয় কি রকম ওতরাল বিশেষ কিছু বলতে পারি না। আমরা তো আর সে মজলিসে আসন পাই নি। উঁকিঝুঁকি দিয়ে যা-কিছু দেখা।"

৬ দেবেন্দ্রনাথের পত্র—

নাটোর
কালীগ্রাম, ৪ঠা মাঘ ১৭৮৮
[১৬ জানুয়ারি ১৮৬৭]

প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ,

তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, সমবেত বাদ্য দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে, কবিত্বরসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ

আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্বে আমার সহৃদয় মধ্যম ভায়ার [গিরীন্দ্রনাথ : 'বাবুবিলাস' নাটক রচনা করেন] উপর ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়। সদ্ভাবের সহিত এ আমোদকে রক্ষা করিলে আমাদের দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতি— শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ

—দ্র° রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্র-মানস-গঠনে

এই অধ্যায় লিখতে বসে প্রথমেই মনে পড়ছে দুটি ছত্র—

O Caledonia—stern and wild—
Meet nurse for a poetic child.

শিশুকে উপযুক্তভাবে লালন করার জন্যে, এবং তাকে পালন করার জন্যে, চাই যোগ্য ধাত্রী। স্নেহ ও মমতা দিয়ে শিশুকে পুষ্ট করে তোলাই তার কর্ম, এবং তার ধর্মও। ধর্ম ও কর্মের সমবায়ে কর্তব্য যদি সুচারুরূপে পালিত হয় তাহলে শিশুর জীবন সার্থক।

ঠিক এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের জীবন সার্থক করে তুলেছেন যিনি, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের এ একটা অন্যতম মহৎ কার্য। তাঁর নতুনদাদার কাছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অপরাহ্নেও এজন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন; মধ্যজীবনে তো জানিয়েছিলেনই। আমরাও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রতিভাকে চিনতে পারাও কম প্রতিভা নয়। জহর যে চিনতে পারে তার নামই জহুরি। চেনার ভুলে অনেক সময় অমূল্য রত্নও লোষ্ট্রবৎ অনাদরে নিক্ষিপ্ত হয়ে হারিয়ে গিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত হয়তো বিরল নয়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিভাদীপ্ত চোখ বালক-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রতিভার জ্যোতি দেখতে পেয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আমরা ঠাকুরবাড়ির সেকালীন প্রথার বিষয়ে একটু উল্লেখ করতে পারি। একালে ছোটরা গৃহের গুরুজনদের কাছে অতি সহজেই যেতে পারে, তাঁদের পাশে বসে সপ্রতিভভাবে কথা বলতে পারে; পিতা মাতা খুড়া দাদা— সকলের কাছেই তাদের স্বচ্ছন্দ গতি, তাতে নিয়মের বা শিষ্টাচারের কোনো ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু, যে সময়ের কথা আমরা বলছি, সে সময়ে ঠাকুরপরিবারের রীতি ছিল ভিন্ন। বড়দের ও ছোটদের মাঝখানে বৃহৎ একটি কঠিন প্রাচীর তোলা ছিল। বড়দের সঙ্গে ছোটদের মেশার রীতি ছিল না;

বড়দের সঙ্গে সোজাসুজিভাবে কথা বলাও বোধ করি অসৌজন্য বলে বিবেচিত হত। বড়রা সব সময় বড় হয়ে থাকতেন, এত বড়— যে, ছোটরা তাঁদের নাগাল পেত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে এই ব্যবস্থাটির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, যাঁরা তাঁদের চেয়ে বড় ছিলেন তাঁদের গতিবিধি বেশভূষা আচারবিচার আরাম-আমোদ আলাপ-আলোচনা সমস্তই তাঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে ছিল, যার আভাস পাওয়া যেত কিন্তু নাগাল পাওয়া যেত না।

ছোটরা থাকত পৃথক এক মহলে— অনেকটা বুঝি নির্বাসিত হয়েই— চাকরদের হেফাজতে। এই ভৃত্যরাজকতন্ত্রের সামান্য প্রজা রূপেই অন্যান্য বালকদের মত বালক-রবীন্দ্রনাথের জীবন কেটে চলেছে। এ-তন্ত্রের শিকল বড় কড়া, সে বেড়ি ভেঙে পূর্ণ স্বাধীনতালাভ করা যাবে এ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করাও তখন তাঁর পক্ষে বুঝি অসম্ভব ছিল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে হঠাৎ নূতন আলোর অভ্যুদয় ঘটল। এ জ্যোতি নিয়ে এলেন নূতনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। নূতন জীবনে তিনি অভিষিক্ত করে নিলেন রবীন্দ্রনাথকে। এ একটা শুভদিন। এই শুভদিনের সংকেত রবীন্দ্রনাথের জীবনে যদি না আসত তা হলে তাঁর জীবন অন্য কোনো খাতে গড়িয়ে গিয়ে কোনো মরুপথে হারিয়ে যেত কি না— সে গবেষণা অনাবশ্যক। আমরা কেবলমাত্র এই কথা বলতে পারি যে, আমরা রবীন্দ্রনাথের মত দীপ্ত প্রতিভার পূর্ণবিকাশ যে দেখতে পেয়েছি তার জন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অনেকখানি। তিনিই এই প্রতিভার দীপ্তিটি প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন, এবং তার বিকাশের জন্য সর্বপ্রথম তিনি তাঁর দাক্ষিণ্যের হাত প্রসারিত করেছিলেন।

আমরা বলেছি, প্রতিভাকে চিনতে পারাটাও মস্ত প্রতিভা। এ কথায় অন্য কথা মনে পড়ছে। সংক্ষেপে সে কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। এও সেই আমলেরই ঘটনা। মাইকেল মধুসূদন বিধর্মী, চালচলন ফিরিঙ্গির মত, মুখে ইংরেজি বুকনি, মদ্যে তাঁর লালসা— সব মিলিয়ে তিনি এমন, যাঁকে কখনোই সুনজরে দেখা চলে না; বিশেষত তাঁর পক্ষে যিনি সদাচারী নিষ্ঠাবান, সাজ-পোশাকে যাঁর আড়ম্বর নেই, বিশেষত সংস্কৃতই যাঁর পাণ্ডিত্যের বাহন সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পক্ষে তো কখনোই না। তার উপর, তেলছবি দেখতে

হলে যেমন তা একটু দূর থেকে দেখা দরকার, তা না হলে ব্রুশের আঁশের দাগ চোখে পড়ে ছবির ছবিত্ব ঝাপসা হয়ে যায়, প্রতিভাও তেমনি কাছে দাঁড়িয়ে বোঝা যায় না, একটু তফাতে সরে তা পরখ করতে হয়, নইলে প্রতিভাধরের আচরণে তার দীপ্তি আচ্ছন্ন দেখায়। এসব সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র অত নিবিড়-নিকটে থেকেও চিনতে পেরেছিলেন মধুসূদনকে, বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর প্রতিভা। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের এটা আর-এক দিক, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার এটা অন্য এক স্তর। একে বলা যায় ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বিতীয় প্রতিভা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আমরা এই দ্বিতীয় প্রতিভার লক্ষণ দেখতে পাই। এরই প্রভাবে তিনি আবিষ্কার করলেন রবীন্দ্রনাথকে। আবিষ্কারই একে বলা হয়তো ঠিক। কেননা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে তখন আরও ভাইবোন আছেন, আছেন শরৎকুমারী (১৮৫৪-১৯২০), আছেন স্বর্ণকুমারী (১৮৫৬ ?-১৯৩২), আছেন বর্ণকুমারী (১৮৫৮-১৯৪৮), আছেন সোমেন্দ্রনাথ (১৮৫৯-১৯২২)— এঁদের সকলকে, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দুই বছরের বড় ঐ সোমেন্দ্রনাথকেও, বাদ দিয়ে তিনি নির্বাচন করলেন রবীন্দ্রনাথকে। ছোটদের ও বড়দের মাঝখানের সেই কঠিন প্রাচীরটি ভেঙে দিয়ে তিনি তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোট এই ভ্রাতাটিকে টেনে নিয়ে নিজের দলের একজন করে নিলেন।

১৮৭৫ সাল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চৌদ্দ। এই কিশোর ভ্রাতার মধ্যে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন সেই প্রতিভার প্রথম আলো, যে-আলো উত্তরকালে চতুর্দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। "সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম।"[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই কথাতেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ তখন কতটা নিম্নশ্রেণীতে অবস্থিত ছিলেন, অবশ্য পারিবারিক শ্রেণীবিভাগ অনুসারে হঠাৎ এই প্রমোশন দেওয়ার কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুনদাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। এবং নতুনদাদার মনটিও ছিল উদার, তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া মাত্র তিনি সুযোগ গ্রহণ করলেন। এ-সুযোগ উভয় পক্ষের সুবিধার জন্যে গৃহীত হল অবশ্য, কিন্তু তারই ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনে পরমতম সুযোগ দেখা দিল— আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রসারের। মনের মধ্যে

যে-কথাগুলি পাকা প্রাচীরের বেড়া দিয়ে বাঁধা ছিল সেই প্রাচীরের একটি প্রান্ত যেন ভেঙে পড়ল, এবং সেখানে দেখা দিল একটি প্রশস্ত রাজপথ। বাহিরের সঙ্গে মিলন ঘটল ঐ পথের দ্বারা।

ঘটনাটি এখানে বিবৃত করা যেতে পারে।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, জমিদারি-পরিদর্শনের কাজ সেরে কটক থেকে ফিরে এসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সরোজিনী নাটক রচনা করেন। ১৮৭৫ সালের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সবে চৌদ্দ। রামসর্বস্ব পণ্ডিতের কাছে রবীন্দ্রনাথ তখন বাড়িতে সংস্কৃত পড়েন। সরোজিনী নাটক লেখা হয়েছে, তার ছাপার কাজ চলেছে। রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশায় ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার প্রুফ দেখছেন। খুব জোরে জোরে প্রুফ পড়ে চলেছেন রামসর্বস্ব। পাশের ঘর থেকে রবীন্দ্রনাথ ঐ পাঠ শুনতেন, এবং দু-এক জায়গায় কি করলে আরও ভালো হয় রামসর্বস্বকে উদ্দেশ করে সে-বিষয়ে দু-একটা মন্তব্য করতেন। তাঁর পরামর্শ গৃহীত হত কিনা সে-বিষয়ে তাঁর আগ্রহ হয়তো ছিল, কিন্তু তা প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু একদিন তা প্রকাশ হয়ে পড়ল, এবং সেইটিই তাঁর আত্মপ্রকাশ। নাটকে যেখানে রাজপুত্‌-মহিলাদের চিতাপ্রবেশের ঘটনা আছে, সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গদ্যে একটি বক্তৃতা ব্যবহার করেছিলেন। প্রুফ-সংশোধনের সময়ে ঐ জায়গাটা যখন পড়া হচ্ছে তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘর থেকে চৌকাঠ ডিঙিয়ে এই ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর অভিমত জানালেন, বললেন যে, এখানে গদ্য খাপ খাবে না, এখানে পদ্য দরকার। কিশোর-রবির এই পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারলেন না জ্যোতিরিন্দ্রনাথ; কিন্তু নূতন করে কথাগুলি পদ্যে ঢেলে নেবার সময় নেই— এই অজুহাত শুনে রবীন্দ্রনাথ গানটি রচনা করে দেবার ভার নিলেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে রচনা করে আনলেন সেই গান—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরান সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।..

অতি অল্প সময়ের মধ্যে চার স্তবকের দীর্ঘ গানটি পেয়ে চমৎকৃত হলেন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং যেন ডবল প্রমোশন দিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথকে। ব্যবধানের বেড়া ভেঙে পাশে বসার সুযোগই কেবল পেলেন না, পাশে বসে জ্যোতিরিন্দ্রের কর্মের সহচর হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ।

ঠাকুরপরিবারের জ্যোতিঃ-স্বরূপ ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁকে কেন্দ্র করেই এই পরিবারে নানাপ্রকারের কর্মপ্রচেষ্টা ও আন্দোলন। তাঁর প্রাণশক্তি অফুরন্ত ও উৎসাহ অপরিসীম। এই জ্যোতিষ্মান পুরুষটির জ্যোতিঃ সম্বন্ধে পরিবারের অন্যান্যেরাও সচেতন ও সশ্রদ্ধ ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্বাণ' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। এর আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তিনটি বই বেরিয়েছে— কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২), পুরুবিক্রম নাটক (১৮৭৪) ও সরোজিনী (১৮৭৫); এই তিনটিই নাটক। দীপনির্বাণ উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে রচয়িত্রীর নাম ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথের ধারণা হয় যে তাঁর নাট্যকার-ভ্রাতাটি এবার উপন্যাসও রচনা করতে আরম্ভ করেছেন। স্বর্ণকুমারী-তনয়া হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৬৬-১৯২৫) লিখেছেন, "মেজমামা পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশে এই বইখানি [দীপনির্বাণ] হাতে পাইয়া ভাবিলেন, নতুনমামার রচনা। তিনি লিখিলেন, 'জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে?' "[১]

যে জ্যোতি প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে না বলে অগ্রজরা বিশ্বাস করতেন, সেই জ্যোতি দীপনির্বাণের মধ্য দিয়ে তাঁর জ্যোতির পরিচয় দিলেন না, কেননা বস্তুতপক্ষে সেটি তাঁর রচনা নয়; পরিচয় দিলেন ব্যাপক ক্ষেত্রে। সে বিষয়ে আমরা পূর্বে জেনেছি।

এই জ্যোতিষ্মান পুরুষটির পূর্ণজ্যোতির ক্ষেত্রে এসে উপনীত হলেন রবীন্দ্রনাথ— ডবল প্রমোশন পেয়ে।

এর পর থেকে আমরা সর্বকাজে জ্যোতিরিন্দ্র-সহচর রূপে পাই তাঁর বারো বছরের ছোট ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথকে। এইখানেই রবীন্দ্রজীবনের উদ্বোধন, এবং এইখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের সাধনার ব্রতপালনের উদ্‌যাপন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নূতন ভূমিকা যেন গ্রহণ করলেন, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথের ফ্রেণ্ড ফিলজফার ও গাইড। আমরা ক্রমশ তার পরিচয় পাব।

ভারতী পত্রিকা প্রকাশের বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। এই দুই বন্ধুতে মিলেই

সাহিত্যচর্চা চলেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পূর্বের দু-জনের আসর এখন পরিণত হয়েছে তিনজনের বৈঠকে। এই বৈঠকেই অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ি থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করার প্রস্তাব করলেন। এবং প্রস্তাব করা মাত্র তা কাজে পরিণত করার ব্যবস্থা করলেন, এবং অচিরেই দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ভারতীর প্রথম সংখ্যা বের হল— শ্রাবণ ১২৮৪ (ইংরেজি ১৮৭৭)। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোলো। এই বালক-বয়সেও তিনি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলেন না, কিন্তু এই চক্রের বাহিরে ছিলেন পত্রিকাটির প্রধান উদ্যোক্তাটি— জ্যোতিরিন্দ্র। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল।"[৩]

কাগজের সমস্ত ভার নিজের স্কন্ধে নিয়ে তিনি যাঁর আত্মপ্রকাশের জন্যে দ্বার উদ্‌ঘাটন করলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহুবিধ বক্তব্য বিষয় প্রচার করেছেন এই ভারতীর পাতায়, কিন্তু আমরা এখানে সে-আলোচনা করছি নে। এই পত্রিকার কল্যাণে রবীন্দ্রনাথ কতটা আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করেছেন আমরা তারই একটু আভাস পাওয়ার চেষ্টা করছি।

রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধকাব্যের যে তীব্র সমালোচনা লেখেন সেটি পত্রস্থ হয় ভারতীতে (১২৮৪)। কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনের একটি রুষ্ট প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই রচনাটি। মনটি যখন কাঁচা, মন যখন স্বচ্ছন্দে বিচরণের জন্যে লালায়িত তখন গৃহে চলেছে নানা বিদ্যার আয়োজন। কিশোর মন এই আয়োজনকে পীড়ন বলেই গ্রহণ করেছে। চারুপাঠ বস্তুবিচার প্রাণিবৃত্তান্ত থেকে আরম্ভ করে মাইকেলের মেঘনাদবধকাব্য পড়তে হত সকাল ছটা থেকে সাড়ে নটা পর্যন্ত। "ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা মেঘনাদবধকাব্য জ্যামিতি গণিত ইতিহাস ভূগোল শিখিতে হইত।"[৪] তার পর স্কুলে যাওয়া, স্কুল থেকে ফিরেই ড্রয়িং ও জিমন্যাষ্টিকের মাস্টার মহাশয়ের কাছে বন্দী; ছাড়া পেতে রাত্রি নটা বেজে যেত।

এইসব ব্যাপারে মনের মধ্যে যে ক্ষোভ জেগেছিল তার রুষ্ট বিস্ফোরণ রূপে প্রকাশিত হল মেঘনাদের ঐ সমালোচনা। চারুপাঠ বা জ্যামিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ঐ ভাবেই জানানো হয়তো যেত, কিন্তু কবিমন কাব্য নিয়েই আলোচনা করবে— বয়স তখন কাঁচা তাপটা তাই তেজি; তাঁরই কথায় বলি— "কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ।" রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এই দাম্ভিক সমালোচনা দিয়ে তিনি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করলেন।

লঘু হোক গুরু হোক, ভারী হোক হাল্কা হোক— যাবতীয় বক্তব্য প্রকাশ করার জন্যে নিজের হেফাজতে পত্রিকা থাকা চাই। তাহলে কলম চলতে শেখে ভালো। না হলে সম্পাদকের পছন্দ-অনুযায়ী রচনার জোগান দিতে গিয়ে কলম অনেক সময় থতমত খায়, বিশেষ করে নবীন লেখকদের পক্ষে এ কথা বেশি প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর প্রথম-জীবনেই তাঁর বক্তব্য অকপটে ব্যক্ত করার জন্যে একটি মুখপত্র পেয়েছিলেন— এজন্যে আমরা জ্যোতিরিন্দ্রের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর স্কন্ধেই তখন পত্রিকাটির সমস্ত ভার, তাঁরই উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে তাঁর মনের কথাগুলি জানাতে পেরেছেন। কলমের জড়তাও তাঁর দূর হয়েছে।

নূতনত্বের নিত্য প্রবর্তক এই নতুনদাদা। তিনি বঙ্গদেশের সাহিত্যগগনে একটি নূতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটানোর জন্যে প্রথমে নিজের জ্যোতি দিয়েই তাকে জ্যোতিষ্মান করার জন্যে সচেষ্ট হলেন।

রবীন্দ্রনাথের মানস-বিকাশের ঢালাও ব্যবস্থা হল এই ভারতীতে। নিত্য নূতন উদ্যমে ব্যস্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার বহুমুখীনতা দিয়ে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করে চলেছেন এই ভ্রাতাটিকে। চোখের সম্মুখে এই কর্মপ্রাণ মানুষটির বিবিধ কর্মের উদ্যোগ চলেছে, এ ক্ষেত্রে যাঁর মধ্যে কর্মের আকাঙ্ক্ষা লুপ্ত আছে তা জাগ্রত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। নতুনদাদার জীবনের বহুমুখীনতা রবীন্দ্রনাথের জীবনেও প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করল।

প্রথম বছরের ভারতীতেই রবীন্দ্রনাথের কবিকাহিনী কাব্যটি প্রকাশিত হল। এবং অবিলম্বে তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। এই কবিকাহিনী কাব্যই রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম গ্রন্থ (১৮৭৮)।

ভারতীতে প্রথম যে ছোটগল্প প্রকাশিত হয় সে রচনাও রবীন্দ্রনাথের, এবং রবীন্দ্রনাথেরও সেটি প্রথম ছোটগল্প।· ১২৮৪ (১৮৭৭) শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় এই গল্পটি মুদ্রিত হয়, নাম— ভিখারিণী।

ছোটগল্প, কাব্য, বা সমালোচনা— বিবিধ প্রকার রচনা প্রকাশের জন্যে এ যেন রবীন্দ্রনাথের জন্যে ঢালাও ব্যবস্থা। যিনি সম্পাদক তিনি তো স্বীকারই করেছেন যে, নামটি দিয়েই তিনি খালাস। কিন্তু যাঁর উপর পত্রিকাটির ভার ন্যস্ত তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছাড়া এ-কাজ সম্ভব নয়। যাঁকে একদিন ডবল প্রমোশন দিয়ে সমশ্রেণীতে তুলে নিয়েছিলেন, তাঁকে সমশ্রেণীতেই বেঁধে না রেখে আরও অনেকগুলি ডবল প্রমোশন দিয়ে আরও অনেক উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করার জন্যে উৎসাহী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের এ একটি নূতন অভিযান। এবং, আমাদের বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের এই অভিযানটিই সবচেয়ে সফল ও সবচেয়ে সার্থক। কর্মপ্রাণ এই মানুষটির বিবিধ কর্মের আলোচনা হয়তো কিছু-কিছু হয়েছে ; কিন্তু তাঁর এই মহত্তম ও উদারতম এই অভিযানটির কথা তেমন ভাবে আলোচিত হয় নি।

তেমনভাবে আলোচিত হয়নি বটে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই অভিযানটি যাঁকে কেন্দ্র ক'রে তিনি তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে স্মরণ করেছেন তাঁর নতুন-দাদাকে। 'জীবনস্মৃতি' 'ছেলেবেলা' ও 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন পাতা তিনি আবৃত করেছেন জ্যোতিদাদার নামাবলীতে।

বস্তুত, ভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল যেন কেবল রবীন্দ্রপ্রতিভার মুখপত্র রূপে। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশের জন্য এর প্রতিটি পাতাই যেন অবারিত রাখা হয়েছিল। গদ্য পদ্য সমালোচনা ছাড়াও, এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যেমন কৃত্রিম ব্রজবুলিতে রচনা করলেন ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, আবার শেক্‌সপীয়র থেকে অনুবাদও আরম্ভ করলেন এই পত্রিকায়।

প্রকাশ্য আলোকে আমরা পাই রবীন্দ্রনাথকে, সেই আলোর অন্তরালে যে হাতের কারসাজিটি ছিল, অর্থাৎ— রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোটা, সেটি কার হাত তা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। সে হাত ভারতী-সম্পাদকের নয়, সে হাত ভারতী-কর্ণধারের। যদিও বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা পেয়েছেন অন্যভাবে,

কিন্তু এখানে আমরা দ্বিজেন্দ্র-প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই নে। তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা হলে, সে-আলোচনা হবে পৃথকভাবে, সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে।

নিয়ত সঙ্গেসঙ্গে রেখে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা স্ফুরণের সহায়তা করে, নিজের জীবনের কর্মপ্রেরণার উদাহরণ সর্বদা সম্মুখে রেখে রবীন্দ্রনাথকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবার জন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আশ্বাস ও সাহস জুগিয়ে চলেছেন। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ গেলেন সেজদাদার কাছে বিলেতে, সেখানে কিছুকাল (১৮৭৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৮০ ফেব্রুয়ারি) কাটিয়ে দেশে ফিরে এলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন বিলেতে সেই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতী নাটক প্রকাশিত হয় (১৮৭৯)। বিলেতে থাকার সময়েই নতুনদাদার এই নতুন নাটক রচনার খবর তিনি পেঁৗছিলেন অবশ্যই, কেননা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বইটি তাঁর ভ্রাতাকে উৎসর্গ করে লেখেন—

> তুমি অশ্রুমতীকে দ্যাখ্‌বার জন্য উৎসুক হয়ে আছ। এই লও, আমার অশ্রুমতীকে তোমার কাছে পাঠাই। ইংলণ্ড-প্রবাসে, তাকে দেখে, তোমার প্রবাস-দুঃখ যদি ক্ষণকালের জন্যেও ঘোচে তা হ'লে আমি সুখী হব।
>
> ৯ই শ্রাবণ — তোমার
> ১৮০১ শক — দাদা

দুই জনে যে নিবিড় ভাবে দুই জনের প্রতি আকৃষ্ট, উভয়ে উভয়ের সাহিত্যিক কর্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে যে সমভাবে সমুৎসুক, উৎসর্গপত্রের এই ভাষা থেকে তা সম্যক ভাবে বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ দেশ ছেড়ে বিদেশে আছেন, কিন্তু মনটি তাঁর বিদেশে নয়— সেটি গৃহবাসী, সে মন যেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সান্নিধ্য দ্বারা পরিপূর্ণ। এই জন্যেই 'অশ্রুমতীকে দ্যাখ্‌বার জন্য উৎসুক' হয়ে আছে এই মনটি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের সহযোগী যেন রবীন্দ্রনাথ। কেননা এই অশ্রুমতী'তে রবীন্দ্রনাথের রচিত এই গানটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—

> গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
> বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজনি, আও, আও লো।

এ রচনা ভানুসিংহ নামে রচনার অন্তর্গত। ভানুসিংহ ঠাকুরের যে কবিতাটি প্রথম ভারতী'তে প্রকাশিত হয় তার নাম অভিসার! কিন্তু ভানুসিংহের লেখা প্রথম কবিতা হচ্ছে ঐটি, অশ্রুমতীতে যেটি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই রচনার উৎপত্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম— গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে।"

এ ঘটনা ১৮৭৭ সালের। এর বছর-দুই পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন তাঁর এই অশ্রুমতী নাটকটি রচনা করলেন তখন তাঁর ভ্রাতার এই পরীক্ষামূলক ভাবে ব্রজবুলিতে রচিত গানটি অন্তর্ভুক্ত ক'রে বুঝি তাঁকে উৎসাহ দিলেন, এবং একে স্বীকৃতি দিলেন। অবশ্য ভানুসিংহ কে, তা জানার আগে এ-রচনাকে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের রচনার থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছিল। জীবনস্মৃতিকে রবীন্দ্রনাথ তার সকৌতুক বিবরণ দিয়েছেন।

এই নাটক প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতী নাটকের বিষয় হচ্ছে হিন্দুমুসলমান প্রণয়। সম্রাট আকবরের সেনাধ্যক্ষ মানসিংহ তাঁর ভগ্নীকে মোগলের হাতে অর্পণ করেছিলেন, এইজন্য মানসিংহ যখন চিতোর-রানা প্রতাপসিংহের আতিথ্য গ্রহণ করেন তখন প্রতাপসিংহ তাঁর সঙ্গে ভোজনে সম্মত হন না। এতে মানসিংহ অপমান বোধ করেন, এবং প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার জন্যে আকবরকে উত্তেজিত করেন, এবং যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেন। প্রতাপসিংহ তখন পর্বতকন্দরে আশ্রয় নেন। একদা প্রতাপের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মানসিংহ প্রতাপ-তনয়া অশ্রুমতীকে এক মুসলমান দ্বারা অপহরণ করান এবং প্রতাপের গর্ব খর্ব করার জন্যে সেই মুসলমানের সঙ্গে অশ্রুমতীর বিবাহ দিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু যুবরাজ সেলিমের জন্যে মানসিংহের সে চেষ্টা বিফল হয়। অশ্রুমতী এ জন্যে সেলিমের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, সে কৃতজ্ঞতা ক্রমশ পরিণত হয় প্রণয়ে। কিন্তু প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ এই প্রেম যাতে পরিণয়ে পরিণত না হয়, তজ্জন্য অশ্রুমতীকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসেন।

হিন্দু কন্যার সহিত মুসলমান যুবকের প্রণয় নিয়ে এই নাটক— এ জন্যে

পরবর্তী কালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অনেক বিড়ম্বিত হতে হয়েছে— সে কথা এই নাটকটি প্রসঙ্গে আলোচনা কালে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। এই প্লটটিই দুঃসাহসিক, যদিও অশ্রুমতী নামে প্রতাপের কোনো মেয়ে ছিল না, এ একটি কাল্পনিক চরিত্র, তবুও এর জন্যে অনেক জবাবদিহি করতে হয়েছিল নাট্যকারকে, নাটকটি প্রকাশের বাইশ-তেইশ বছর পরেও— ১৯০১ সালে।

যাই হোক, ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ২০ কার্তিক (১৮৯৭) রবীন্দ্রনাথ 'সতী' নামে যে নাট্যকাব্য রচনা করেন তার বিষয়ও এই। বিনায়ক রাওএর কন্যা অমাবাঈ এই নাট্যের নায়িকা। অমাবাঈ এক মুসলমানকে ভালোবেসে বিবাহ করে। ম্লেচ্ছের সঙ্গে কন্যার এই প্রণয় ও পরিণয় অস্বীকার করা হয়। ফলে অমাবাঈএর ম্লেচ্ছ স্বামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করা হয়। সে নিহত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু নিয়েছিলেন টডের রাজস্থান থেকে, আর রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন 'মারাঠি গাথা সম্বন্ধে আকওয়ার্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধবিশেষ হইতে'। হিন্দু নারী ও মুসলমান যুবকের প্রণয় নিয়ে লেখার অনুপ্রেরণা ও সাহস রবীন্দ্রনাথ আহরণ করেছিলেন এই অশ্রুমতী নাটক থেকেই, বিলাতপ্রবাসী ভ্রাতার হাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটি উপহার দেন ; সেই প্রবাসে 'যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত' এ তাঁরই রচিত গ্রন্থ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মনে জ্যোতিদাদার নাটকটির গভীর দাগ অঙ্কিত করা স্বাভাবিক। যাঁকে সবচেয়ে ভালো লাগে, যাঁর কথা সকলের চেয়ে বেশি মনে পড়ে, তাঁর কাছ থেকে পাওয়া স্নেহ-উপহারটি সামান্য হলেও তার মূল্য যে অসামান্য। কিন্তু এক্ষেত্রে উপহারটি সামান্য নয়— একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক।

দাগ যে অঙ্কিত করেছিল তার সাক্ষাৎস্বরূপ উপস্থিত করা যায় এই 'সতী' কাব্যনাট্যটি।

অশ্রুমতী নাটকের পিতা মাতা ও পুত্রীর কথোপকথনের অনেকটা প্রতিধ্বনির মতই যেন 'সতী' কাব্যনাট্যের পিতা মাতা ও পুত্রীর কথোপকথন।

অশ্রুমতী'তে আছে—

অশ্রু॥ মা, তুমিও আমাকে ঘৃণা কল্লে—তোমার কোলেও আশ্রয় পেলাম না? হা! মা ভগবতি ভবানি! তুমিও আমাকে পরিত্যাগ

করবে? মা, শুনেছি তুমি অগতির গতি—তুমিও কি আমাকে নেবেনা? —পঞ্চমাঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক

'সতী'তে আছে—

রমাবাঈ ॥ পতি! ম্লেচ্ছ, পতি সে তোমার!
জানিস কাহারে বলে পতি? নষ্টমতি,
ভ্রষ্টাচার! রমণীর সে যে এক গতি,
একমাত্র ইষ্টদেব। ম্লেচ্ছ মুসলমান
ব্রাহ্মণকন্যার পতি! দেবতা সমান!

অমাবাই ॥ উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তবুও যবনে
ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যে মনে
পূজিয়াছি পতি বলে; মোরে করে ঘৃণা
এমন সতী কে আছে? নহি আমি হীনা
জননী তোমার চেয়ে— হবে মোর গতি
সতীস্বর্গলোকে।

এ উক্তি দুঃসাহসী উক্তি। নায়িকার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এমন কথা বলাতে পেরেছেন। অবিকল এই ধরণের কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথও বলিয়েছেন—

অশ্রুমতী ॥ হা! আমার কি হবে? আমি রাজপুতও জানিনে, মুসলমানও জানিনে—আমার হৃদয় যাকে চায়, আমি তাকেই জানি।

—চতুর্থ অঙ্ক, অষ্টম গর্ভাঙ্ক

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যোতিদাদার প্রদর্শিত পথে দৃঢ় পদক্ষেপে যে অগ্রসর হয়েছিলেন, এ'কে তার একটি উদাহরণ বলা যেতে পারে।

কাব্যনাট্যরচনায় 'সতী' রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি! পরবর্তীকালে তিনি তাঁর এই রচনাটিকে তাঁর সঞ্চয়িতায় স্থান দেন নি বটে, কিন্তু এর দ্বারাই রবীন্দ্রপ্রতিভার এই একটি দিকের দ্বারোদ্‌ঘাটন ঘটেছে বলে আমরা এ'কে স্মরণ করতে পারি। আমরা বলেছি, এই নাট্যটি তিনি রচনা করেন ২০ কার্তিক ১৩০৪ বঙ্গাব্দে। তার পরে রচিত হয় 'নরকবাস' (৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৪) এবং 'গান্ধারীর আবেদন', শেষোক্তটির রচনাকাল জানা যায় না,

কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন ১৩০৪ অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্‌টিটিউটে এই কাব্যনাট্যটি রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন, অতএব এটি ঐ সময়ের রচনা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে; অতঃপর লেখেন 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' (২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৪) এবং এর কিয়ৎকাল পরে 'কর্ণ-কুন্তীসংবাদ' (১৫ ফাল্গুন ১৩০৬)। ২৬ ফাল্গুন ১৩০৬ তারিখে প্রথম প্রকাশিত 'কাহিনী' গ্রন্থে এগুলি একত্র সমাহৃত হয়।

এবার আগের কথায় ফিরে আসি। বিলাতের প্রবাসজীবন সমাপ্ত করে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন ১৮৮০ সালে। ফিরে অসার পর, ১৮৮১ সালে, রবীন্দ্রনাথের চারিটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়— বাল্মীকিপ্রতিভা, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড ও য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র।

রবীন্দ্রনাথের মন তখন জ্যোতির্ময়। তিনি তাঁর জ্যোতিদাদার কাছে কৃতজ্ঞ। তারই স্মারক স্বরূপ এর দুইটি বইই তিনি উৎসর্গ করেন জোতিরিন্দ্রনাথকে।

একটি হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক, রুদ্রচণ্ড। উৎসর্গপত্রে আছে—

ভাই জ্যোতিদাদাকে

অপরটি হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য গ্রন্থ, য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র। উৎসর্গপত্রে আছে—

ভাই জোতিদাদা, ইংলণ্ডে যাঁহাকে
সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত তাঁহারই
হস্তে এই পুস্তক সমর্পণ করিলাম।

যিনি তাঁর জীবনে প্রথম আলোক এনে দিয়েছেন, তাঁর হাতেই কৃতজ্ঞতা ভরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের দুটি প্রথম সৃষ্টি সমর্পণ করলেন।— প্রথম নাটক, প্রথম গদ্যগ্রন্থ।

কেবল পুস্তকই তাঁর হস্তে সমর্পণ করলেন না, বিদেশ-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথ নিজেকেও নূতন ভাবে সমর্পণ করলেন ভাই জ্যোতিদাদার হাতে।

বাড়িতে তখন গান নিয়ে নানারূপ পরীক্ষা চলেছে। দেশী ও বিলাতী সুর মিশিয়ে বাংলা গানে নূতন সুর আরোপ করার সাধনা করে চলেছেন নতুন

দাদা। সঙ্গে আছেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। এই দুই জনেই মাতিয়ে রেখেছেন আসর।

বিলাত-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে জোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকেও সঙ্গে নিলেন এই কাজে। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "সংগীত ও সাহিত্য চর্চাতে আমরা হইলাম তিনজন— অক্ষয় রবি ও আমি।"[১]

এ একটা স্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এ এক নূতন দীক্ষা। যথাসময়ে এই দীক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন, এইজন্যে উত্তরজীবনে তিনি সংগীতের ত্রিবেণীসংগম রচনা করতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। ভাষা ভাব ও সুর— এই তিনের মিলন ঘটিয়ে তিনি সংগীতের নূতন তীর্থ রচনা করেছেন। কিন্তু এই তিনটি স্রোতের উৎসসন্ধান আমাদের করতে হবে।

সম্যক্ ভাবে যদি সন্ধান করা হয় সে উৎসের, তাহলে সেখানে সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে ত্রিধারার প্রতিনিধি রূপে নতুনদাদার— উৎসাহের প্রস্রবণ হয়ে তিনি সেখানে বিরাজিত।

যে-ভাষা রবীন্দ্রহৃদয়ে অব্যক্ত রূপে শুব্ধ হয়ে পড়ে ছিল, সে-ভাষাকে ভাষা বলা চলে না। শিশুর অনেক কথা তার মনের মধ্যে আকুলিবিকুলি করে, কিন্তু বুলি হয়ে সেই কথা ব্যক্ত হওয়ার পূর্বে তাকে প্রয়াস করতে হয়। কারও কাছ থেকে সেই বুলি বলার জন্যে প্রেরণা চাই। এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন আমরা তা আলোচনা করে এসেছি। আলোচনা করে এসেছি যে, তাঁর নাটকের জন্যে গান রচনা করে নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ—'জ্বল্ জ্বল্ চিতা'। তখন যদি সে অনুকূল বাতাস না পেত তা হলে দ্বিগুণ বিক্রমে জ্বলে উঠে ভারতীর পাতায় পাতায় স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি করতে পারতনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই গানটি তাঁর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে কেবল নিজেরই উদারতার পরিচয় দিলেন না, তিনি তাঁর কনিষ্ঠকে এক পরম প্রশ্রয় দিয়ে তার জড়তার বাঁধ ভেঙে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবাধে তাঁর বলার বিস্তর কথা অজস্র ভাষায় ব্যক্ত করার সাহস লাভ করলেন।

ভাবের দিক থেকেও কোনো অভাব ঘটেনি। উৎসাহে উদ্দীপনায় প্রাণ-প্রাচুর্যে রবীন্দ্রনাথের সামনে চলিষ্ণু দৃষ্টান্তের মত ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। নতুন-কিছু করতে হবে এ জিনিসটা সাহসই হোক, বা দুঃসাহসই হোক—



'সুখের স্মৃতি'
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত
রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি



'বিবি' : ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত

নাম এল যাঁর পক্ষেও ঐ একই কথা খাটে ; গোপালনায়কের বংশের একজন স্ত্রীলোকের কথা এল, যার জীবনী বিশ্বাস করাই কঠিন, যেহেতু বৈজু ও গোপালের সঙ্গীত-যুদ্ধ, গোপালের মৃত্যুদণ্ড বা দীপক গাইতে গাইতে নদীর জলে মৃত্যু এবং কন্যার পিতার অস্থি বুকে নিয়ে কাঁদা আর শেষ পর্যন্ত মুসলমানী হয়ে যাওয়া, এই গল্পের কোনো কিছুই আমরা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করবার কারণ খুঁজে পাই না। শুনলে অবাক হতে হয় যে, এই গল্পেরই অন্য একটি বিবরণে ঐ কন্যার নাম হয়েছে মীরা এবং মহম্মদ গৌস্‌কে সেই বংশের সন্তান বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যদিও এটি ঐতিহাসিক সত্য যে মহম্মদ গৌস্‌ ছিলেন খাঁটি মুসলমান। কোনো তথ্যানুসন্ধানী হয়তো মহম্মদ গৌসের দুখানি সঙ্গীতগ্রন্থের উল্লেখ করতে পারেন, এবং বলতে পারেন যে, যিনি 'গুলজার-এ-চমন' ও 'জবাহর-উল-খমসা' রচনা করেছেন তিনি তানসেনকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারবেন না কেন? উল্লেখটুকু মেনে নিয়েও আমরা বলতে পারি যে সুফীরা সাধারণ কাউকে গান শিখিয়েছেন এমন উদাহরণ আমরা পাই নি। তানসেন যে ধার্মিক ছিলেন এবং সুফীসন্তদের ভক্তি করতেন এবং গানে তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন এ কথা নিতান্ত সত্য এবং সেই জন্যই তাঁর গানে হিন্দু দেবদেবী, মুসলমান পীর-পয়গম্বরের অর্চনামূলক উক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। এই উক্তির মাঝে গৌস্‌ থাকলে সেই গৌস্‌কে কখনোই সঙ্গীতগুরু বোঝাবে না। তা ছাড়া, গৌস্‌ একজনই ছিলেন এ কথা কি নিঃসংশয়ে বলা যায়?

যাই হোক, রামচন্দ্র বাঘেলার দরবারেই তানসেনের প্রসিদ্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং অকবর বাদশা ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁকে নিজ দরবারে নিয়ে এলেন। আজ তানসেনের যে খ্যাতি সে খ্যাতি তিনি অকবরের সহায়তাতেই লাভ করেছিলেন। তানসেন দরবারের নবরত্নের একজন। নিত্য নূতন গান তিনি রচনা করছেন, পুরনো রাগের নূতন রূপ দিচ্ছেন, শাস্ত্রকে ভাঙছেন। 'তিত্ত' মত বলে মতের প্রতিষ্ঠা করছেন এবং 'অতাঈ' সংজ্ঞায় সম্মানিত হচ্ছেন। ঐ সময়ে অতাঈ শব্দের অর্থ ছিল 'সর্বোৎকৃষ্ট গায়ক'। কিতাব-ঈ-নওরস গ্রন্থে এই অর্থই আছে।

তানসেন রাজারামের রাজত্বে কটা আর গান লিখেছেন? তাঁর যে গান দিয়ে আমরা তাঁর গুণপণার বিচার করি, সে গান সবই অকবরের সভায় লেখা। আজ যে আলাপ, যে ধ্রুপদরীতি চলছে তার স্রষ্টাও তানসেন। তাঁর হাতেই আলাপে তুকের জন্ম হল; তাঁর প্রতিভাতেই ধ্রুপদ ধ্রুব ও ধ্রুবপদর সংযোগে নবীন রূপ নিল— ধাতু হল স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ; তাঁর প্রভাবেই রাগে

সাত স্বরের স্থলে আট, নয় স্বর ব্যবহৃত হতে থাকল, অথচ অমীর খুসরোর রীতিকে যতটা সম্ভব বর্জন করে চলার ব্যবস্থা হল; তাঁরই সৃজনীশক্তিতে কানড়া, মল্লার, সারং, কল্যাণ, টোড়ী নবীন রূপ গ্রহণ করে দরবারী বা মিয়াঁকী নাম ধারণ করল। এই সৃজনীশক্তির জন্য তিনি 'মীয়াঁ' উপাধি পেলেন। শাস্ত্র তিনি জানতেন, কিন্তু ব্যবহারিক সঙ্গীতকে তিনি শাস্ত্রের উপরে স্থান দিতেন; তাই তিনি নায়ক হন নি, হয়েছিলেন গুণী— যিনি গানে আনেন নূতনত্ব, চমৎকারিতা, আনেন নবীন অনুভূতি, অপূর্ব রস। শুধু গান নিয়ে তিনি থাকেন নি, রবাব যন্ত্রকে তিনি নবরূপ দিয়েছেন। আরবীয় যন্ত্রে ভারতের স্বরবৈচিত্র্য প্রয়োগ করে রবাবকে যন্ত্রশ্রেষ্ঠ করে তুলেছিলেন। আরো একটি কাজ তিনি করেছিলেন, সেটা হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর দীপক রাগকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নত করবার জন্য তার রূপের আমূল পরিবর্তন। বৈজু, গোপালেরও দীপকের গান আছে কিন্তু সে দীপকের রূপ বা প্রভাব সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, কিন্তু তানসেনের দীপক এমন একটি রূপ নিয়েছিল যা বোধ হয় সেনী ঘরানার নিজস্ব সম্পত্তি করে নেওয়া হয়েছিল, এবং দীপকের অন্য কোনো রূপের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, যদিও দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন প্রকৃতির দীপক হয়ত ছিল। উত্তর ভারতের এই দীপকের পরিবর্তনের জন্যই লোচন পণ্ডিতকে আক্ষেপ করে লিখতে হয়েছিল— সর্বৈর্মিলিত্বা দীপকোপি লেখ্যঃ।

তানসেন অকবরের সভায় থাকাকালীন অকবরের সম্পাদনায় 'রাগসাগর' নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না। তানসেন নিজেও 'রাগমালা' ও 'সঙ্গীতসার' নামে দুখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন।

এ সময়ে তানসেনের পুত্ররাও অকবরের দরবারে স্থান পেয়েছেন। এই পুত্রদের নাম পাই তানতরঙ্গ, সুরৎসেন ও বিলাস খাঁ বলে। জীবনীকাররা বলেন যে তানসেনের চার পুত্র ছিলেন— শরৎসেন, সুরৎসেন, তানতরঙ্গ ও বিলাস খাঁ। কেউ-বা তানতরঙ্গের পরিবর্তে তরঙ্গসেন বলতে চান; কিন্তু তরঙ্গসেন নাম যেন জোর করে আনা বলে মনে হয়, বিশেষত অবুল ফজল যখন তানতরঙ্গের নাম তানসেনের পুত্র বলেই করছেন।

বরঞ্চ শরৎসেনের নাম আমরা কোথাও পাই না, আর তরঙ্গসেনের গান শুধু তানতরঙ্গকে বংশ থেকে বাদ দেবার উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট বলে মনে হয়। এঁর একটিমাত্র গান আমরা পাই, অকবরের সভায় গাইবার জন্য যেন ফরমায়েশ দিয়ে তৈরি করা। লক্ষ করবার বিষয় হল, অকবরের সভায় তানতরঙ্গ ও বিলাস খাঁর নাম রয়েছে,

সুরৎসেনের নাম পরে যোগ হয়েছে পণ্ডিত হিসাবে, কিন্তু জহাঙ্গীরের সভায় এসে তানতরঙ্গ ও সুরৎসেন দুজনেই যেন কোথায় লুপ্ত হয়ে গেলেন। এই ব্যাপারটি নিয়ে পরে আবার আলোচনা করব। এখানে শুধু এইটুকু বলব যে তানসেনের গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে এই ধরণের পক্ষপাতিত্বের বোধ হয় যোগ আছে। শোনা যায় তানসেন প্রেমকুমারী নামক এক হুসেনী ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করেছিলেন এবং সেই জন্যই নাকি তাঁকে মুসলমান হতে হয়েছিল। আমরা যতদূর জানি, হুসেনী ব্রাহ্মণ বলতে সেই হিন্দুদের বোঝায় যাঁরা কোনো মুস্‌লীম সন্তের মন্ত্রশিষ্য হন। অতএব তাঁরা জাতিচ্যুত হন না, তবে না-হিন্দু না-মুসলমান অবস্থায় থাকেন। মনে হয়, তানসেনও সেই পর্যায়ের ছিলেন। কিন্তু তার পরেই গণ্ডগোল বাধছে; সুরৎসেন, শরৎসেনের নাম উল্লেখের শেষে হঠাৎ বিলাস খাঁ আসছে কেন? (যাঁরা তরঙ্গসেনকে স্বীকার করেন তাঁদের এই নামটির বেলাতেও কোনো অসুবিধা হয় না)। বিলাস খাঁকে বিলাসসেন করার চেষ্টা বৃথা, কারণ জীবনীতে, গানে সর্বত্রই ঐ বিলাস খাঁ। শুধু তাই নয়, সকলকে ডিঙিয়ে ঐ বিলাস খাঁ জহাঙ্গীরের সভায় প্রধান গায়ক হয়ে বসলেন। মনে হয় না কি যে মুসলমান ব'লেই এই সুযোগ তিনি পেলেন? অনুমান করা যায় না কি যে, যাঁর নাম তান-তরঙ্গের অনেক পরে এসেছিল তিনি মুস্‌লিম মাতার সন্তান ছিলেন বলেই হঠাৎ এমন ভাবে এগিয়ে যেতে পারলেন? বিলাস খাঁ যে মুস্‌লীম হন নি, তার প্রমাণ তাঁর পুত্র উদয়সেন, দয়ালসেনের নামে। আর-একটি কথা। তানসেনের কন্যার নাম সরস্বতী। তাঁর বিবাহ হল নবাৎ খাঁর সঙ্গে, কোনো হিন্দুর সঙ্গে নয়। ভাবলে মনে হয় না কী যে, এ ক্ষেত্রেও কোথায় কেম মুস্‌লীম ভাব একটু রয়েছে? অবশ্য সবই অনুমান; সেনী বংশও অন্যপ্রকার বলে থাকেন; তবু সন্দেহ জাগে যে, বোধ হয় তানসেনের একাধিক স্ত্রী ছিলেন। এইবার তানতরঙ্গের কথায় আসি। অবুল ফজল একেও তানতরঙ্গ খাঁ বলতে চেয়েছেন; কিন্তু আমরা কোথাও এঁকে খাঁ রূপে দেখি নি। গান লিখেছেন শুধু তানতরঙ্গ। বংশের পরিচয় দিয়েছেন 'সেন' ব'লে, এমন-কি যখন বিলাস খাঁর বংশের প্রত্যেকে খাঁ তখন এই শ' খানেক বছর আগেও রহিমসেন ও অমৃতসেন নাম চলেছে। অনেকে এঁকে শিষ্য বলে তানতরল নামে চালাতে চেয়েছেন কিন্তু নাম টেঁকে নি। সুতরাং তানতরঙ্গ ঐ হুসেনী রক্তেরই সন্তান বলে মনে হয়।

এই সন্তানের পিতা তানসেন ছিলেন সত্যিকারের একজন কবি। নিজ প্রতিষ্ঠা বাঁচাবার জন্য তদানীন্তন রাজকীয় নিয়মরক্ষার জন্য হয়ত তিনি অকবরের

অতিরিক্ত তোষামোদী করেছেন, কিন্তু সেইটুকুই তাঁর পরিচয় নয়। ধ্রুব প্রবন্ধে যত প্রকার ধাতুর ব্যবহার আছে, যে কটি অঙ্গ আছে, কোনো কিছুই বর্জন না করে একদিকে যেমন তানসেন প্রাচীন রীতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানবিক প্রেম ও মানসিক ভাবকে রসাত্মক ভাষায় প্রকাশ করে তেমনই তিনি কাব্যগীতির অপরূপত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মনে রাখতে হবে গানে সুর প্রধান, সুতরাং ভাষা সেখানে বাহনের কাজ করেছে। কিন্তু সেই বাধাকে অতিক্রম করে সে যে অনুপম রূপ প্রকট করেছে তা একজন উচ্চস্তরের কবির পক্ষেই কেবলমাত্র সম্ভব। তানসেনের গানের মধ্যে দেবতা ও সূফীসন্তদের বন্দনা আছে, রাজপ্রশংসা আছে, নাদের বিভিন্ন প্রকাশ সম্পর্কে মতামত আছে, রাগরাগিণী সম্বন্ধে আলোচনা আছে, নায়িকা-ভেদ সম্বন্ধে বিবেচনা ও নায়িকার বর্ণনা আছে, কৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গ আছে এবং মানবিক গুণাগুণ ও ঋতু ইত্যাদির বর্ণনা আছে। এইসব গানের পদ বহু প্রকার রাগেই তানসেন গেয়েছেন। শোনা যায়, অকবর বাদশা ভৈরব এবং কানড়া অন্য কোনো গুণীর মুখে শুনতেন না। ফলে ভৈরব মীয়াঁকা ভৈরব আর কানড়া দরবারী কানড়া নামে পরিচিত হয়ে পড়েছিল, যে জন্য ভাবভট্টকে পরবর্তীকালে লিখতে হয়েছিল— জো দরবারী সো শুদ্ধ কহাবে। তানসেনের নামে যে রাগগুলি চলে সেগুলি হল দরবারী কানড়া, দরবারী কল্যাণ, দরবারী আসাবরী, শহানা, মীয়াঁকী মল্লার, মীয়াঁকী সারং, মীয়াঁকী টোড়ী, মীয়াঁকী জয়জয়ন্তী। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তানসেন দেহত্যাগ করেন।

জহাঙ্গীর বাদশা তাঁর 'তুজুক-ই জহাঙ্গীরী'তে একজন তানসেন কলাবন্তের বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না, শুধু ইনি যে সাধুপ্রকৃতির ছিলেন এবং ভজন গান গাইতেন সে কথাটা জানা যায়। তানসেনের প্রায় সমসময়ে আর-একজন তানসেনের উপস্থিতি রহস্যময়।

তানসেনের বহু গানে অকবরের গুণপনার প্রশংসা আছে, যেমন— অরব খরব কর দিখায়ে, সুর মিলায়ে, কণ্ঠ মিলায়ে, অকবর পরখ পায়ে। এই প্রশংসা যে নিতান্ত অমূলক তা নয়। অকবর সঙ্গীতের চর্চা যে করতেন তার প্রমাণ আছে। তিনি যে সাঙ্গীতিক আলোচনায় যোগদান করতেন এবং নিজে নক্কাড়া বাজাতে পারতেন তাও জানা যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রতিও তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল, যেজন্য 'রাগসাগর' গ্রন্থ প্রণয়ন করবার পরও তিনি দক্ষিণী

পণ্ডিত পুণ্ডরিক বিঠ্‌ঠলকে নূতনভাবে শাস্ত্র উদ্ধার করতে বললেন। অমীর খুসরো -প্রবর্তিত ও সুলতান শর্কী -দ্বারা পরিমার্জিত খ্যাল তখন চলছে, যার প্রমাণ পাওয়া যাবে তুজুক-ই-জহাঙ্গিরীতে "নওরসী" গানগুলির সমালোচনা প্রসঙ্গে; অকবর নিজ দরবারে সেই গানকে কোনো কৌলীন্য দেন নি, ভারতীয় শুদ্ধ সঙ্গীত ধ্রুপদকে দিয়েছেন অকুণ্ঠ মর্যাদা। বস্তুত অকবরের মতো দু-একজন শাসকের জন্যেই হিন্দুসঙ্গীত বহুকাল পর্যন্ত সগৌরবে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত থাকতে পেরেছিল।

অল্লাউদ্দীন খল্‌জীর মতো আর দু-একজন শাসক এলে অকবর পর্যন্তও হিন্দুসঙ্গীত বেঁচে থাকত কিনা সন্দেহ। অবশ্য খল্‌জীর মতো অপকার না করলেও অকবর অন্যভাবে কিছু অপকার যে আমাদের করেন নি তা নয়। তিনি যেমন অতি সূক্ষ্মভাবে হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা প্রধান তাঁদের উচ্চপদ দিয়ে একটু একটু করে মুস্‌লীম ভাবাপন্ন করে আনছিলেন, যাতে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের বংশধররা শুধু উচ্চপদের লোভে মুসলমান হয়ে যান, তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও মুস্‌লীম ভাবাপন্ন তানসেন প্রভৃতিকে উচ্চ সম্মান ও অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন যে অবস্থায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী যাঁরা তাঁরা প্রত্যেকেই মুসলমান হয়ে যেতে প্রলুব্ধ, এমন-কি বাধ্য হন। এঁদের সন্তানেরা তো ঐ সুযোগ-সুবিধার জন্য লালায়িত থাকবেনই। তাই আমরা দেখি, সম্রাট অকবরের সভায় হিন্দুগুণীর সংখ্যা যখন যথেষ্ট, জহাঙ্গীর বাদশার দরবারে তখন হিন্দুগুণীর সংখ্যা অতি নগণ্য —তাঁদের সন্তানরা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

তবুও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এই সামান্য ত্রুটি বাদ দিলে মধ্যযুগের ইতিহাসে ঐ যুদ্ধবিগ্রহের মাঝে হিন্দুসঙ্গীতকে শুধু বাঁচানো নয়, নূতন জীবন নূতন গতি দিয়ে গিয়েছিলেন অকবর বাদশা, তাঁর ১৫৪২ থেকে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ এই ৬৩ বৎসর জীবিতকালের মধ্যে। এই কালের মধ্যে যাঁদের কিছুটা চিনি তাঁরা হলেন বাজবহাদুর, নবাৎ খাঁ, তানতরঙ্গ, সুরৎসেন, বিলাস খাঁ ও ইব্রাহিম আদিল শা।

বাজবহাদুর

বাজবহাদুর সঙ্গীতজগতে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কিন্তু এঁর বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এঁর প্রকৃত নাম ছিল "মালিক বায়াজিদ্‌", পিতার নাম ছিল শুজাৎ খাঁ। বাজবহাদুর বোধ হয় ১৫২৫ থেকে ১৫৩০এর মধ্যে জন্মে-

ছিলেন, তবে কোথায় জন্মেছিলেন অজ্ঞাত। গুজরাটের সুলতান বহাদুর শা হুমায়ুন বাদশার নিকট পরাজিত হলে মালবে মল্লু খাঁকে নবাবরূপে দেখা যায়, পরে কুতুব খাঁকেও পাওয়া যায়; তারপর মালব ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে শের শাহ-কর্তৃক অধিকৃত হয়। এর পরে মালবের শাসনকর্তা হন শুজাৎ খাঁ বা সুজায়াৎ খাঁ। এই পাঠান সুজায়াৎ খাঁর পুত্র হলেন বাজবহাদুর।

বাজবহাদুর বোধ হয় ১৫৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে মালবের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি কার কাছে সঙ্গীত শিখেছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁর গানে রাজা মানের সঙ্গীত-পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই প্রভাব তাঁর পত্নী রূপমতীর গানের ভাষায় তালে ও ভাবেও বর্তমান আছে। এই প্রকৃতির গানের জন্য বাজবহাদুরকে খ্যালগায়ক বলা হয়। আসলে কিন্তু এ গানরীতি ধ্রুপদেরই। আর বাজবহাদুর আপন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে গান করে ঐ রীতিকে বাজখাঁনী রীতি নামে পরিচিত করিয়েছিলেন, যা শুনে অবুল ফজল লিখেছিলেন, "এঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই।" রাজা মানের গান-পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা উন্নততর, অবুল ফজল এই কথাই বলতেন এবং মনে প্রাণে বিশ্বাসও করতেন। মহম্মদ করম ইমাম বাজবহাদুরকে শাস্ত্রপ্রবীণও বলেছিলেন।

১৫৭০ খৃষ্টাব্দে আধম খাঁ রূপমতীর রূপ ও গুণের কথা শুনে তাঁকে লাভ করবার দুরাশায় মালব আক্রমণ করেন। ফলে রূপমতীকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে অপমানের হাত থেকে বাঁচতে হয়। সুতরাং কোনো কোনো গ্রন্থে যে জনশ্রুতি প্রচারিত আছে, বাজবহাদুর দীপক গান করে পুড়ে মরছেন আর রূপমতী বিলাপ করছেন, সে জনশ্রুতি নিতান্তই কষ্টকল্পনা। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বাজবহাদুর অকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁর সভাসদ মধ্যে পরিগণিত হন। বাজবহাদুরের মৃত্যুর সময় জানা সম্ভব হয় নি।

বাজবহাদুরের রচিত গানের সংখ্যা কত জানি না, আমরা দু-একখানি পেয়েছি। নট রাগে রূপমতীরও গান পেয়েছি—

জোবন জাত দিয়ে দগা।
ওর রঙ্গন কি কহা কহুঁ তোসো
জৈসী কুসুমকী রঁগা॥…
ঝমাঝম গোরে মুখকা ঝমকা।
রঙ্গিলী বেসরকে মোতীকা ঠমকা॥…

বাজবহাদুরের ধ্রুপদ গান বলে একখানি গানের উল্লেখ করা হয়, সেখানি প্রমাণসিদ্ধ কিনা তা জানা যায় না—

তুঁহি সর্বসক্তিমান জগমে বিরাজে
সৃজন করত জীব সব নিরখ
অচরজ লাগত।···
বাজবহাদুর নিতহি গুণ গাবে···'

ভাষাটা যেন বাজবহাদুরের নয় বলে মনে হয়।

নবাৎ খাঁ

নবাৎ খাঁ তানসেনের জামাতা— কন্যা সরস্বতীর স্বামী। ইনি নাকি পূর্বে হিন্দু রাজপুত ছিলেন; কিন্তু মুশকিল সেই রাজপুত নামটি নিয়ে। অনেকে বলেছেন এঁর নাম ছিল সমোখন সিং, মুসলমান হয়ে নূতন নাম হয় নবাৎ খাঁ। হরিদাস স্বামীর শিষ্য বলে যে আটজনের নাম উল্লেখ করা হয় সমোখন সিং তাঁদের মধ্যে একজন। যদিও সেই স্থলে এঁর নাম দেওয়া আছে রাজা সৌরসেন বা সোঁকাসেন বলে, আমরা কিন্তু সমোখন সিং উচ্চারণটিই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পেয়েছি। মহম্মদ করম ইমাম সমোখন সিংকেই খণ্ডার বাণীর জনক বলেছেন এবং পরিচয় দিয়েছেন তানসেনের জামাতা বলে। অবুল ফজল সমোখন সিংএর বা নবাৎ খাঁর নামই করেন নি। অল্প কয়েকজনের মতে নবাৎ খাঁর হিন্দু নাম ছিল মিশ্রী সিং (নবাৎ-এর ভারতীয় অর্থ মিশ্রী); এবং ইনি সমোখন সিংএর পুত্র ছিলেন। এই মতে মিশ্রী সিং পঞ্জাবের খণ্ডার নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। এঁর পিতা নাকি অকবরের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনার কথা অবশ্য লেখা নেই।

যাই হোক, নবাৎ খাঁ পূর্বে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান হন— কারো মতে বিবাহের পূর্বে— সে ক্ষেত্রে সমোখন সিংএর মৃত্যুর কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য হয় না; কোনো মতে বিবাহের পরে— সে ক্ষেত্রে সরস্বতী যে মুসলীম কন্যা সে কথাটি প্রমাণিত হয়। নবাৎ খাঁর জীবনকথা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তিনি কোথায় জন্মেছিলেন তাও নয়। মনে হয় ১৫৩৫-৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল। বীণাবাদ্যে নবাৎ খাঁ প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, এবং শোনা যায় যে অকবরের দরবারে ইনি তানসেনের গানে সহযোগিতা করতেন। সেই সূত্রেই পরিচয় এবং পরে তানসেনের নাম অনুসারে কন্যাবংশও সেনী নামে পরিচিত। এই

বংশে বীণাবাদনই প্রাধান্য লাভ করেছিল বলে একে বীনকার-বংশ বলা হয়। নবাৎ খাঁ বীণা কার কাছে শিখেছিলেন জানি না, কিন্তু বীণাবাদনের প্রাচীন পদ্ধতি পরিপূর্ণরূপে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বলে শোনা যায়। তার সঙ্গে তানসেনের বিশিষ্ট গানরীতি ও বাদ্যরীতি সংযুক্ত হয়ে নবাৎ খাঁর বীণাবাদন নবীনরূপ গ্রহণ করেছিল, যা পরবর্তীকালে উত্তর ভারতের একমাত্র রীতি বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। নবাৎ খাঁর সম্বন্ধে অনেক গাল-গল্প আছে, যেগুলি মুখরোচক হলেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। নবাৎ খাঁ বিবাহের সময় নাকি তানসেনের নিকট যৌতুকস্বরূপ দু শ ধ্রুপদ পেয়েছিলেন, যা বীনকার-বংশের নিজস্ব সম্পত্তি। এ গান অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, এমন-কি পুত্রবংশেও না। নবাৎ খাঁর মৃত্যুতারিখ আমাদের জানা নেই। এঁকে জাহাঙ্গীরের দরবারে আমরা দেখতে পাই না।

যাঁরা নবাৎ খাঁকে সমোখন সিংএর পুত্র বলেন, তাঁদের মতে সমোখন সিং সিংহলগড়ের রাজা ছিলেন। এঁদের সঙ্গে বৃজচন্দ, শ্রীচন্দ, চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ ও মহাপাত্রের নাম উল্লেখ্য। কথিত আছে, তানসেন গওহর বা গওরহার বাণী, এবং নবাৎ খাঁ খণ্ডার বাণী সৃষ্টি করেছিলেন। মহম্মদ করম ইমাম বলেন যে বৃজচন্দ ডাগুর ও শ্রীচন্দ নৌহার বাণীর প্রচলন করেন। অতএব এই দু জন গুণীকে স্মরণ করা উচিত। আমরা এইটুকু শুধু জানি যে, বৃজচন্দ দিল্লীর নিকটস্থ "ডংগর" নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবং শ্রীচন্দ পঞ্জাবের "নৌহর" গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু এই জানার সঙ্গে যা বেশী করে জানা উচিত, সেটি হল "বাণী" সম্বন্ধে। বাণী এঁরা কেউই তৈরী করেন নি, শুধু সেগুলিকে সামান্য সংস্কার করে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালে বাসস্থানের নাম অনুসারে শিষ্যেরা বাণীর নূতন নামকরণ করেছেন। প্রাচীনকালে শুদ্ধা, ভিন্না, গৌরী ও বেসরা গান-রীতি ছিল, এমন-কি সাধারণীও ছিল; ঐ গানরীতিগুলি গায়কের প্রকৃতি অনুসারে এক-একজনের নিকট এক-একটি প্রীতিকর হত বা অনুশীলনসাধ্য হত। তানসেন প্রভৃতির পূর্বকালেও ঐগুলি প্রচলিত ছিল এবং কালের নিয়মে তাদের কিছু কিছু রূপান্তরও ঘটেছিল। আমরা জানি, তানসেনের যুগে গ্বলিয়র, আগ্রা, বৃন্দাবন ইত্যাদি এবং পঞ্জাব, রাজপুতানা ইত্যাদি অঞ্চলে সঙ্গীতচর্চা চলেছে বেশী পরিমাণে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে, গ্বলিয়র ও পঞ্জাবের গায়কদের দ্বারাই প্রাচীন রীতিগুলি প্রচারিত হবার সুযোগ পাচ্ছিল; এবং সেই কারণেই তানসেনের যুগে এসে ঐগুলি ১) গ্বলিয়রী বা গ্বরীয়রী বা গওরারী ২) খণ্ডহারী বা খণ্ডারী, ৩) ডংগরারী, ডংগুরী, ডংগরী বা ডাগরী এবং ৪) নৌহারী নামে

প্রচলিত হয়ে পড়ে। এগুলি যে আগেই ছিল তার প্রমাণ তানসেন গানেই দিয়েছেন, যথা— রাজা গওয়ার ফৌজদার খণ্ডার, দীবান ডাগুর, বকসী নৌহার। তানসেন প্রভৃতি এইটুকু করেছেন যে, তাঁরা অকবরের সভায় ঐ রীতিগুলির প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তাও বৃজচন্দ, শ্রীচন্দের দান সম্বন্ধে বহুজনেই একমত নন। তানসেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, তাঁর স্পষ্ট গৌড়ারী এই ব্যাখ্যা আমাদের মনঃপুত নয়। কেননা সবকটি স্থানজ্ঞাপক নামের মধ্যে হঠাৎ জাতিবাচক নাম ঢুকে পড়া অস্বাভাবিক মনে হয়।

চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁর নাম আমরা শুনি তানসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। কোথায় কবে কী কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল তার নির্ভরযোগ্য কোনো বিবরণ নেই; শুধু তাই নয়, সুরজ খাঁর এমন কোনো খ্যাতি ছিল না যা তাঁকে তানসেনের সমকক্ষ করে তুলতে পারে। শোনা যায়, অকবর তাঁর সভায় প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান করতেন, কিন্তু নবরত্নের এক রত্নের সঙ্গে সুরজ খাঁর প্রতিযোগিতা অকবর অনুমোদন করবেন একথা অবিশ্বাস্য মনে হয়। এই সংবাদ বরং বিশ্বাস্য যে চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ নামে যাঁদের পরিচয় দেওয়া হয় তাঁরা অমীর খুসরোর পঞ্জাব-অন্তর্গত খয়রাবাদ নিবাসী শিষ্যবংশীয় গুণী, যাঁরা হয়তো অকবরের সভায় গুণপনা দেখাবার জন্য কোনো দিন উপস্থিত হয়েছিলেন। খয়রাবাদী খ্যাল বলতে যে রীতি বোঝায় এঁদের সেই রীতির স্রষ্টা বলে বিবেচনা করা হয়। এই বিবেচনার পিছনে সত্য কতটা আছে জানি না। এমনও হতে পারে যে, পঞ্জাবী ভাষায় যে ধ্রুপদমিশ্র গান তাঁরা গাইতেন, তাকেই খয়রাবাদী রীতি বলা হত, যা পরবর্তীকালে খ্যাল নামে চলিত হয়েছে।

চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ নাম দেখে তাঁদের হিন্দুধর্মপরিত্যাগকারী বলে ভেবে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং সকলে নিয়েছেনও তাই; কিন্তু তাঁরাই যে সোমনাথ ও দিবাকর এটুকু ভাবাই কষ্টকর; এই নাম দুটিকে ছোটো বড়ো কোনো সূত্র থেকেই আবিষ্কার করা যায় না। এ ব্যাপারে "নাদবিনোদ" গ্রন্থখানি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে রাগদর্পণ গ্রন্থ অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য। সেই গ্রন্থে আছে যে গ্বলিয়রের সুভান খাঁ নৌহারবাসী ছিলেন, শ্রীজ্ঞান খাঁ ফৎপুরবাসী ছিলেন। অতএব চাঁদ খাঁ সুরজ খাঁ খয়রাবাদী হয়েও সঙ্গীতশিক্ষার কারণে গ্বলিয়রে এসে থাকতে পারেন। তা হলে আইন-এ-অকবরীর চাঁদ খা আর এই চাঁদ খাঁ একই ব্যক্তি হয়ে পড়েন। সে ক্ষেত্রে খয়রাবাদী খ্যাল ইত্যাদির জনশ্রুতি কতটা টিকবে বলা যায় না। তা ছাড়া, মহম্মদ করম ইমামকে খুব বিশ্বাস করাও বিভ্রান্তিজনক।

তিনি বৃজচন্দ ও শ্রীচন্দকে বাণীর স্রষ্টা বলে আবার এক জায়গায় তাঁদের চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ বলে পরিচয় দিয়েছেন।

তানসেনের গৌরবে রামদাস বাবাজীকে না ভুললেও তাঁর সাথী মহাপাত্রকে আমরা খুব সহজে ভুলে যাই বলেই এই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁকে দাঁড় করিয়েছি। রামদাসের সঙ্গে ইনি ইসলাম শার দরবারেও ছিলেন, কিন্তু সেখানে তাঁর অন্য পরিচয় ছিল। অকবরই তাঁকে "মহাপাত্র" উপাধি দান করে তাঁর গুণপনার যথোচিত মর্যাদা দিলেন। তাঁকে ভুলক্রমে কখনো কখনো মহিপতি বলে সম্বোধন করা হয়।

তানতরঙ্গকে আমরা তানসেনের পুত্র বলেই বিবেচনা করি। তাঁর বংশের শেষ দিকের আলমসেন, অমৃতসেন এমন-কি অমৃতসেনের দত্তকপুত্র নিহালসেনও নিজেকে তানসেন বংশের বলে পরিচয় দিতেন। অবুল ফজল, ফকীরুল্লা প্রভৃতিও তাই বলেছেন, শুধু দু-একজন এবং রামপুরওয়ালারা কেন জানি না, ঐ পরিচয়টুকু গোপন রাখতে চেয়েছেন। বিলাস খাঁর এবং সদারঙ্গের বংশের সঙ্গে কি তান-তরঙ্গের বংশের কোনো রেষারেষি ছিল? মনে হয়, ছিল। মনে হয়, এমন কোনো ঘটনা ঘটেছিল যার জন্য তানতরঙ্গকে গ্বলিয়রে ফিরে আসতে হয়েছিল এবং সেইখানেই বংশানুক্রমে রাজ-আশ্রয়ে বাস করতে হয়েছিল। যাঁরা তানতরঙ্গ মানতরঙ্গ প্রভৃতিকে দেখিয়ে শিষ্যবংশের অজুহাত তোলেন তাঁরা মানতরঙ্গের বংশেরও যেমন পরিচয় দিতে পারেন না, তেমনি পুত্র শরৎসেন ও তরঙ্গসেনের বংশ সম্পর্কেও কোনো কিছু জানাতে অপারগ হন; অথচ তানতরঙ্গ-বংশ তার ধ্রুপদ-ঐতিহ্য নিয়ে সগর্বে আপন পরিচয় প্রকাশ করে। যাই হোক, তানতরঙ্গ যদি তরঙ্গসেনেরই অপর নাম হয়, তা হলে তিনি তানসেনের তৃতীয় পুত্র। কিন্তু আমরা যতদূর অনুমান করতে পারি, তাতে তানতরঙ্গই প্রথম পুত্র, সুরৎসেন দ্বিতীয় পুত্র, শরৎসেন বা কোনো মতে নিচোড়সেন তৃতীয় পুত্র এবং বিলাস খাঁ কনিষ্ঠ পুত্র। তানতরঙ্গ খুব সম্ভব ১৫৪০-৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সঙ্গীতশিক্ষা তাঁর তানসেনেরই কাছে, এবং গানেও তিনি সে কথা স্বীকার করেছেন— তানাবিকট তানসেন জাকো সুজস বাখানিয়ে। তারপরে তাঁকে আমরা উৎকৃষ্ট গায়করূপে অকবরের দরবারে দেখতে পাই। তখন বিলাস খাঁ সাধারণ শ্রেণীর গায়ক। এ হল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের কথা। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই অর্থাৎ তানসেনের মৃত্যুর পরেই দেখলাম তানতরঙ্গ দিল্লীতে অনুপস্থিত, জহাঙ্গীরের দরবারে বিলাস খাঁ প্রধান। জনশ্রুতি এই যে, তানসেনের মৃত্যুকালে

বিলাস খাঁর সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যই তাঁকে পুরোভাগে নিয়ে যায়। কিন্তু যে বিলাস-খানি টোড়ীর জন্য এই জনশ্রুতি সে টোড়ী প্রাচীন টোড়ীরই সামান্য রদবদল, তার এমন কিছু আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য অন্তত অকবরের সময়ে চিন্তনীয় নয়, যখন টোড়ী নিজরূপ তখন পর্যন্ত একেবারে বিসর্জন দেয় নি। আর উদাহরণস্বরূপ "কৌন ভ্রম ভুলোরে" পংক্তিযুক্ত যে গানটিকে উদ্ধৃত করা হয়, সেটি মোটেই মৃত্যুকালে গাইবার গান নয়। তানসেনের জীবিতকালে অপরের কাছে তানসেনের গুণ-প্রকাশক গান! না হলে কেউ বলে না, "মিলহো তানসেন গুরুজ্ঞানী।" তবু আমাদের ধরে নিতে হবে যে, তানসেনের বৃদ্ধ অবস্থায় শূন্যপদ অধিকার করা নিয়ে একটা বিবাদ নিশ্চয়ই হয়েছিল, যাতে যে-কোনো কারণেই হোক বিলাস খাঁ জয়ী হয়েছিলেন। তারপর থেকে তানতরঙ্গের আর কোনো সংবাদই আমরা পাই না; শুধু তাঁর বংশের সন্তানদের দেখে তাঁর বিচার করি। এই বিচার থেকে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তানসেনের চার পুত্রের এক পুত্র অর্থাৎ শরৎ বা নিচোড়সেন গায়ক বা বাদক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন নি। সুরৎসেন ছিলেন পণ্ডিত, তিনি মার্গ অর্থাৎ সংস্কৃত রাগাদির চর্চা করতেন। তানতরঙ্গ ছিলেন গায়ক এবং তাঁর বংশে গানই ছিল প্রধান, যন্ত্রকে তিনি গ্রহণ করেন নি। আর বিলাস খাঁ গায়ক হলেও যন্ত্রই তাঁর বংশে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল যেজন্য সেই বংশকে রবাবীয়া বংশ বলা হত। অপর দিকে তানসেনের কন্যাবংশ বীণাকে করেছিল প্রধান এবং বীনকার-বংশ বলে নিজেকে চিহ্নিত করেছিল। তানতরঙ্গের গানের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তাঁর গানের নমুনা—

প্রথম মঞ্জন কর অঞ্জন দেত নৈন
ঔর মাঁগ সিন্দুর তা পর শিস ফুল
গরে মুকুতমাল ভাল টীক অঙ্গ চন্দন
পহর নীল সাড়ী মুখকমলপর অলক
সোহত চতর বনবারী আয়ে আড় নিরখত। ··

রৈন গমায়ে আয়ে হো লালন কহাঁ জাগে
খগরী রাত বাত কহো প্যারে।

তানতরঙ্গ রসরঙ্গ ভীনী কীনহীনখ-চিহ্ন
ভাগ জাগে হমারে॥

তিনি বৃজচন্দ ও শ্রীচন্দকে বাণীর স্রষ্টা বলে আবার এক জায়গায় তাঁদের চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ বলে পরিচয় দিয়েছেন।

তানসেনের গৌরবে রামদাস বাবাজীকে না ভুললেও তাঁর সাথী মহাপাত্রকে আমরা খুব সহজে ভুলে যাই বলেই এই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁকে দাঁড় করিয়েছি। রামদাসের সঙ্গে ইনি ইসলাম শার দরবারেও ছিলেন, কিন্তু সেখানে তাঁর অন্য পরিচয় ছিল। অকবরই তাঁকে "মহাপাত্র" উপাধি দান করে তাঁর গুণ-পনার যথোচিত মর্যাদা দিলেন। তাঁকে ভুলক্রমে কখনো কখনো মহিপতি বলে সম্বোধন করা হয়।

তানতরঙ্গকে আমরা তানসেনের পুত্র বলেই বিবেচনা করি। তাঁর বংশের শেষ দিকের আলমসেন, অমৃতসেন এমন-কি অমৃতসেনের দত্তকপুত্র নিহালসেনও নিজেকে তানসেন বংশের বলে পরিচয় দিতেন। অবুল ফজল, ফকীরুল্লা প্রভৃতিও তাই বলেছেন, শুধু দু-একজন এবং রামপুরওয়ালারা কেন জানি না, ঐ পরিচয়টুকু গোপন রাখতে চেয়েছেন। বিলাস খাঁর এবং সদারঙ্গের বংশের সঙ্গে কি তান-তরঙ্গের বংশের কোনো রেষারেষি ছিল? মনে হয়, ছিল। মনে হয়, এমন কোনো ঘটনা ঘটেছিল যার জন্য তানতরঙ্গকে গ্বলিয়রে ফিরে আসতে হয়েছিল এবং সেইখানেই বংশানুক্রমে রাজ-আশ্রয়ে বাস করতে হয়েছিল। যাঁরা তানতরঙ্গ মানতরঙ্গ প্রভৃতিকে দেখিয়ে শিষ্যবংশের অজুহাত তোলেন তাঁরা মানতরঙ্গের বংশেরও যেমন পরিচয় দিতে পারেন না, তেমনি পুত্র শরৎসেন ও তরঙ্গসেনের বংশ সম্পর্কেও কোনো কিছু জানাতে অপারগ হন; অথচ তানতরঙ্গ-বংশ তার ধ্রুপদ-ঐতিহ্য নিয়ে সগর্বে আপন পরিচয় প্রকাশ করে। যাই হোক, তানতরঙ্গ যদি তরঙ্গসেনেরই অপর নাম হয়, তা হলে তিনি তানসেনের তৃতীয় পুত্র। কিন্তু আমরা যতদূর অনুমান করতে পারি, তাতে তানতরঙ্গই প্রথম পুত্র, সুরৎসেন দ্বিতীয় পুত্র, শরৎসেন বা কোনো মতে নিচোড়সেন তৃতীয় পুত্র এবং বিলাস খাঁ কনিষ্ঠ পুত্র। তানতরঙ্গ খুব সম্ভব ১৫৪০-৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সঙ্গীতশিক্ষা তাঁর তানসেনেরই কাছে, এবং গানেও তিনি সে কথা স্বীকার করেছেন— তানাবিকট তানসেন জাকো সুজস বাখানিয়ে। তারপরে তাঁকে আমরা উৎকৃষ্ট গায়করূপে অকবরের দরবারে দেখতে পাই। তখন বিলাস খাঁ সাধারণ শ্রেণীর গায়ক। এ হল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের কথা। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই অর্থাৎ তানসেনের মৃত্যুর পরেই দেখলাম তানতরঙ্গ দিল্লীতে অনুপস্থিত, জহাঙ্গীরের দরবারে বিলাস খাঁ প্রধান। জনশ্রুতি এই যে, তানসেনের মৃত্যুকালে

বিলাস খাঁর সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যই তাঁকে পুরোভাগে নিয়ে যায়। কিন্তু যে বিলাস-খানি টোড়ীর জন্য এই জনশ্রুতি সে টোড়ী প্রাচীন টোড়ীরই সামান্য রদবদল, তার এমন কিছু আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য অন্তত অকবরের সময়ে চিন্তনীয় নয়, যখন টোড়ী নিজরূপ তখন পর্যন্ত একেবারে বিসর্জন দেয় নি। আর উদাহরণস্বরূপ "কৌন ভ্রম ভুলোরে" পংক্তিযুক্ত যে গানটিকে উদ্ধৃত করা হয়, সেটি মোটেই মৃত্যুকালে গাইবার গান নয়। তানসেনের জীবিতকালে অপরের কাছে তানসেনের গুণ-প্রকাশক গান! না হলে কেউ বলে না, "মিলহো তানসেন গুরুজ্ঞানী।" তবু আমাদের ধরে নিতে হবে যে, তানসেনের বৃদ্ধ অবস্থায় শূন্যপদ অধিকার করা নিয়ে একটা বিবাদ নিশ্চয়ই হয়েছিল, যাতে যে-কোনো কারণেই হোক বিলাস খাঁ জয়ী হয়েছিলেন। তারপর থেকে তানতরঙ্গের আর কোনো সংবাদই আমরা পাই না; শুধু তাঁর বংশের সন্তানদের দেখে তাঁর বিচার করি। এই বিচার থেকে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তানসেনের চার পুত্রের এক পুত্র অর্থাৎ শরৎ বা নিচোড়সেন গায়ক বা বাদক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন নি। সুরৎসেন ছিলেন পণ্ডিত, তিনি মার্গ অর্থাৎ সংস্কৃত রাগাদির চর্চা করতেন। তানতরঙ্গ ছিলেন গায়ক এবং তাঁর বংশে গানই ছিল প্রধান, যন্ত্রকে তিনি গ্রহণ করেন নি। আর বিলাস খাঁ গায়ক হলেও যন্ত্রই তাঁর বংশে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল যেজন্য সেই বংশকে রবাবীয়া বংশ বলা হত। অপর দিকে তানসেনের কন্যাবংশ বীণাকে করেছিল প্রধান এবং বীনকার-বংশ বলে নিজেকে চিহ্নিত করেছিল। তানতরঙ্গের গানের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তাঁর গানের নমুনা—

প্রথম মঞ্জন কর অঞ্জন দেত নৈন
ঔর মাঁগ সিন্দুর তা পর সিস ফুল
গরে মুকুতমাল ভাল টীক অজ চন্দন
পহর নীল সাড়ী মুখকমলপর অলক
সোহত চতর বনবারী আয়ে আড় নিরখত।··

রৈন গমায়ে আয়ে হো লালন কহাঁ জাগে
খগরী রাত বাত কহো প্যারে।

তানতরঙ্গ রসরঙ্গ ভীনী কীনহীনখ-চিহ্ন
ভাগ জাগে হমারে॥

অনুক্রম সোঁ পাবে তীবরতরতীবর
কোমল অতকোমল সকারী ত্রয় ভেদ
সংগ লিয়ে সুর তাল।...

তানতরঙ্গের রচনায় কৃষ্ণলীলা, নায়িকা-বর্ণনা, সঙ্গীত-বিচার ও ভগবৎ-ধ্যান পাওয়া যায়।

বিলাস খাঁ

বিলাস খাঁ ছিলেন তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র। খুব সম্ভব ১৫৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। পিতার কাছেই সঙ্গীত শিক্ষা করে ১৫৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে ইনি অকবরের সঙ্গীতজ্ঞরূপে পরিচিত হন। প্রতিভাসম্পন্ন হওয়ায় অল্পকাল মধ্যে বিলাস খাঁ দরবারে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন, প্রতিষ্ঠা পেলেন এবং জহাঙ্গীরের দরবারে প্রধান সঙ্গীতজ্ঞের পদলাভ করলেন। কোনো মতে ইনি উদাসীপ্রকৃতির ছিলেন, অর্থাদির প্রতি এঁর কোনো মমতা ছিল না। এ বক্তব্যের সপক্ষে বা বিপক্ষে বলবার কিছু নেই।

জহাঙ্গীর তাঁর গ্রন্থে বিলাস খাঁর সম্বন্ধে বেশী কিছু বলেন নি, কাজেই বিলাস খাঁ কেমন ছিলেন তা জানা যায় না। তবে এঁর গান থেকে আমরা জানতে পারি যে বিলাস খাঁ সাধুপ্রকৃতির ছিলেন, যদিও তানসেনের মতোই তিনি বাদশার গুণকীর্তন করেছেন এবং আতিশয্যের সঙ্গেই করেছেন।

বিলাস খাঁর মৃত্যুসময় আমাদের অজ্ঞাত। সাঙ্গীতিক জীবনে বিলাস খাঁ "বিলাসখানী টোড়ী" "বিলাসখানি কল্যাণ" ইত্যাদি রাগ সৃষ্টি করেন এবং ভগবদ্-বিষয়ক, রাজপ্রসংসা-সূচক, নায়িকাভেদবর্ণনাকারী গান রচনা করেছেন। বিলাস খাঁর একটি প্রসিদ্ধ গান হল জহাঙ্গীরের প্রসংসাসূচক—

রবথৎলী দিল্লীবর শা জহাঙ্গীর বৈঠে তখত...
তানসেননন্দন বিলাস গাবে সুধ সারঙ্গ
রঙ্গনাথরটপাণি পদপঙ্কজ চিত চাহে॥

ইব্রাহিম আদিল শা

বীজাপুরের সুলতানবংশ ছিলেন সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধ। তার মধ্যে ইব্রাহিম আদিল শা দ্বিতীয় তাঁর "নওরস-ই-আদিল" গ্রন্থের জন্ম সঙ্গীতজগতে কীর্তিমান স্রষ্টারূপে ঘোষিত হন। ইনি একাধারে গায়ক, কবি ও ভাবুক-রসজ্ঞ

ছিলেন। তাঁর গানে তানসেন প্রভৃতির মতো রাজপ্রশংসা ছিল না, বিভিন্ন বিষয় ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে বর্ণনা বা আলোচনা ছিল। কানড়া রাগটি আদিল শার অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলে মনে হয়, কারণ তাঁর গানের বেশীর ভাগই এই রাগে রচিত। পরবর্তীকালে এই কানড়া নওরসীকানড়া বা নবরসকানড়া নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। আদিল শা নওরস শব্দটি মঙ্গলসূচক অর্থে ব্যবহার করতেন। তাই নওরস শব্দটি রাগনামের পূর্বে ব্যবহার করাও তাঁর রীতি ছিল। শোনা যায়, আদিল শার দরবারে প্রায় এক হাজার সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি নিজে বখ্‌তার খাঁ ও চাঁদ খাঁর নাম করেছেন। বখতার খাঁর গুণপনায় তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বখতার খাঁর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। আদিল শার গানে সাধারণত তিনটি ধাতু বা তুক্ পাওয়া যায়। তিনি এদের নাম ঠিকমতো দেন নি ; প্রথমটির নাম নেই— সেটিকে তিনি স্থায়ী বলতেন, কি ধ্রুব বলতেন তা জানা যায় না ; দ্বিতীয় তুক্‌কে আদিল শা বলেছেন "বৈন", কচিৎ "অন্তরা" ; তৃতীয় তুকের নাম আভোগই আছে। এই তিনটি তুক্ দেখে জহাঙ্গীর তাঁর তুজুক-ই-জহাঙ্গীরীতে গানগুলিকে ধ্রুপদ ও খ্যালের মধ্যবর্তী বলেছেন। যদিও এই উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই সময়ে খ্যাল প্রচলিত ছিল, তবু নওরস গ্রন্থে খ্যাল-টপ্পার নাম নেই। আসলে এই গানগুলি হল ত্রিধাতুযুক্ত ধ্রুবপ্রবন্ধের অনুকরণ, যা আদিল শা তাঁর সঙ্গীতশিক্ষকের নিকট পেয়েছিলেন। আদিল শা হিন্দুদের শিল্পকলায় অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং হিন্দুদের কাছ থেকেই সঙ্গীত, চিত্রাংকন ইত্যাদি শিক্ষা করতেন, সুতরাং ধ্রুবপ্রবন্ধের তিন ধাতু সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট ছিল না বলেই মনে হয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আভোগের মধ্যেই দুটি খণ্ড লুকিয়ে আছে। তাঁর গানে সরস্বতী গণেশ প্রভৃতির স্তব আছে, পীর পয়গম্বরের বন্দনা আছে, রাগ-বর্ণনা আছে, প্রাকৃতিক রূপবর্ণনা আছে, মিলন-বিরহ-জল্পনা আছে। ইব্রাহিম তাঁর স্ত্রী চাঁদ সুলতানের নামেও অনেক গান রচনা করেছিলেন। ইব্রাহিমের কবিত্বশক্তির নমুনা দেখুন—

উপমা সুন্দরী সোহে সুদ সদা বরসাঁত।
বিজলিয়াঁ ঝমকে জগা জোতসোঁ বত্তিসী দাঁত॥
কিসবত রংগরংগ দিসে জ্যুঁ বাদল
ছায়ে বরসে মেঘ সো খোয়ে জল॥...

গরজে সো তু কহে রাগ মলহার
ইবরাহিম মোর রীঝ নাচে পুকার ॥

ইব্রাহিম আদিল শা ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং নয় বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল চাঁদবিবি। স্ত্রীর নাম ছিল চাঁদ সুলতান। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম দেহরক্ষা করেন।

পশ্চিম ও উত্তর ভারতের গুণীদের মোটামুটি পরিচয় এইখানে শেষ হলেও একদিকে রইলেন ধোঁধী ও ধীরজ, অন্যদিকে ফকীরুল্লা ও করম ইমাম -বর্ণিত সঙ্গীতজ্ঞগণ।

ধোঁধী অকবরের সময়ের নায়ক, তাঁর নামে ধোঁধী-কী-মল্লার আছে এবং দু-চারটি গান আছে। জগন্নাথ কবিরায় -প্রশংসিত বাণীরসাল ধোঁধীর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। এঁর গানের নমুনা দেখুন—

নও ভবন নও রাঘব নও বাস নও আস
নঙ্গ কিরিটকুণ্ডল নঙ্গ নঙ্গ হৈ কলঙ্গীরী।...
ধুঁধীকে প্রভু তুম বহুনায়ক শাসরো
সলোন তোসোঁ রহত উমঙ্গীরী ॥

ধীরজ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ইনি কোন্ সময়ের গুণী তা বলতে আমরা অক্ষম। তবে লেখার ধরণ দেখে ধীরজকে ১৬শ শতকের গুণী বলে মনে হয়। তাঁর একটি গান হল—

আজকো সিংগার সুভগ সাঁবরে গুপালজুকো
কহত ন বন আবে দেখহি বন আবেরী।...
কণ্ঠসিরী মোতিনমাল ফেটা কট জরী দুসাল
ছবি নিরখ আলিরি ধীরজ মন লাবেরী ॥

হরবল্লভকেও অকবরকালীন গুণী বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। আমরা এঁর দু-একখানি গান ছাড়া আর কিছু পরিচয় পাই নি। কাজেই এঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে পারছি না। ফকীরুল্লা যাঁদের নাম করেছেন তাঁরা হলেন— গুণসেন, লাল খাঁ কলাবন্ত, জগন্নাথ কবিরায়, রঙ্গ খাঁ, মিশ্রী খাঁ ঢাড়ী, সুবলসেন এবং ভগবান।

গুণসেন নায়ক ভন্নুর বংশধর, কাশ্মীরে বাস করতেন, নায়ক উপাধি পেয়েছিলেন। এঁর মুসলমানী নাম ছিল অফ্‌জল। ১৬শ শতাব্দের শেষের দিকে এঁর জন্ম হয়েছিল।

লাল খাঁ কলাবন্ত বিলাস খাঁর শিষ্য এবং জামাতা ছিলেন। ১৫৮৫ থেকে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম। (জহাঙ্গীর বাদশা এক লাল খাঁ কলাবন্তের নাম করেছেন। তিনি ছিলেন মীয়াঁ লাল যিনি ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেছিলেন)। শাজাহানের দরবারে ইনি "গুণসমুদ্র" উপাধি পেয়েছিলেন। ১৬৭৫-৮০ খৃষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।

জগন্নাথ কবিরায় সম্ভবতঃ ১৫৬০-৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৬শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জন্মেছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন এবং অল্প বয়সেই গানপ্রবীণ হয়ে উঠেছিলেন। শোনা যায়, প্রথম জীবনে গান রচনা করে এবং সুর দিয়ে ইনি তানসেনকে শোনাতেন। তানসেন নাকি বলেছিলেন যে, কবি ও গায়ক হিসাবে জগন্নাথের স্থান তানসেনের ঠিক পরেই। তা যদি হবে, তা হলে জহাঙ্গীর বাদশার সময়ে এঁর নাম শোনা যায় নি কেন? কাজেই তানসেনের ঐ প্রশংসা নিতান্তই মৌখিক ছিল, জগন্নাথকে প্রতিষ্ঠিত করবার কোনো উদ্দেশ্য এর মধ্যে ছিল না। অবশ্য, জহাঙ্গীরের দরবারের গুণীদের যা নাম দেখি, তা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না এবং দেখলেই মনে হয়, অন্য ধরণের নামগুলিকে যেন মুসলমানী উপাধি দিয়ে সাজানো হয়েছে। জহাঙ্গীরদাদ, খুররম্‌দাদ প্রভৃতি নাম আমাদের কাছে কিছুটা অদ্ভুত লাগে, অন্তত জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে। যাই হোক, জগন্নাথ শাজাহানের দরবারে উচ্চপদ পেয়েছিলেন, তবে তাঁর বৃদ্ধ বয়সে। এই দরবারেই নাকি জগন্নাথ "কবিরায়" উপাধি পেয়েছিলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভাতখণ্ডেজী জগন্নাথকে ভাবভট্টের পিতা জনার্দন ভট্টের সঙ্গে এক করতে চেয়েছেন। কিন্তু জগন্নাথ কোথাও নিজেকে জনার্দন বলেন নি, সঙ্গীতরাজ তিনি ছিলেন না, এবং ঔরংজেবের রাজত্বের প্রারম্ভেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ সময়ে তাঁর সন্তান থাকলেও তাঁর বয়স হত অন্তত সত্তর বৎসর। অপর দিকে, অনুপ সিং বিকানীরের সিংহাসনে বসবার আগে পর্যন্ত ঔরংজেবের সঙ্গে কর্ণসিংএর যুদ্ধ চলছে, কাজেই রাজ্যময় অশান্তি; সুতরাং ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দের অন্তত বছর কতক পরে জনার্দনের পুত্র ভাবভট্ট গ্রন্থ লেখার নির্দেশ পেয়েছিলেন। তা হলে, ভাবভট্ট জগন্নাথ কবিরায়ের পুত্র হলে এই সময়ে তাঁর বয়স হবে সাতাশী-অস্টাশী বছর। এই বয়সে কী পর-পর এতগুলি গ্রন্থ লেখা সম্ভব? তা ছাড়া, ঐ ভাবে অতিশয়োক্তি করে অনুপ সিংএর প্রশংসা করাও কি একজন অতিবৃদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞের পক্ষে সম্ভব? বরং ইতিহাসে যে পাওয়া যায় পণ্ডিত জনার্দন নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ শাজাহানের বৃত্তি ভোগ করতেন, তিনিই ভাবভট্টের পিতা হওয়া সম্ভব; এঁকে জগন্নাথও বলা হত। ভাবভট্ট সব

ব্যাপারেই অতিশয়োক্তি করতেন, পিতার ব্যাপারে ও নিজ ব্যাপারেও তাই করেছেন; অথচ অপরের উদ্ধৃতি ছাড়া তাঁর গ্রন্থে পিতার বৈশিষ্ট্যের বা আপন মৌলিকতার কোনো প্রমাণই তিনি দিতে পারেন নি। আমরা ভেবে নিতে পারি যে, সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকালে জনার্দন ভট্ট চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসরের ছিলেন, যখন জগন্নাথের বয়স ছিল অন্তত সত্তর। আর তা না হলে স্বীকার করে নিতে হয় যে, তানসেন যে জগন্নাথের প্রতিভার কথা বলেছিলেন, সে জগন্নাথ জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দেহত্যাগ করেছিলেন; শাজাহানের দরবারের জগন্নাথ পৃথক ব্যক্তি, যিনি কবিরায়ও বটেন, সঙ্গীতরাজও বটেন। অসুবিধার ব্যাপার এই যে, জগন্নাথ কবিরায় শাজাহানের গুণকীর্তনও যেমন করেছেন, বকৃয়ু তানসেনের কথাও তেমনই প্রত্যক্ষদর্শীর মতো লিখেছেন; তা ছাড়া, ফকীরুল্লা ঔরংজেবের সময়েই উপস্থিত থেকে প্রায় প্রত্যক্ষদর্শীর মতো এই গুণী সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে তানসেনের জগন্নাথ এবং শাজাহানের জগন্নাথ কবিরায়কে পৃথক ব্যক্তি বলে সন্দেহ করা বোধ হয় খুব যুক্তিসহ নয়।

রঙ্গ খাঁ শাজাহানকালীন গুণী। ইনি ১৬শ শতকের শেষের দিকে জন্মেছিলেন। রঙ্গ খাঁর ধ্রুপদপারঙ্গমতার জন্য তাঁকে কলাবন্ত বলা হত। এঁর অপর নাম "দৈরং খাঁ"। একবার ইনি তুল্যওজনের রৌপ্য বখ্‌শীষ পেয়েছিলেন। আশী বছর বয়সে রঙ্গ খাঁর মৃত্যু হয়।

মিশ্রী খাঁ ঢাড়ী ছিলেন বিলাস খাঁর ছাত্র। ১৬শ শতাব্দের শেষ ভাগে তাঁর জন্ম। ১৬৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি শা শুজার সঙ্গে বাংলায় গমন করেন। মিশ্রী খাঁ বাংলায় কোনো ছাত্রকে ধ্রুপদ শিক্ষা দিয়েছিলেন কিনা আমরা জানি না। কিন্তু সেনী সংগীত যে ১৭শ শতকে বাংলাদেশে প্রচারিত হত তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশ্রী খাঁর সঙ্গে "গুণ খাঁ কলাবন্ত"ও বাংলায় গিয়েছিলেন। গুণ খাঁ সংস্কৃত প্রাচীন গানও জানতেন। দু জনেই উত্তম কবি ছিলেন। দেখা যাচ্ছে, ধ্রুপদরীতি এবং সেনী ধ্রুপদরীতি বিষ্ণুপুরে প্রচারিত হবার অন্তত দু শ বছর আগে বাংলায় এসেছিল। দরবার থেকে সেই রীতি নিশ্চয়ই সাধারণের মাঝে ছড়িয়েছিল, এবং সে রীতি বিলাস খাঁর নিজস্ব সেনীরীতি।

সুবলসেন সুরৎসেনের পুত্র, তানসেনের নাতি। ইনি ১৬শ শতাব্দের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উত্তম গায়করূপে শাজাহানের রাজত্বকালে ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অন্যমতে এঁর প্রকৃত নাম সুহীলসেন। ১৬৫৫-৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।

দার্শনিক আলোচনার এই ধারা পৌঁছয় বঙ্কিমচন্দ্রে (১৮৩৮–১৮৯৪)। তিনি রচনা করলেন অনেক প্রবন্ধ, যথা— ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে (১২৮২ বঙ্গাব্দ), চিত্তশুদ্ধি (১২৯২ বঙ্গাব্দ), ধর্ম ও সাহিত্য (১২৯২ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি ; তদুপরি সাম্য (১৮৭৯), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬), ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮) এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা (১৯০২)।

ইতিমধ্যে দেশে গড়ে উঠেছে একটি মননশীল সমাজ। সমাচারচন্দ্রিকা থেকে আরম্ভ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অতিক্রম করে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থসঙ্গ্রহ, এবং তৎপর বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় যার পরিণতি। বিশেষ করে এই পত্রিকা-চতুষ্টয়ের কথা বলা হল। এই পত্রিকা-কয়টির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে জেগে উঠেছে নবীন সাহিত্যসমাজ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সমাজের মধ্যে লালিত ও পালিত হয়ে নিজেকে সেই সমাজের উপযোগী করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন।

সমাজের যখন এই রকম অবস্থা তখন তার আর-একটি দিকের কথাও এখানে বলা কর্তব্য। দেশের রুচি উন্নত করার জন্যে এইরকম উৎসাহ ও উদ্যোগ যখন চলেছে তখন দেশের মধ্যেই আরও একটা স্রোত বয়ে চলেছিল। সেটা হচ্ছে কুরুচির দিক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান।•• ইংরাজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ-নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি ; এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয় জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।"[৮]

একদল বাঙালি তখন কুরুচিতে আগ্রহশীল ছিল। কবির গান তবুও হয়তো কেবল সাহিত্যরসবর্জিত বলেই অশ্রদ্ধেয়, কিন্তু এ'তে কুরুচি সম্ভবত

ততটা নেই। কিন্তু লোকমনোরঞ্জনের নামে আর যা ছিল তার নাম খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই।

সুরুচি একদিকে জেগে উঠছে এবং কুরুচি একদিকে স্তিমিত হয়ে আসছে, উদয় এবং অস্ত— এরই সন্ধিস্থলে যে সমাজ, সে সমাজ নিজস্ব চেহারা তখনও স্পষ্ট ধারণ করতে পারে নি। এই অস্পষ্ট আলোকের মধ্যে নিজেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত করার জন্যে বাংলাদেশ তখন জাগ্রত হয়ে উঠছে।

এমনই মাহেন্দ্রক্ষণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের আলো-বাতাস লাভ করেছিলেন।

১ *Bengali Grammar*: Manoel da Assumcam, edited with Bengali translation by Chatterji and Sen, Calcutta University.

২ এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য— Dr. S. K. Chatterjee, *Origin and Development of the Bengali Language*.

৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'

৪ *Poems*, H. L. V. Derozio, London, 1927

The Poetical Works of *Henru Louis Vivian Dèrozio*, Edited by B B Shah, with a brief Memoir of the Author by E. W. Madge, Calcutta, 1907.

৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দ্বিতীয় খণ্ড

৬ "On the Vedant System (in defence of Hindoo Idolatry, against the observations of Rammohun Roy)"

৭ *Dialogues on the Hindu Philosophy*, Freely rendered into Bengali with certain modifications by Rev. K. M, Banerjee, 1867.

৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লোকসাহিত্য'

স্বদেশচর্চা

বঙ্গদেশে স্বদেশচর্চার সূত্রপাত হয়েছে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। দেশ-মাতৃকার হিতসাধনের প্রেরণা এই সময়ে অভিব্যক্ত হতে আরম্ভ করে। সাহিত্যেও তার প্রতিধ্বনি এসে পৌঁছয়।

কিন্তু এ-বিষয়টির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার আগে আমরা দেশের পূর্ব-ইতিহাস একটু আলোচনা করে নিতে পারি।

আমরা বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করছি, এইজন্যে দেশের ইতিহাস আলোচনাকালে আমাদের আলোচনা বঙ্গদেশের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাখছি।

পূর্বে বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত-সমাজ নামে কোনো সমাজের অস্তিত্ব ছিল না। মোটামুটি ভাবে দেশে কেবল দুইটি শ্রেণী ছিল— জমিদার ও রায়ত। উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকে আর-একটি সমাজ গড়ে উঠতে আরম্ভ করে, এবং অবশেষে তা মধ্যবিত্ত সমাজ নামে অভিহিত হয়।

এই মধ্যবিত্ত-সমাজের সূত্রপাতের কারণ দশশালা বন্দোবস্ত। বঙ্গদেশ তখন জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু জমিদারদের তখন দেশের বা দশের প্রতি তেমন মমত্ব ছিল বলে মনে হয় না। বহু প্রাচীন ইতিহাসের অবতারণা না করে এই দশশালা বন্দোবস্তের ঠিক পূর্বকাল থেকে আমরা আলোচন করতে পারি। নদীয়ার রাজসিংহাসনে তখন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র আসীন। তাঁর রাজত্বকাল হচ্ছে ১৭৮৮ থেকে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঈশ্বরচন্দ্র একটু বেহিসাবী লোক ছিলেন এবং অকারণে অনেক অর্থের অপব্যয় করতেন, এবং একবার নাকি একটি বানরের বিবাহ দিয়ে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেছিলেন— ইতিহাসকারেরা এইরূপ বলেছেন।[১] এর দরুন দেশে নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। জমিদারদের উদাসীনতার জন্য ভালোমত রাজস্ব আদায় হয় না, কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন হয় না, দুর্ভিক্ষনিবারণের ব্যবস্থা হয় না। এইসব দেখে, ১৭৮৬ সালে, লর্ড কর্নওয়ালিশ এ দেশের জমিদারদের সঙ্গে একটা নিষ্পত্তি করে নিলেন— বার্ষিক কত রাজস্ব জমিদারদের দিতে হবে দশ বৎসরের জন্যে তা ধার্য করে নিলেন। এবং বিলাতের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করলে এই ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হবে বলে ঠিক হল। তদনুযায়ী ১৭৯৩

সালে এই দশশালা ব্যবস্থাটি চিরস্থায়ী রূপ নিল। এর ফলে ক্রমশ জমিদারদের জমিদারি হ্রাস পেতে আরম্ভ করল'। এর আগে, নবাবি আমলে, জমিদাররা খাজনা যথাসময়ে না দিতে পারলে তাঁরা নিগৃহীত হতেন, কিন্তু জমিদারি যেত না। এই চিরস্থায়ী বা দশশালা বন্দোবস্তে খাজনা দিতে না পারলে জমিদারদের রেহাই ছিল না। জমিদারি নিলামে উঠতে আরম্ভ করল। জমিদারদের জমিদারি যেতে আরম্ভ করল। এবং জীবিকানির্বাহের জন্য অনেক লোককে ইংরেজদের কুঠিতে বা আদালতে চাকুরি গ্রহণ করতে হল।

এই চাকুরিজীবী সমাজই ক্রমশ মধ্যবিত্ত-সমাজ গড়ে তুলতে লাগল। এবং বর্তমান কালে এই সমাজ একটি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু যে কথা বলার জন্য এই পুরাতন কথার অবতারণা তা হচ্ছে স্বদেশ-চর্চা। দেশের জমিদারেরাই যখন দেশ সম্বন্ধে উদাসীন তখন দেশের মাটিতে দেশানুরাগ দেখা দেওয়া সম্ভব নয়।

ক্রমশ আমরা উপস্থিত হলাম ঊনবিংশ শতকে। এই শতকে একদিকে যেমন জমিদারদের শক্তি হ্রাস পেতে লাগল, অন্যদিকে তেমনি ইংরেজ-রাজ্য স্থাপনের ও তাদের বাণিজ্যের বিস্তার ঘটতে লাগল।

এবং এই সময়ে, ১৮০০ সালে, কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনার সঙ্গেসঙ্গে পাঠ্যবইয়ের প্রয়োজন দেখা দিল। বাংলা ভাষায় তখন পাঠ্যবই ছিল না। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়ম কেরী, রামরাম বসু, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি লেখকগণ কয়েকটি বই প্রকাশ করলেন। কিন্তু এ গেল কেবল গতানুগতিক শিক্ষার কথা। ইংরেজদের রাজ্যশাসনের উপযোগী শিক্ষিত লোক দরকার— এসব সেই ব্যবস্থারই অঙ্গ হিসাবে ধরা যায়।

কিন্তু এরও একটা শুভফল আছে। এই কাজের মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনায় রত হলেন। ১৮০২ সালে প্রকাশিত হল তাঁর বত্রিশ সিংহাসন— উপনিষদ্ ও বেদান্তে পারঙ্গমতার নিদর্শন; এবং ১৮১৭ সালে বেদান্তচন্দ্রিকা। তার পরেই রামমোহন রায়ের কথা উল্লেখযোগ্য, ১৮১৫ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে ধর্ম ও সমাজ -সংস্কারের নিমিত্ত তিনি বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন—তার বিস্তৃত বিবরণ স্থানান্তরে দেওয়া হয়েছে।

দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ তখনও এ দেশে দেখা দেয় নি। দেশের

প্রাচীন শাস্ত্র ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনাই তখন মুখ্য বিষয় রূপে বিবেচিত। অন্তত সে-আমলের লেখকবৃন্দের রচিত গ্রন্থাবলী দেখে এই কথাই মনে হয়। বিশেষ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উদ্যোগ এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু -প্রমুখ সকল বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিই দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রাচীন শাস্ত্রাদির প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টায় রত।

কিন্তু দেশে নূতন একটি দিকের উদ্‌ঘাটন হল টডের রাজস্থান দ্বারা। ইংরেজিনবিসেরা এতদিন ইংরেজি সাহিত্য পাঠ করে দেশপ্রেম সম্বন্ধে হয়তো সামান্য একটু ধারণা করে নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু মনের মধ্যে সেই ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে বসতে পারে নি। কিন্তু টডের রাজস্থানের বীরত্বকাহিনীগুলি দেশের মানুষের মনে একটি চেতনা জাগ্রত করে তুলল— সে চেতনা হচ্ছে স্বদেশচেতনা।

ইতিমধ্যে এর ভিৎ তৈরি হয়েই ছিল। দেশে ইংরেজ শাসকেরা তাঁদের শাসন ও শোষণ -কার্য যথানিয়মে করে চলেছেন। যে মধ্যবিত্ত সমাজের কথা বলেছি, সেই সমাজের অন্তর্গত চাকুরিজীবীরা এই দাপটে অতিষ্ঠ হচ্ছেন, কিন্তু তার কোনো প্রকাশ নেই; বিদেশী শাসকদের এই অত্যাচার স্বাধীনতা-বোধকে আরও স্পষ্ট করে তুলল। অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথম লেখনী ধারণ করলেন দীনবন্ধু মিত্র, নীলকুঠির ইংরেজ কুঠিয়ালদের অত্যাচারের চিত্র সুস্পষ্ট রূপে চিত্রিত হল তাঁর নীলদর্পণ নাটকে (১৮৬০)। বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতির এই হল আবির্ভাব।

পরাধীনতার গ্লানি তখন যেন নতুন করে সকলে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন। এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও গেয়ে উঠেছেন—

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে

রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান প্রকাশিত হল ১৮৫৮ সালে। এই কাব্যের কাহিনী গৃহীত হল টডের রাজস্থান থেকে। তার পর প্রকাশিত হল তাঁর কর্মদেবী কাব্য ১৮৬২ সালে— এর কাহিনীও রাজপুত-ইতিহাস অবলম্বনে পরিকল্পিত; এবং মাইকেল মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১)— প্রত্যক্ষভাবে না হলেও এর কাহিনী টডের রাজস্থান থেকে নেওয়া। "মধুসূদন নাটকটির বিষয়বস্তু সাক্ষাৎভাবে টডের রাজস্থান হইতে গ্রহণ করেন নাই, ১৭৭৯ শকাব্দের—অর্থাৎ

১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের— পৌষ সংখ্যা বিবিধার্থ- সঙ্গ্রহ পত্রে প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস' প্রবন্ধটি মধুসূদনের সাক্ষাৎ উপজীব্য ছিল বলিয়া মনে হয়।"[১]

টডের রাজস্থান বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮)। তাঁর এই অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১২৮০ থেকে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৭৩-১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে।

সাহিত্যে এইভাবে জেগে উঠল জাতিয়তাবোধ। দেশের অতীত ইতিহাস ও অতীত গৌরবকাহিনী আলোচনা করে দেশপ্রেমের উপলব্ধি সৃষ্টি হতে লাগল দেশের মনুষের মনে। এই বিষয়ে টডের রাজস্থানের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এবং কাব্যে এবং নাটকে সেই গৌরবকাহিনী পরিবেশিত হয়ে দেশের মানুষের মধ্যে স্বদেশচিন্তা উদ্রিক্ত হতে আরম্ভ করল।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটা কথা বলে নিই। দেশের প্রতি দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আরম্ভ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১১-১৮৫৮)। তিনি বিদেশীদের আচারব্যবহারের প্রতি ব্যঙ্গ বর্ষণ করে দেশীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রীতি উৎপাদনে প্রয়াসী হন। তখন বিদেশীয়ানার জোয়ার দেখা দিয়েছে দেশে, যার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন রাজনারায়ণ বসু তাঁর সেকাল আর একাল গ্রন্থে, এবং যার বিষয় আমরা স্থানান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সেই জোয়ারের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর লেখনী চালনা করে দেশের আচার ও আচরণ নামক তরীটি নিরাপদ তটে আনবার কাজে ব্যস্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই পরোক্ষ প্রয়াসের সঙ্গে তৎকালীন অন্যান্য কবি ও লেখকদের প্রত্যক্ষ প্রয়াস যুক্ত হল। দেশের মানুষের মনে জেগে উঠতে আরম্ভ করল দেশাত্মবোধ।

পরবর্তী কথায় আসার আগে আমরা পূর্ববর্তী একটা কথা বলে নেব। সে কথা হচ্ছে বিদেশীর দ্বারা এই দেশে স্বদেশপ্রীতি আনয়নের প্রয়াসের কথা। আমরা ডিরোজিওর কথা বলছি। অন্যত্রও এঁর কথা আমরা একাধিকবার বলেছি, কিন্তু এখানে তাঁর কথা বলছি বর্তমান প্রসঙ্গে। ডিরোজিওর জন্ম এই

দেশের মাটিতেই, কিন্তু তিনি একজন বিদেশী। বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আকর্ষণ ও মমতা ছিল এই দেশের মাটিতেই। ১৮২৭ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত *Poems* নামে তাঁর কবিতাসংকলনে ভারতখণ্ডের উপর অনেক কবিতা আছে। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর প্রীতির নিদর্শনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে একটি কবিতার কয়েক ছত্র উদ্ধার করি—

TO INDIA MY NATIVE LAND

My country ! in thy day of glory past
A beauteous halo circled thy brow,
And worshipped as a deity thou wast.
Where is that glory, where that reverence now

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর অনুবাদ করেন—

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী !
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার ; হায়, সেইদিন যবে
দেবতাসমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।

১৮৩১ সালে মাত্র তেইশ বছর বয়সে ডিরোজিও লোকান্তরিত হন। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের নিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর এক শিষ্যদল। মদ্য-মাংসাদি ভক্ষণ করে তাঁরা দেশের ধর্ম ও সংস্কারকে সেকালে আঘাত করেছিলেন। ডিরোজিও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ভাঙনের নেশা হয়তো লাগিয়েছিলেন, চিরাচরিত রীতির বিরুদ্ধে হয়তো গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর রচিত এই কবিতা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর সেই শিষ্যদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতিও সঞ্চার করেছিলেন। এ দিক থেকেও ডিরোজিওর স্থান সামান্য নয়।

এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের কথাও আমরা বলব। তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি তাঁর মনকে রেখেছিলেন সম্পূর্ণ স্বদেশীই। পরাধীনতার দুঃখ তাঁর কাব্যেও ধ্বনিত হয়েছে, লিখেছেন—

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে,
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?

আমরা— দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে।..

মেঘনাদবধকাব্যের মধ্যেও স্বদেশপ্রীতি নানাভাবে অভিব্যক্ত দেখা যায় মেঘনাদের উক্তিতে, বিভীষণ যখন লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে, তখন পিতৃব্যের এই কার্যে আক্ষেপ করে মেঘনাদ বলেছে—

নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ?..
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।'

দেশপ্রেমের উপলব্ধি দেশের মানুষের মনে সঞ্চারিত হবার পর দ্বিতীয় পালা এল— বিদেশী অত্যাচারীর অত্যাচারের প্রতি বিক্ষোভ। দীনবন্ধুর নীলদর্পণে এই মনোভাব প্রকাশ পেল।

অতঃপর জাতীয়তাবোধের ভাব বিস্তৃতিলাভ করল। সেটি হচ্ছে বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র সীমানার পরিবর্তে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষকে স্বদেশরূপে পরিগণিত করার উদ্যোগ। হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হল (১৮৬৭), ন্যাশনাল নবগোপালের 'ন্যাশনাল' আন্দোলন আরম্ভ হল। এই আন্দোলনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে যোগ দিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচিত স্বদেশী গানের কথা এখানে বলা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ রচনা করেন—

গাও ভারতের জয়

গোবিন্দচন্দ্র রায় সংগীত রচনা করেন:—

কত কাল পরে বল ভারত রে!
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে।

এই ভাবে দেশের সর্বত্র স্বদেশপ্রেম ব্যাপ্ত হয়ে পড়তে আরম্ভ করল। "১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে কেবল যে কলিকাতা সমাজ নানা তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল তাহা নহে। বঙ্গদেশের অপরাপর প্রধান প্রধান স্থানেও আন্দোলন চলিতেছিল।"[১] এরই প্রতিধ্বনি পৌঁছেছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে, পুরুবিক্রমে (১৮৭৪), সরোজিনীতে (১৮৭৫), স্বপ্নময়ী নাটকে (১৮৮২)।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, স্বাধীনতাহীনতার গ্লানি, অখণ্ড-ভারত চিন্তা— এ ত্রিবিধ উপায়ে দেশের মধ্যে স্বদেশচর্চা আরম্ভ হল। তার পর, সেই অধীনতা-নাগপাশ কিভাবে ছিন্ন করা যেতে পারে তার উপায়চিন্তা আরম্ভ হল। সাহিত্যে সেই উপায়টি পরিবেশিত হল উপেন্দ্রনাথ দাসের (১২৫৫-১৩০২ বঙ্গাব্দ) নাটকে; বলপ্রয়োগের দ্বারা শাসককে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা তিনি দাখিল করলেন শরৎসরোজিনী নাটকে (১৮৭৪); একটা বৈপ্লবিক ব্যবস্থা পরিবেশিত হয়েছে বলে উপেন্দ্রনাথ দাস ছদ্মনামে এই নাটক লেখেন, ছদ্মনামটি হল— দুর্গাদাস দাস।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ও নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯) দেশপ্রীতির প্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁদের কাব্যে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হেমচন্দ্রের বীরবাহুকাব্য থেকে এখানে দুটি ছত্র উদ্ধার করি—

এবে সেই দেশমান্যা ভারতবক্ষেতে
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে

এবং নবীনচন্দ্র তাঁর পলাশির যুদ্ধ রচনা করে তাতে রানী ভবানীর জবানীতে বলেছেন—

অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোষিয়া অসি
সাজিয়া সমরসাজে নৃপতিসমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে••

পরিশেষে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখনী ধারণ করে বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করায় ব্যাপৃত হলেন। তাঁর অন্যান্য রচনার বিষয় অন্যত্র আলোচিত হয়েছে, এখানে আমরা প্রাসঙ্গিক একটি রচনার বিষয়ে বলছি। সে রচনা তাঁর আনন্দমঠ, বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনাটি তিনি তাঁর এই গ্রন্থের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নি। এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য বিষয় হল দেশপ্রীতি ও নিষ্কামকর্মের সমন্বয়। শিল্পকর্ম হিসাবে এর মূল্যনির্ণয়ের চেষ্টা আমরা করছি না, কিন্তু দেশপ্রাণতার সঙ্গে কর্মপ্রেরণার উদ্দীপক হিসাবে এই গ্রন্থের মূল্য অনেক। যে বন্দে মাতরম্

সংগীতের দ্বারা দেশে প্রবল আন্দোলন ও আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল, তার উৎস এখানেই। স্বাজাত্যবোধের উন্মেষে ও লোকহিতকর কার্যে আত্ম-নিয়োগের প্রেরণা দানে এ উপন্যাসের ভূমিকা অসামান্য। "বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ-মিশন ও বেলুড়-মঠ প্রতিষ্ঠায় এবং অনুশীলন-সমিতির বিপ্লবপ্রচেষ্টায় আনন্দমঠের প্রেরণা একান্ত পরোক্ষ নয়।"[২] এবং আলোচ্য যুগে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণতি— হিন্দুমেলার পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা— এরই দ্বারা সম্ভব হয়েছে বলে গ্রহণ করা যায়। প্রথম আমলের কংগ্রেসকর্মীরা নিষ্কাম জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন এরই প্রভাবে।

ইতিহাসের এই-যে ধারাবাহিকতা, এবং এই-যে তার ক্রমপরিণতি - এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উনবিংশ শতকের আলোচ্য পর্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি।

একটি শতাব্দীর প্রথমার্ধ গত হল জ্ঞান-চর্চায় ও ধর্মচিন্তায়। সেই শতকেরই শেষার্ধ নূতন রূপে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠতে আরম্ভ করল। দেশ-সম্বন্ধে যারা ছিল উদাসীন, সেই জনসমাজ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীনতা লাভের জন্যে কৃতসংকল্প হয়ে উঠতে লাগল।

দেশের এই-যে জাতীয়-আন্দোলন— যার ফলে পরাধীন ভারতবর্ষ বর্তমানে স্বাধীনতা অর্জন করেছে— তার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দানের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। তাঁর বিবিধ কর্মোদ্যোগের মধ্যে এই আন্দোলনের বীজ নিহিত আছে— তাঁর স্বদেশী স্টীমার চালনার উদ্যোগে, স্বদেশী দিয়াশলাই প্রস্তুতের কাজে, পাট ও নীলের ব্যবসায়ে, হিন্দুমেলায় তাঁর কর্মোদ্যমে, এবং তাঁর রচিত জাতীয়-সংগীতে এবং নাটকাবলীতে।

১ দ্র' শিবনাথ শাস্ত্রী. 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'

২ শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড

৩ আমরা : চতুর্দশপদী কবিতাবলী,' মধুসূদন দত্ত

৪ 'মেঘনাদবধকাব্য', ষষ্ঠ সর্গ

সাহিত্যসাধনা

জ্যোতিরিন্দ্র-প্রতিভা ও জ্যোতিরিন্দ্র-প্রভাবের বিষয় আমরা আলোচনা করেছি।

এবার আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজের হাতে-কলমে-কাজের হিসাব নিতে বসেছি।

নাটকরচনার দ্বারা তাঁর সাহিত্যকর্মের হাতে-খড়ি। এবং নাটকরচনাই তাঁর সাহিত্যসাধনার মুখ্য বিষয় রূপে পরিণত হয়। অবশেষে তিনি বিভিন্ন ফরাসী ও ইংরেজ লেখকের রচনা অনুবাদ করেন, গীতিনাট্য রচনা করেন, সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করেন, মরাঠি গ্রন্থ অনুবাদ করেন, বিভিন্ন বিষয়ে ভারতী বালক ও সাধনা পত্রিকায় প্রবন্ধরচনার দ্বারা তাঁর সাধনার ধারা প্রবাহিত হতে থাকে।

আমরা একে একে এগুলি পর্যালোচনা করব।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম রচনা একাঙ্ক প্রহসন— কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২)। আদিব্রাহ্মসমাজ সনাতন পন্থী ; কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন (১৮৬৬ নবেম্বর) করেন— এই সমাজে তিনি অনেক নূতনত্ব আনয়ন করেন। ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেশবচন্দ্র ভারত-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন— পূর্ণমাত্রায় স্ত্রীস্বাধীনতা দানের জন্য কৃতসংকল্প হন। এই নূতনত্ব সে আমলে কিঞ্চিৎ আতিশয্য বলে অনেকের মনে হয়। স্ত্রীদের স্বাধীনতা দান যেমন এই নূতন সমাজের লক্ষ হয়, তেমনি খ্রীষ্টীয় উপাসনারীতিও গৃহীত হয়। এই ব্যাপারে এই নূতন সমাজের প্রতি কটাক্ষ করবার উদ্দেশ্যেই এই প্রহসন— কিঞ্চিৎ জলযোগ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখনও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী হন নি, এই কারণে প্রহসনে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতিই বিশেষভাবে বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে। এই প্রহসনে উল্লিখিত স্মানজা অর্থাৎ পতিতপাবন সেন যে কেশবচন্দ্র সেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ করা যায় যে, এতে কটাক্ষ আছে কিন্তু ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বিষ নেই।

এতে পাত্রপাত্রীর সংখ্যা কম— বাবু পূর্ণচন্দ্র, তাঁর স্ত্রী বিধুমুখী, একজন বেকার যুবক পেরুরাম, ভৃত্য ভোলা, ও আর-একটি ভৃত্য।

নব্যব্রাহ্ম পূর্ণচন্দ্র স্ত্রীর কাছে ঈশ্বর সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি আর কখনও মদ্য পান করবেন না। কিন্তু তিনি কথা ঠিক রাখতে পারেন নি। এই জন্যে পত্নী তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন, সেই ভর্ৎসনার বাণী শুনে পূর্ণচন্দ্র বললেন—

> হ্যাঁ ডিয়ার, মদ খেলে কি কখনো পাপ হয়, স্যান্‌জার কাছে এতদিন লেকচার শুনে কি শেষে এই বিদ্যে হল ?

এ উক্তিটি কা'র প্রতি শ্লেষ সহজেই বোঝা যায়। এবং পূর্ণচন্দ্র যখন আরও বললেন—

> বললে, সাঁইজির গির্জেয় যাব, ভালো, তাই যাও। বললে, রবসেনের ওখানে চা খাব, ভালো, তাই খাও। বললে, মেয়েমানুষের স্বাধীনতা আছে, আমি যেখানে খুশী উড়ব— ভালো, তাই ওড় গিয়ে! আমি কোন্ কথাটা শুনিনি বল দেখি ডিয়ার।

ইত্যাদি উক্তিতে স্ত্রীস্বাধীনতাকে বিদ্রূপ ও খ্রীষ্টীয় উপাসনারীতির প্রতি ব্যঙ্গ আছে।

এই ভাবে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বিধুমুখীর কক্ষে গভীর রাত্রে বেকার যুবক পেরুরামের উপস্থিতি এবং পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে তার তরবারি-যুদ্ধের ব্যাপারটিতে অসংগতি আছে বটে, কিন্তু এর দ্বারা প্রহসনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, তৎসহ নাটকীয়তাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই প্রহসনটি প্রকাশ-কালে রচয়িতার নাম মুদ্রিত হয় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, এই কারণেই সৌজন্যবশতই তিনি নব্যপন্থী সমাজের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ নাটকে নিজের নাম মুদ্রিত করেন না।

এই প্রহসনটি কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটরে প্রথম অভিনীত হয়— ২৬ এপ্রিল ১৮৭৩।

বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রহসনের সমালোচনাপ্রসঙ্গে যা বলেন, তার কিঞ্চিৎ উদ্‌ধৃত করা যায়। তিনি বলেন, "একেই কি বলে সভ্যতা'র জন্মাবধি প্রহসনের কিছু ছড়াছড়ি হইয়াছে। সেই সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি যে, হাস্যরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। দুইখানি প্রহসন এই পরিভাষা হইতে বিশেষরূপে বর্জিত— একেই কি বলে সভ্যতা

এবং সধবার একাদশী। সধবার একাদশী অশ্লীলতাদোষে দূষিত হইলেও, অন্যান্য গুণে ভারতবাসীর ভাষায় এরূপ প্রহসন দুর্লভ। কিঞ্চিৎ জলযোগ ঐ দুই প্রহসনের তুল্য নহে বটে, কিন্তু ইহাকেও বর্জিত করিতে পারি। এ প্রহসনের একটি গুণ এই যে তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই।.. যদি কোনো শ্রেণীবিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে তথাপি নিন্দনীয় নহে, কেন না ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দেখিলাম না।"[১]

প্রহসনটি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় প্রত্যহই ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর কিছু-না-কিছু আক্রমণ থাকত। তাঁদের কাছে এটি অশ্লীল বলে বিবেচিত হয়েছিল। গ্রন্থে তাঁর নাম ছিল না বটে কিন্তু তবুও রচয়িতা যে কে তা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, এ কথার উল্লেখ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথই। এবং বলেছেন, "মেজদা বিলাত হইতে ফিরিয়া আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন তখন আমারও মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তখন হইতে আর আমি অবরোধ-প্রথার (বিরোধী ?) পক্ষপাতী নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম। ইহারই কিছুদিন পূর্বে স্ত্রীস্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করিয়া আমি কিঞ্চিৎ জলযোগ লিখিয়াছিলাম বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম।"[১]

কিঞ্চিৎ জলযোগের দ্বিতীয় সংস্করণ সেই জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর প্রকাশ করেন নি।

কিঞ্চিৎ জলযোগ প্রকাশিত হওয়ার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর জমিদারি-পরিদর্শনের ভার পড়ে। এই কাজের ভার প্রাপ্ত হয়ে তিনি কটকে যান, সঙ্গে ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ। সেই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লেখেন তাঁর প্রথম নাটক পুরুবিক্রম (১৮৭৪)। এই নাটক রচনার মূল প্রেরণা স্বদেশপ্রীতি বা দেশানুরাগ। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে হিন্দুমেলার প্রভাব অসাধারণ। দেশের কল্যাণচিন্তার দীক্ষা তিনি লাভ করেছেন হিন্দুমেলার মধ্যে দিয়েই। তাই হিন্দুমেলার পর থেকে কেবলই তাঁর মনে হত "কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হতে পারে।"[২] শেষে তাই স্থির করলেন "নাটকে ঐতিহাসিক

বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে।"[১] এই অনুপ্রেরণার বশবর্তী হয়েই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচনা করেন তাঁর এই প্রথম নাটক পঞ্চাঙ্ক পুরুবিক্রম। প্রথম সংস্করণে রচয়িতার নাম মুদ্রিত হয় না। এবারও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজের নাম গোপন রাখেন।

নাটকটির প্রধান পাত্রপাত্রী হলেন— গ্রীসদেশীর সম্রাট সেকেন্দের শা, পাঞ্জাবদেশীয় দুই নরপতি পুরুরাজ ও তক্ষশীল, সেকেন্দর শার সেনাপতি এফেস্টিয়ন, কুল্লুপর্বতের রানী ঐলবিলা, ও তক্ষশীলের ভগিনী অম্বালিকা।

মহাবীর সেকেন্দর শা সিন্ধুনদ পার হয়ে ভারত-বিজয়ে অগ্রসর। বিতস্তা নদীতীরে তিনি শিবির স্থাপন করেছেন। রানী ঐলবিলা অবিবাহিতা ও রূপগুণবতী, স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য তিনি কৃতসংকল্প। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, যবনদের সঙ্গে স্বদেশরক্ষার যুদ্ধে যে কোনো ক্ষত্রিয় রাজা সর্বাপেক্ষা বীরত্ব দেখাতে পারবেন ঐলবিলা তাঁকে বিবাহ করবেন। ঐলবিলা পুরুকে ভালোবাসেন, এবং পুরুর শৌর্যেবীর্যে মুগ্ধ হয়ে মনে-মনে তিনি পুরুরাজের হাতেই নিজেকে সমর্পণ করেছেন, এবং ঐলবিলার বিশ্বাস পুরুরাজ নিজ বীরত্বের দ্বারা ঐলবিলার শপথের মর্যাদা দান করবেন। পুরুরাজও এদিকে ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। ওদিকে তক্ষশীলও মনে-মনে ঐলবিলার পাণিপ্রার্থী। কিন্তু তক্ষশীল কাপুরুষ, স্বীয় ভগিনী অম্বালিকাকে সেকেন্দর শার হস্তে অর্পণ করে নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করতে ইচ্ছুক। অম্বালিকাও ভ্রাতার এই অভিসন্ধির বিরোধী নন; কেননা ইতিপূর্বে অম্বালিকাকে সেকেন্দর শা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, অম্বালিকা সেই অবধি সেকেন্দরের প্রতি আসক্ত। সুতরাং ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়ে এইরূপ ব্যবস্থা করলেন যে, দুজন দুজনকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। ঐলবিলার প্রতি তক্ষশীল অনুরক্ত হলেও ঐলবিলা কাপুরুষ তক্ষশীলকে ঘৃণা করেন। তিনি পুরুর অনুরাগিণী। লজ্জাহীন না হলে কি কোনো হিন্দু মহিলা যবনের প্রেম আকাঙ্ক্ষা করে— এইরূপ উক্তি করে ফেলে ঐলবিলা অম্বালিকার মনে আঘাত করেন। ক্রুদ্ধা অম্বালিকা ঐলবিলার সর্বনাশ করার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। পুরু ও ঐলবিলার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির জন্যে ভ্রাতা ও ভগিনী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

হলেন। ঐলবিলা যেন তক্ষশীলের নিকট প্রেম নিবেদন করে পত্র দিচ্ছেন এইরূপ একটি জালচিঠি তৈরি করে অম্বালিকা দূত মারফত পুরুর কাছে পৌঁছে দিলেন। পুরুর মন ভাঙল। এদিকে রাত্রির অন্ধকারে সেকেন্দর শা বিতস্তা নদী পার হয়ে এসেছেন। পুরুর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধল। অন্যায় আক্রমণের দ্বারা একজন যবন সৈনিক পুরুরাজকে আহত করল। পুরুরাজ বন্দী হলেন। ষড়যন্ত্রের দ্বারাই এ কাজ সাধিত হল। পুরু ঐলবিলার প্রণয়ে সন্দিগ্ধ হলেন এবং সহসা তক্ষশীলকে বধ করলেন। পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে সেকেন্দর শা তাঁকে মুক্তি দিলেন এবং অম্বালিকাকে গ্রহণ করলেন না। অম্বালিকা নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুরু ও ঐলবিলার সন্দেহ দূর করে তাঁদের মিলন ঘটিয়ে দিলেন।

এই নাটকটি ১৮৭৪ সালের ২২ অগস্ট তারিখে বেঙ্গল থিয়েটরে এবং ৩ অক্টোবর তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটরে অভিনীত হয়েছিল।

নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটরের পক্ষ থেকে অমৃতলাল বসু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন অভিনেতা নাটকটি অভিনয় করবার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুমতি নিতে এসেছিলেন বলে তাঁর জীবনস্মৃতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, "তখন তরুণ অমৃতলাল সামান্য একজন অভিনেতা মাত্র, কিন্তু তখনই তাঁহার উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে আমি এক অপূর্ব প্রতিভার আলোক দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

অমৃতলালের প্রতিভা ছিল বলেই এই নাটক বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল! কেননা, এ-নাটকে নাটকীয়তা পরিপূর্ণ পরিমাণে বিদ্যমান। দেশের লোকের মনে স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত করার উদ্দেশ্য নিয়েই নাটকটি রচনা। ঐলবিলার ও পুরুরাজের স্বদেশপ্রেম উভয়ের মধ্যের ব্যক্তিগত প্রেমের চেয়ে এখানে বড় হয়ে উঠেছে। নাটকে প্রেমপ্রীতি ও প্রেমপ্রণয়ের সংঘাত আবশ্যক; তা এখানে আছে। কিন্তু নরনারীর প্রেমকেই মুখ্য করা হয় নি, সে প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নি; অথচ সেই প্রেমের দ্বন্দ্ব ও জটিলতা দিয়ে নাটকের কাহিনী রমণীয় করা হয়েছে। কিন্তু নাটকটিকে এ-সত্ত্বেও প্রেমপ্রণয়ের বা বিরহমিলনের ঘাতপ্রতিঘাতের উপর নির্ভরশীল রাখা হয় নি।

এর কেন্দ্রীয় কথা দেশপ্রেম। যারা দেশদ্রোহী ও দেশের অকল্যাণ যাদের কাছে তুচ্ছ, আত্মকল্যাণই যাদের কাছে জীবনের পরম কাম্য তার পরিণাম এখানে দেখানো হয়েছে মর্মান্তিক ভাবে। তক্ষশীল নিহত হয়েছেন, অম্বালিকা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে ভ্রাতা ও ভগিনীর চক্রান্ত, অবশেষে জয় হয়েছে তাদেরই— পুরু ও ঐলবিলার মিলন ঘটেছে। এঁরা স্বদেশপ্রেমী, স্বদেশকে রক্ষা করার জন্যে এঁদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত। এ-নাটকে ঐলিবিলার চেয়ে অম্বালিকা প্রাধান্য পেয়েছে ; অম্বালিকার হীনতা ও দেশদ্রোহিতা এবং জঘন্য চক্রান্ত ও তার পরিণাম সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করবার জন্যই নাট্যকার এই চরিত্রকে একটু স্পষ্ট ভাবে চিত্রিত করেছেন। অম্বালিকার অবলম্বন ছিল মাত্র দুটি— একজন তক্ষশীল, অপরজন সেকেন্দার। তক্ষশীলের মৃত্যু ঘটল, সেকেন্দার তাকে পরিত্যাগ করলেন। অম্বালিকা-চরিত্রের পর তক্ষশীল ও সেকেন্দার আসর অনেকটা জমিয়ে রেখেছেন। এর একজন দেশদ্রোহী, অপরজন পররাজ্যলোভী। এঁদের দুজনের কেউই পাঠক বা দর্শকের কাছ থেকে তাঁদের কর্মকুশলতা বা বাক্‌পটুতার জন্যে সমর্থন পাবেন না, তবুও এঁদের পাদপ্রদীপের সম্মুখে এনে এঁদের প্রকৃত চেহারা সুস্পষ্টভাবে সকলকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই নাটকের অনেকটা অংশ এঁদের দিয়ে জুড়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাঁরা এই নাটকের নায়ক ও নায়িকা— সেই পুরু ও অম্বালিকা—ততটা স্থান পান ন। দেশকে ভালো বাসলে তার পরিণাম কল্যাণকর হয়— এইটুকু মাত্র তাঁদের দিয়ে দেখিয়েই নাট্যকার ক্ষান্ত হয়েছেন। আমাদের ধারণা, এতে নাটক-রচনার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। দেশকে ভালোবাসা ভালো কাজ—এটা চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে, দেশের অকল্যাণ কামনা করলে জীবনে কি ঘটে, তক্ষশীলের ও অম্বালিকার জীবনের সেই ট্র্যাজিডিই নাট্যকার সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। এদিকে নাট্যকারের কৃতিত্ব ও মাত্রাজ্ঞান স্বীকার করতে হয়।

সে আমলের সমাজের প্রতিবিম্ব এই নাটকে দেখা যায়। সে আমলে বিদেশের অনুকরণ ও বিদেশপ্রীতির আধিক্য প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই হাওয়া বদলের জন্যেই, দেশের মধ্যে স্বদেশানুরাগ প্রচার করার জন্যেই,

হিন্দুমেলার উৎপত্তি। যাঁরা বিদেশপ্রেমে মুগ্ধ ছিলেন তাঁদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে এই নাটকের উৎপত্তি বলা চলে।

যাই হোক, নাটকটি নাট্যরসে ভরা। আঘাত-প্রতিঘাত প্রেমপ্রীতি দেশদ্রোহিতা দেশানুরাগ চক্রান্ত— সবই এখানে বিদ্যমান।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "এরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জিতরুচি মহাশয়গণ নাটক-প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গালা নাটকের বর্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্যতা থাকিবে না।"[৩]

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং নাট্যানুষ্ঠান দেখে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। আমরা এখন সে আমল থেকে অনেকটা তফাতে আছি, এখন নাটকের বিষয়বস্তু বেড়েছে, আঙ্গিকে নূতনত্ব এসেছে, ভাষায় পরিবর্তন এসেছে, সুতরাং আমাদের একালের চোখ দিয়ে এই নাটকটি একটু বেশি আড়ম্বরপূর্ণ মনে হতে পারে; কিন্তু সময়ের বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়ে সেই আমলে গিয়ে আমরা যদি পৌছতে পারি, এবং আয়ত্ত করতে পারি সেকালের মন ও মেজাজ, তা হলে অবশ্যই বুঝব নাটকটি সেকালের লোকের চোখে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল কেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেছেন, "গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়।"—এ উক্তি অসংগত নয়। একটা ম্রিয়মাণ জাতিকে উত্তেজিত ও উদ্বেলিত করে তুলতে হলে তার চোখের সম্মুখে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখানোই উচিত। দেশের লোকের মধ্যে সৎসাহস ও বীরত্বপ্রচার করার জন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দুক-ছোঁড়া ও শিকারের প্রবর্তন করার উদ্যোগী ছিলেন বলে আমরা জানি, তাঁর জীবনস্মৃতিতেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ-কথার উল্লেখ করেছেন, রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনস্মৃতিতে এবিষয়ে উল্লেখ করেছেন। এমন মানুষ কালি-কলম নিয়ে যখন দেশপ্রীতি ও দেশদ্রোহিতার চিত্র অঙ্কন করতে বসলেন তখন তাতে বারুদের গন্ধ অবশ্যম্ভাবী রূপেই এসে যাবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মঞ্চাভিনয়ের সময়ে ঐ গন্ধ একটু তীব্রভাবে নাকে এসে লাগতে পারে বটে, কিন্তু তীব্রভাবে না ফোটালে মৃতকল্প দেহে বুঝি সাড়া জাগে না।

এই নাটকে সত্যেন্দ্রনাথ-রচিত এই গানটি আছে—

মিলে সব ভারতসন্তান একতান মন প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান—

সে কালে এই দীর্ঘ গানটি এবং নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৯) সংযোজিত রবীন্দ্রনাথ-রচিত—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন

গান বিশেষ চলিত ছিল।

সৈন্যদের প্রতি পুরুরাজের উদ্দীপনাময়ী বাণীর কথাও স্মরণীয়। সেকালে সকলের এ-বাণী কণ্ঠস্থ হয়েছিল—

এত স্পর্ধা যবনের স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ ?

তারা কি করেছে মনে সমস্ত ভারতভূমে
পুরুষ নাহিক একজন ?

নাটকটির আবেদন সর্বভারতীয়। এবং এর খ্যাতিও সে সময়ে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। নাটকটি সে সময়ে গুজরাতি ভাষাতেও অনূদিত হয়। ইউরোপের বিখ্যাত সমালোচক ও সংস্কৃতজ্ঞ সিলভাঁ লেভি গুজরাতি সাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে পুরুবিক্রমের খুব প্রশংসা করেন, তিনি তখন জানতেন না যে এটি বাংলা থেকে অনুবাদ এবং এর রচয়িতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।[২]

যে অনুপ্রেরণায় পুরুবিক্রম নাটক রচিত, সেই অনুপ্রেরণাতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নাটক ষষ্ঠাঙ্ক সরোজিনী (১৮৭৫) রচিত। কিন্তু পার্থক্য এই— পুরুবিক্রম বীররসপ্রধান, সরোজিনীতে প্রাধান্য করুণরসের। সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার দরুণই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখানে নাটকের রস পরিবর্তিত করেন। নাটকটি 'উদাসিনী-প্রণেতা সুহৃদ্বরের হস্তে' অর্থাৎ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে অর্পিত হয়।

নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রী হলেন— মেওয়ারের রাজা রাণা লক্ষ্মণসিংহ, লক্ষ্মণসিংহের ভাবী জামাতা বাদলাধিপতি বিজয়সিংহ, লক্ষ্মণসিংহের সেনাপতি

রণধীরসিংহ, ভৈরবাচার্য নামধারী ছদ্মবেশী মুসলমান মহম্মদ আলি, ও লক্ষ্মণসিংহের কন্যা সরোজিনী।

নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সরোজিনী, এইজন্যই এই নামেই নাটকটির নামকরণ করা হয়েছে। নাটকটির বিষয়বস্তু হচ্ছে আলাউদ্দিনের দ্বিতীয় বার চিতোর-আক্রমণ। রাজপুত-সর্দারের সংহতির জন্যই আলাউদ্দিনের প্রথম বারের চিতোর-আক্রমণ ব্যর্থ নয়। এইজন্য এইবার সেই সংহতি বিনষ্ট করার দিকেই আলাউদ্দিনের প্রধান লক্ষ ও কর্মতৎপরতা। মেওয়ারের রাজা রাণা লক্ষ্মণসিংহের ভরসা তাঁর দুইটি স্তম্ভ— বিজয়সিংহ ও রণধীর-সিংহ। সরোজিনীকে কেন্দ্র করে যাতে এই দুই প্রধান সর্দারের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি ক'রে তাঁদের সংহতিতে ভাঙন ধরানো যায়, আলাউদ্দিন সেই কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি মহম্মদ আলি নামে তাঁর এক অনুচরকে ব্রাহ্মণ যুবকের ছদ্মবেশে মেওয়ারে প্রেরণ করেন। মহম্মদ আলি ভৈরাবাচার্য ছদ্মনাম গ্রহণ করে মেওয়ারের কুলদেবী চতুর্ভুজার পুরোহিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং অবশেষে পৌরোহিত্যের ভার পায়। ভৈরবাচার্য এক অমাবস্যার রাত্রে দেবী-মন্দিরের কাছে শ্মশানে লক্ষ্মণসিংহকে দৈববাণী শোনায়। সে বাণী হচ্ছে— দেবী ক্ষুধিতা, রাজকুমারীকে বলি রূপে পেতে চান। রাজা বিপদে পড়লেন, দ্বিধাগ্রস্ত হলেন— একদিকে কন্যাস্নেহ, অপরদিকে রাজকর্তব্য ও দেশপ্রীতি। সকল বৃত্তান্ত শুনে রণধীর রাজকর্তব্য-পালনেই রাজাকে উৎসাহ দিলেন। এ ঘটনা ঘটছে দেবগ্রামে। দেবগ্রাম থেকে চিতোরে বার্তা গেল— রাজ-কুমারীর বিবাহ, তাঁকে অবিলম্বে দেবগ্রামে পাঠাতে হবে। রাজার অনুচর রামদাস কিন্তু এদিকে রাজাকে পিতৃকর্তব্য পালনে উত্তেজিত করলেন। রাজা তদনুযায়ী সরোজিনীকে নিয়ে চিতোর থেকে যাত্রা না করার জন্যে রাজমহিষীকে বার্তা পাঠালেন। কিন্তু সে বার্তা পৌঁছনোর আগেই সরোজিনী যাত্রা করেছেন। রণধীর এদিকে রাণাকে রাজকর্তব্য পালনে প্ররোচিত করেছেন। রাজা সুতরাং গোপনে সরোজিনীকে বলি দেওয়ার জন্য সম্মত। ইতিমধ্যে রাণার দ্বিতীয় পত্র রানীর হস্তগত হয়েছে। তা হলে বিবাহ ভেঙে গিয়েছে, বিজয়সিংহ বিবাহে সম্মত নয়— এইরূপ চিন্তা করে সরোজিনীকে নিয়ে চিতোর অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে বিজয়সিংহের সঙ্গে দেখা। বিবাহকার্য

অনুষ্ঠিত হবে স্থির হল, তারা দেবগ্রামে ফিরে এলেন। রানী জানলেন বিবাহ হবে, কিন্তু বিবাহ-বাসরে তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না। ও দিকে গোপনে বলির আয়োজন চলেছে। রামদাসের কাছ থেকে বিজয়সিংহ সব কথা জানতে পারলেন। বিজয়সিংহ এই সংবাদ জেনে ক্রুদ্ধ। এদিকে রাজা কন্যাস্নেহের বশবর্তী হয়ে রাজমহিষী ও সরোজিনীকে পলায়নের সুযোগ করে দিলেন। এই সঙ্গে আর-একটি ঘটনাও ঘটে গিয়েছে— বিজয়সিংহ রোষেনারা নামে এক মুসলমান যুবতী ও তার সখীকে বন্দী করে দেবগ্রামে রেখেছেন। রোষেনারা বিজয়সিংহের প্রতি প্রণয়াসক্ত, সুতরাং সরোজিনীর প্রতি তার বিদ্বেষ। সরোজিনীর পলায়ন-বার্তা রণধীরসিংহকে সে জানিয়ে দিল। সরোজিনী ধরা পড়ে গেল, এবং বলির জন্যে আনীত হল। ভৈরবাচার্য সরোজিনীকে বলি দেওয়ার জন্য যখন খড়্গ উত্তোলন করেছে, এমন সময় বিজয়সিংহ এসে বাধা দিলেন। প্রাণভয়ে ভৈরবাচার্য বললেন, দৈববাণীর উদ্দিষ্ট নারী সরোজিনী নন, রাজ্যের যে কোনো সুন্দরী নারী। অবিলম্বে বলির জন্য আনিত হল রোষেনাবা। ভৈরবাচার্য তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলেন। তখনি জানা গেল, এই রোষেনারা ভৈরবাচার্যেরই নিরুদিষ্টা কন্যা। এদিকে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেছেন, প্রাণপণ যুদ্ধেও চিতোর রক্ষা করা গেল না। লক্ষ্মণসিংহের দ্বাদশ পুত্র ও বিজয়সিংহ যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। সরোজিনী-সহ রাজপুতানীরা জলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন দিলেন, তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরান সঁপিবে বিধবা বালা।..

১৮৭৬ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে সরোজিনীর প্রথম অভিনয় হয়। নাটকটি প্রভূত জনপ্রিয়তা যে অর্জন করে তা বুঝতে পারা যায় এর থেকেই যে, যাত্রার দলেও বহুবার এই নাটক অভিনীত হয়েছে। এই নাটক প্রকাশিত হওয়ার পর নাট্যকার রূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খ্যাতি বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই নাটক জনচিত্তে কিরূপ সাড়া জাগায় তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় এই একটি ব্যাপারের দ্বারাও। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায় যে, কলকাতা আর্ট স্কুলের তদানীন্তন শিক্ষক

অন্নদাপ্রসাদ বাগচী সরোজিনীর শেষ দৃশ্যের— অর্থাৎ চিতারোহণ-দৃশ্যের —একটি চিত্র অঙ্কিত করেন। এই ছবিটি পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্রের সঙ্গে বাজারে বহুদিন ধরে বিক্রি হয়েছিল।

এই নাটকের আখ্যানে প্রাচীন গ্রীক-নাট্যকার ইউরিপিদেসের 'ইফিগে-নেইয়া হে এন্ আউলিদি' নাটকের ছায়া আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূল গ্রীক সম্ভবত পড়েন নি, রেনাঁর ফরাসি অনুবাদ পাঠ করেছিলেন মনে হয়। এ ছাড়া লক্ষ্মণসিংহ ও সরোজিনী-চরিত্র দুটিতে মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের উদয়পুররাজ ভীমসিংহ ও তস্য দুহিতা কৃষ্ণকুমারীর প্রভাব আছে বলে মনে হয়।'

কিন্তু ছায়া ও প্রভাবের কথা বড় নয়, বড় কথা নাটকের ঘটনাসংস্থান ও ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টি। এদিক থেকে যথেষ্ট কৃতিত্ব যে নাট্যকার দেখাতে পেরেছেন তা স্বীকার করতে হবে। পিতার মনের দ্বন্দ্ব নিপুণভাবে ব্যক্ত হয়েছে। একদিকে দেশ, অন্য দিকে দুহিতা; রাজার কাছে দেশ, পিতার কাছে কন্যা। কিন্তু পিতা ও রাজা একজনই; অথচ দেশ ও কন্যা পৃথক দুটি সত্তা। এই দুই দিক রক্ষা করার জন্য চিত্তের বিচলিত অবস্থার বিন্যাস সুন্দর হয়েছে। রাজদুহিতা সরোজিনীকে বলি দিবার জন্যে যে অলীক দৈববাণীর সৃষ্টি করেছিল সেই ছদ্মবেশধারীর হস্তেই স্বীয় কন্যার নিধন নাট্যরসকে গাঢ় করেছে। এবং যে রোষেনারা অসূয়া-বশে নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীর অনিষ্ট করার জন্যে উদ্যত হয়েছিল সেও যথোচিত সাজা পেল। এই চরিত্রটি পুরুবিক্রম নাটকের অম্বালিকা চরিত্রের অনুরূপ। কিন্তু পার্থক্য এই যে, অম্বালিকা জীবিত অবস্থায় দুরূহ শোক ভোগ করল, কিন্তু রোষেনারা মৃত্যুর দ্বারা বীতশোক হয়ে গেল। আমরা জানি, এই নাটকের

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ

গানটি রবীন্দ্রনাথের রচিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৃতীয় মৌলিক নাটক হচ্ছে অশ্রুমতী নাটক (১৮৭৯)। রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গিত। পূর্বোক্ত দুইটি নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, পুরুবিক্রমে দেশপ্রেম প্রধান, সরোজিনীতে দেশপ্রেমের সঙ্গে বাৎসল্যের দ্বন্দ্ব, আর অশ্রুমতীতে দেশপ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমের সঙ্গে

পিতৃভক্তির সংঘর্ষ, সেই সঙ্গে আরও একটু জটিলতা— মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুনারীর প্রণয়। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে—

গহনকুঞ্জ-কুসুম-মাঝে।

এ নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রী হচ্ছে— মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ, আকবরের পুত্র সুলতান সেলিম, অম্বরের রাজা ও আকবরের সেনাপতি মানসিংহ, প্রতাপসিংহের ভ্রাতা শক্তসিংহ, বিকানীরের রাজকুমার পৃথ্বীরাজ, ও প্রতাপসিংহের দুহিতা অশ্রুমতী।

রবীন্দ্র-মানস-গঠনে অধ্যায়ে এ নাটকের আখ্যান-বিষয়ের আলোচনা আমরা করেছি।

নাটকটিতে প্রাধান্য লাভ করেছে সেলিম ও অশ্রুমতী, কেননা নাটক তাদের নিয়েই। এ'কে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না, পাত্রপাত্রীর নাম ইতিহাস থেকে গৃহীত বটে, কিন্তু নাট্যোল্লিখিত ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ কম। অশ্রুমতী নামটিই কাল্পনিক, ঐ নামে প্রতাপসিংহের কোনো কন্যা ছিল না।

নাটকটি অনেকবার বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম ও সরোজিনী নাটকের মত অশ্রুমতীও হিন্দি ও মরাঠি ভাষায় অনূদিত হয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়। গুজরাট মারাঠা ও রাজপুতনায় অভিনয়-কালে দর্শকদের চোখে পড়ে যে, মহারাণা প্রতাপসিংহের কন্যাকে সেলিমের অনুরাগিণী করা হয়েছে। এতে অনেকে ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হন এবং নাট্যকারের উপর অপ্রসন্ন হন। এমনকি, এরূপ জানা যায় যে, এ ব্যাপারে অনেকে বাঙালী জাতির উপরই অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন, কেননা গ্রন্থকার বাঙালী। এ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে নানা অভিযোগপূর্ণ চিঠিপত্র আসে। এবং নাটকটির প্রচার বন্ধ করারও দাবি করা হয়।

প্রতাপের দুহিতাকে সেলিমের প্রণয়াসক্ত করায় অনেকে প্রতাপের প্রতি গ্রন্থকারের অবজ্ঞা বলে অনুমান করেছেন, তাঁরা দেখেন নি যে অশ্রুমতী চরিত্রটিই কাল্পনিক, এবং তাঁরা এও দেখেন নি যে, অশ্রুমতী নাটকের সূচনা-পত্রে টডের রাজস্থান থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

There is not a pass in the alpine Aravalli that is not sanctified by some' deed of Pratap— some brilliant victory, or oftener, more glorious defeat. Haldighat is the Thermopylae of Mewar ; the field of Deweir her Marathon.

এর দ্বারাই প্রতাপের প্রতি গ্রন্থকারের মনোভাব সুস্পষ্ট রূপে অভিব্যক্ত।

যাই হোক, এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য— পরিশিষ্ট ১ : অশ্রুমতী-প্রসঙ্গ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চতুর্থ ও শেষ মৌলিক নাটক হল পঞ্চাঙ্ক স্বপ্নময়ী নাটক (১৮৮২)। নাটকটি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে উৎসর্গ করা হয়।

নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রী হচ্ছে— বর্ধমানের ভূপতি কৃষ্ণরাম রায়, চিতোয়া ও বর্দার তালুকদার শুভসিংহ ও কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎ রায়, কৃষ্ণরামের দুহিতা স্বপ্নময়ী, আফগান সর্দার রহিম খাঁ, রহিম খাঁর স্ত্রী জেহেনা ও জগৎ রায়ের স্ত্রী সুমতি।

আওরংজেবের রাজত্বকাল এই নাটকের পরিপ্রেক্ষিত। ঐতিহাসিক ভিত্তি শোভাসিংহের বিদ্রোহ। শোভাসিংহকে এই নাটকে শুভসিংহ করা হয়েছে।

মূল ঐতিহাসিক কাহিনী হচ্ছে সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে মোগল-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে শোভাসিংহ ও রহিম খাঁ বর্ধমান-রাজ কৃষ্ণরাম রায়কে হত্যা করেন এবং কৃষ্ণরামের কন্যা সত্যবতীকে বন্দী করেন; বন্দিনী সত্যবতীকে অবমাননা করতে গিয়ে কারাগৃহে সত্যবতী কর্তৃক ছুরিকাহত হয়ে শোভাসিংহ নিহত হন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই মূল কাহিনী পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। শোভা-সিংহ যে মোগল-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন সেই স্বদেশপ্রাণতাকে মর্যাদা দিয়ে শোভাসিংহকে তিনি নূতন রূপে চিত্রিত করেছেন।

স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বদ্ধপরিকর নাটকের নায়ক শুভসিংহ। সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বালার উদ্দেশে শুভাসিংহ মহাপুরুষ সেজে বর্ধমানে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা কৃষ্ণরাম শাস্ত্রচর্চাতেই বিভোর, রাজ্যশাসনে

উদাসীন। পুত্র ও কন্যাও এ বিষয়ে প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। পিতার এই ঔদাসীন্যে মাতৃহীনা স্বপ্নময়ী প্রাসাদের বাইরে খুশিমত ঘুরে বেড়ায়। শুভসিংহের অভিপ্রায় এই যে, এই কন্যাকে বশ করে রাজকোষের সন্ধান জেনে নিয়ে তা লুঠ করা, এবং সেই অর্থে আওরংজেবের বিরুদ্ধে সৈন্যদল গঠন করা। ছদ্মবেশী শুভসিংহকে দেখে স্বপ্নময়ী তাঁকে মহামানব মনে করল। শুভসিংহও স্বপ্নময়ীর রূপে আকৃষ্ট হলেন। কিন্তু এমন সরলা ললনাকে প্রবঞ্চনা করতে শুভসিংহের বিবেকে বাধল। কিন্তু যে সুরজমলের প্ররোচনায় নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে শুভসিংহ মহাপুরুষ সেজেছেন, সেই সুরজমলের প্ররোচনায় তিনি মন স্থির করলেন। এ দিকে রহিম খাঁ হাত করেছেন রাজকুমার জগৎ রায়কে। জগৎ রায়কে মদ্যপানে আসক্ত করেছেন এবং নিজ স্ত্রী জেহেনাকে দিয়ে তাঁকে ভুলাবার চেষ্টায় আছেন। জগৎ রায়ের স্ত্রীর সখীরূপে জেহেনা রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করে সাময়িক বিভ্রাট বাধাল। তার পর স্বপ্নময়ীর জন্য বর্ষীয়ান্ একজন দার্শনিক পাত্র স্থির হল। সেই রাত্রে শুভ সিংহ ও সুরজমল রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করবেন স্থির করেছেন। কিন্তু বিবাহলগ্নে দেখা গেল বিদ্রোহী বাহিনীর পুরোভাগে স্বপ্নময়ী। শুভসিংহকে দেখে রাজা চিনতে পারলেন, এবং স্বপ্নময়ীও রাজা কর্তৃক তিরস্কৃত হল। স্বপ্নময়ী জানতে পারল যে, শুভসিংহ মহামানব বা দেবতা নন— তখন সে অনুতপ্ত ও নিরাশ্বাস হল। শুভসিংহের সঙ্গে জগৎ রায়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধল। এদিকে সুরজমল রাজপ্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে শুভসিংহ রাজাকে রক্ষা করতে গেলেন, কিন্তু প্রাসাদের অংশ ভেঙে পড়ায় রাজার মৃত্যু হল। স্বপ্নময়ীর তবুও ধারণা, শুভসিংহ বুঝি দেবতাই, তাই পিতার জীবন ফিরে দেবার জন্যে কাতর প্রার্থনা করতে লাগল। কিন্তু যখন সত্যই বুঝল যে শুভসিংহ সত্যই একজন সামান্য মানুষ, তখন তার সব অবলম্বন ধূলায় লুণ্ঠিত। স্বপ্নময়ীর এই অবস্থার জন্য শুভসিংহই দায়ী এই কথা বিবেচনা করে শুভসিংহ স্বপ্নময়ীর সম্মুখে আত্মহত্যা করলেন। স্বপ্নময়ীর সব বোধ লুপ্ত হল। স্বপ্নময়ী পাগল হয়ে গেল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্য তিনটি নাটক থেকে এ নাটকের মেজাজ একটু পৃথক। সুরেও একটু পার্থক্য আছে। এতে যেমন গান আছে অনেকগুলি

তেমনি সংলাপও অনেক ক্ষেত্রে পদ্য ছন্দে আছে। সম্ভবতঃ এর বছর দুই আগে (১৮৮০) রচিত তাঁর মানময়ী গীতি-নাটিকার প্রভাব এতে পড়েছে বলেই এতে এই সুরবদল ঘটেছে। কিন্তু প্লটের দিক থেকে পূর্ববর্তী সরোজিনী ও অশ্রুমতী নাটকদ্বয়ের সঙ্গে এর মিল লক্ষ করা যায়। তিনটি নাটকেরই মূল বিষয় পিতা-পুত্রীর আনুগত্য। সরোজিনী নাটকে সরোজিনী পিতার সম্পূর্ণ অনুগত, অশ্রুমতী নাটকে কন্যা অশ্রুমতী পিতার অপ্রিয় কাজ করে ফেলেছে, এবং এই নাটকে কন্যা স্বপ্নময়ী নিজের খেয়ালের বশবর্তী হয়ে অজানিতেই পিতার বিরোধিতা করেছে।

নাট্যগুণ ও রচনারীতির দিক থেকে স্বপ্নময়ীকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। অন্যান্য নাটকে যেমন দেশপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্পষ্ট, এই নাটকে তেমনি শিল্পপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ এখানে আর্টিস্ট জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

নাটকের চরিত্রগুলি সুচিত্রিত। দেশোদ্ধারের জন্য শুভসিংহ ও সুরজমল যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামে অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পরে দেখা গিয়েছে; এর দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির আভাস যেন দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়। সুরজমল চরিত্রটি আরও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে গ্রন্থের সন্দীপ চরিত্রে এসে ধরা দিয়েছে। এ ছাড়াও, অন্যান্য চরিত্রের, যথা—কৃষ্ণরাম ও রহিম খাঁর— দ্বারা যে উপায়ে এ নাটকে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের রচনায় অনুরূপ উপায়ে কৌতুক সৃষ্টি করতে দেখা গিয়েছে।

এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের দুটি রচনা আছে। একটি গান—

দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা
সাধের কাননে মোর••

এবং একটি কবিতা

দেখিছ না অয়ি ভারতসাগর
অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়কালের নিবিড় আঁধার
ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।••

"নাটকের পদ্যাংশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখা" — এ-অনুমান অসংগত মনে হয় না। কেননা, রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে (১৮৮০) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে গানের দীক্ষা নিতে বসেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত সুরে তিনি কথা জোগান দিয়ে চলেছেন। এবং রবীন্দ্রনাথের ভগ্নহৃদয় প্রকাশের (১৮৮১) পর তিনি তাঁর রচিত প্রথম নাটক রুদ্রচণ্ড (১৮৮১) উৎসর্গ করলেন জ্যোতিদাদাকে এবং এই সময়েই তাঁর সন্ধ্যাসংগীত-রচনাকার্য চলেছে। তখন তিনি জ্যোতিদাদার সঙ্গে চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানে অবস্থান করছেন।[৫]

জীবনস্মৃতিতে চন্দননগরের গঙ্গার বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত নাটকে কথার জোগান দেওয়া অসম্ভব নয়। এ-কাজ তিনি পূর্বেও করেছেন, সম্প্রতি মানময়ীতেও করেছেন। এবার এই স্বপ্নময়ীতে গানের সঙ্গে কিছুটা কাব্যাংশও হয়তো দিয়েছেন।

স্বপ্নময়ী কিছুটা লিরিকাল হয়েছে, তার হেতু সহজেই অনুমান করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন তখন গানের অগাধে ডুবে আছে। অন্তরাত্মায় সুরের ঝংকার বাজছে, এবং তারই ফলে কিছুদিন পূর্বে রচিত হয়েছে মানময়ী। তারই প্রতিধ্বনি পৌঁছেছে স্বপ্নময়ীতে।

স্বপ্নময়ী রচনার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর মৌলিক নাটক রচনা করেন নি।

এই সময়ে নাট্য-ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি ছদ্মনামে প্রথমে গীতিনাট্য রচনা আরম্ভ করেন, অবশেষে স্বনামে গীতিনাট্য লিখে আসর প্রায় জমিয়ে তুলেছেন। সেইসঙ্গে বিখ্যাত উপন্যাস ও কাব্যের নাট্যরূপ দিতেও আরম্ভ করেছেন, যথা— মেঘনাদবধ বিষবৃক্ষ, পলাশির যুদ্ধ ইত্যাদি। এ ঘটনা ১৮৭৩ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে। এর পরে গিরিশচন্দ্র মৌলিক নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর নাটক রচনা করছেন না কেন অমৃতলাল বসুর এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক রচনার আর প্রয়োজন নাই।"[৬]

নূতনের জন্য আসর ছেড়ে দিয়ে পুরাতনের পক্ষে সরে যাওয়াই তিনি সংগত মনে করেন। সংগত মনে করেন আরও সম্ভবত এই জন্যে যে, তাঁর মাথায়

বহুবিধ কর্মের চিন্তার জটলা। নূতন নাট্যকার যখন এসেছেন, তখন নাট্য-রচনা ত্যাগ করে তাঁর পক্ষে অন্য কর্মে আত্মনিয়োগই তাঁর সংগত মনে হয়।

এই চারটি নাটক রচনার ফাঁকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি প্রহসন ও একটি গীতিনাটিকা রচনা করেন। প্রহসন-প্রসঙ্গ নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে। এখানে আমরা তাঁর রচিত গীতি-নাট্যাবলীর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। তাঁর রচিত গীতিনাটিকাগুলি হচ্ছে— মানময়ী (১৮৮০), পুনর্বসন্ত (১৮৯৯), বসন্ত-লীলা (১৯০০) ও ধ্যানভঙ্গ (১৯০০); শেষোক্ত তিনটি ভারতসংগীত-সমাজে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত, এর মধ্যে পুনবসন্ত গীতিনাটিকাটি তার মানময়ী (বা মানভঙ্গ) গীতিনাটিকাটির পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত আকার, মানময়ীতে রবীন্দ্রনাথের যে-কয়টি গান ছিল পুনর্বসন্তে তার অনেকগুলি পরিবর্জিত হয়েছে, একমাত্র বসন্তের মুখের

চল চল, চল চল, চল ফুলধনু

গানটি রক্ষিত হয়েছে।

পরের তিনটি রচনার একটা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু প্রথমটি রচিত হয় প্রায় বিনা উদ্দেশ্যেই – কেবল খেয়ালের বশবর্তী হয়ে।

একদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুবান্ধব-সহ স্টীমারে চন্দননগরে চলেছেন। হঠাৎ ঝড়তুফান আরম্ভ হল। স্টীমারটি আন্দোলিত হচ্ছে। কিন্তু সেদিকে কারও কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুর-রচনা করে চলেছেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সেই সুরে কথার জোগান দিয়ে চলেছেন। এই দিনে রচিত গানগুলি থেকেই মানময়ী (পরে মানভঙ্গ) নামে গীতিনাট্যের উদ্‌ভব।

মানময়ী নাটিকার উৎপত্তির এই বৃত্তান্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে দিয়েছেন। তিনি কথার জোগান দেওয়া বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্রের নামই করেছেন, কিন্তু "মানময়ীতে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান রহিয়াছে, যেমন শেষ গান— আয় তবে সহচরী হাতে হাত ধরি ধরি ;.. তিনি ইহার মধ্যে মাত্র আর দুটি গান নিজের বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।.. ১। রতির গান —ছিলে কোথা বল, ২। বসন্তের গান—চল চল, চল চল, চল ফুলধনু।"

শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর (১৮৭৩-১৯৬০) বয়স তখন সাত-আট, তিনি তাঁর শেষজীবনে (১৯৬০) মানময়ী অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, বলেছেন,

"মানময়ী নাটক জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আপনাআপনির মধ্যে অভিনীত হয়। এটি কার রচনা, সেকালে আমাদের অনুসন্ধান করবার কোনো প্রবৃত্তি হয় নি, তবে এখন মনে পড়ে রবিকাকা জ্যোতিকাকা স্বর্ণপিসিমা অনেক সময় মিলে-মিশে গীতিনাট্য রচনা করতেন।"[৮]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই গীতিনাট্য ও মৌলিক নাটক রচনার মধ্যেই তিনি দুটি প্রহসন রচনা করেন— এমন কর্ম আর করব না (১৮৭৭), হিতে বিপরীত (১৮৯৬); এর মধ্যে প্রথমটি বছর তেইশ পরে, ১৯০০ সালে, অলীকবাবু নামে প্রকাশিত হয়। অলীকবাবু প্রহসনটির আবেদন একালেও সমান আছে। কেননা, এর সংলাপের ভাষা অতি স্বচ্ছ, এবং এ'কে সম্পূর্ণ আধুনিক বলা যায়। এককালে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বলে আমরা পূর্বে জেনেছি। তারপর অনেক কাল গত হয়েছে, কিন্তু তবুও এর আবেদন বাসী হল না, এটা নাট্যকারের কৃতিত্ব।

মৌলিক নাটক রচনা সমাপ্ত করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মনোযোগী হলেন অনুবাদকার্যে— ফরাসি ও সংস্কৃত। এবং অতঃপর ইংরেজী ও মরাঠি ভাষা থেকেও তিনি অনুবাদ করেন।

আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক নাটকের মধ্যে সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র-চেতনার সন্ধান পাই— এ বিষয়ে সবসময়ই তিনি যে সচেতন ছিলেন তাঁর এই রচনাবলীই তার প্রমাণ। বর্তমান কালে সমাজসচেতন রচনার কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। অনেকে এই ধরণের রচনার উপর বিশেষ গুরুত্বও দিয়ে থাকেন। এই সচেতনতার দিক থেকে তাহলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অন্যতম পথিকৃৎ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

তাঁর এই সচেতনতার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় তাঁর অনুবাদের মধ্যেও। অনুবাদের জন্যে তিনি কি ধরণের গ্রন্থ নির্বাচন করেছেন, সে বিষয়ে আমরা তাই সামান্য অনুসন্ধান করব।

ফরাসি গ্রন্থকার মোলিয়েরকেই তিনি প্রথম নির্বাচন করেন। প্রথম অনুবাদ করেন লে বুর্জোয়া জ্যাঁতিয়ম[৯] থেকে হঠাৎ নবাব (১৮৮৪)। তারপর মারিয়াজ ফোর্স থেকে দায়ে পড়ে দারগ্রহ (১৯০২)। এই দুইটিতেই আমাদের সেকালীন সমাজের চেহারা অতি স্পষ্ট ভাবে চিত্রিত। আমাদের সেকালীন

সমাজে একটা শ্রেণী গড়ে উঠেছিল যারা হয়েছিল সত্যিই হঠাৎ নবাব। বিদ্যার বা বুদ্ধির দৌড় না থাকলেও কেবল ঐশ্বর্যের দৌড়ে বাজিমাৎ করার হিড়িক পড়ে যায়। সমাজের পক্ষে এটা গভীর অকল্যাণ। মোলিয়ের (১৬২২-১৬৭৩) লেখকের ছদ্মনাম, তাঁর আসল নাম Jean Baptiste Poquelin ; তিনি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন সম্ভবত নিজেকে নেপথ্যে লুকিয়ে রেখে মানুষের ছদ্মবেশ খুলে তার আসল চেহারা দেখাবার জন্যেই। এই নাট্যকার এমন স্পষ্ট ভাবে সমাজের কদর্যতা তাঁর নাটকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাতে তাঁর শত্রুসংখ্যা বেড়েছিল।

সে আমলে আমাদের সমাজের গ্লানির বিষয় উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখে-ছেন (১৮৭৯) "এ সংসারে একটি শব্দ সর্বদা শুনিতে পাই—অমুক বড়লোক অমুক ছোটলোক। এটি কেবল শব্দ নহে। লোকের পরস্পর বৈষম্য জ্ঞান মনুষ্যমণ্ডলীর কার্যের একটি প্রধান প্রবৃত্তির মূল। অমুক বড়লোক, সকল ক্ষীর-সর নবনীত সকলই তাঁহাকে উপহার দাও।"[১০]

কাঞ্চনকৌলিন্য সর্বকালেই আছে, কিন্তু যখন এই ব্যাপারটি ভয়াবহ আকার ধারণ করে তখনই সমাজসচেতন লেখকদের কলম তার প্রতিবিধানের জন্যে বেশি তৎপর হয়। সেই তৎপরতা দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকে। ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের কদাচারের প্রতি বিদ্রূপ নিক্ষেপ করার জন্যে বিবিধ গ্রন্থ রচিত হয়েছে, ভবানীচরণের নববাবুবিলাস (১৮২৫), বিশ্বনাথ মিত্রের কলিরাজার মাহাত্ম্য (১৮৫০), রামধন রায়ের কলিচরিত (১৮৫৫) ইত্যাদি। তার পর সমাজের চিত্র লোকলোচনের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করল টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮), কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্সা (১৮৬২) প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ। হুতোম প্যাঁচার নক্সার একটি চরিত্র হঠাৎ অবতার, সে অবতারের নাম দেওয়া হয়েছে বাবু পদ্মলোচন দত্ত। এই সব চরিত্র অঙ্কন করে সমাজের কদাচারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সেকালের একটি সাহিত্যিক রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই রকম হঠাৎ অবতারের সংখ্যা সামান্য ছিল না। রাজনারায়ণ বসুর সেকাল আর একাল গ্রন্থে তার প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে।

সমাজের এই ভয়ংকর দিকটা জ্যোতিরিন্দ্রনাথও স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি

মৌলিক নাটক রচনা ইতিপূর্বে শেষ করেছেন। এইজন্যে অনুবাদ নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি এই সমাজচিত্র-অঙ্কনে ব্যাপৃত হলেন। তিনি ফরাসি রচনা নির্বাচন করলেন এই জন্যে যে, এই সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্যের মত রোমাণ্টিক নয়, এ সাহিত্য রিয়ালিস্টিক। সমাজের প্রকৃতরূপ এতে উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত আছে। The proper study of mankind is man— এই হচ্ছে ফরাসি মনের মূল কথা। সুতরাং মানবসমাজ ও মানবমন ও মানবচরিত্রের জ্ঞান লাভ করা ও বর্ণনা করাই ফরাসি সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁরা মানব-জাতিকে চরিত্র অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, মানবের কার্যকারণের আভ্যন্তরিক নিয়মাবলী ও যোগাযোগ আবিষ্কার করতে চান। এই কারণে মোলিয়েরের নাটক ফরাসি প্রতিভার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।"[১১]

সমাজের oddity folly pedantry vice ইত্যাদির ক্ষুরধার সমালোচনা করেছেন মোলিয়ের। মোলিয়েরের রচনায় তীব্র শ্লেষ আছে, কিন্তু সে-শ্লেষে জ্বালা নেই, তাঁর স্যাটায়ারে প্রকৃত চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, কিন্তু তার দ্বারা কোনো যন্ত্রণার সৃষ্টি হয় না। তাঁর সমালোচকেরা এইজন্যে বলেন "One can love and enjoy Moliere simply for his sunny mockery of the ridiculous excess"[১২]

মার্জিতরুচি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এইজন্য আমাদের সমাজের প্রকৃত রূপটি পাদ-প্রদীপের আলোর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করার জন্যে গ্রহণ করলেন মোলিয়েরকে। প্রথম প্রহসন অনুবাদ করে নাম দিলেন হঠাৎ নবাব। একটি সামান্য দোকানদার হঠাৎ প্রভূত অর্থের অধিকারী হয়ে কিরূপ বিসদৃশ আচরণ করছে দৃশ্যে দৃশ্যে তারই কৌতুককর ঘটনা। সমাজের লোক বুঝবে কাকে কষাঘাত করা হচ্ছে, কিন্তু অট্টহাস্য করতে করতে সে সেই কষাঘাত গ্রহণ করে যাবে। এই খানেই রচনার বাহাদুরি।

সমাজে নানা প্রকারের পদার্থহীন মানুষ আছে, অর্থের অধিকারী হওয়া মাত্রেই সে সর্বজ্ঞ হয়, পাণ্ডিত্যের কণামাত্র নেই তবুও পণ্ডিত বলে আত্মপ্রচার করে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ নবাব প্রহসনে তাদের সকলকে নিয়েই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। একটু উদ্ধৃত করি—

তত্ত্বজ্ঞানী॥ আপনারা মহাশয়-ব্যক্তি। ক্রোধে কি এ প্রকার বিচলিত

হতে হয়? বাণভট্ট ক্রোধের বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখে গেছেন, তা আপনারা পড়েন নি? —দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য

তাঁদের নামে কালিদাসের ছাঁদে উপহাস ক'রে একটা প্রবন্ধ লিখতে যাচ্ছি, তাতে তারা খুব জব্দ হবে। —দ্বিতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য

বাণভট্ট ও কালিদাস কে ছিলেন, তা না জেনেও সর্বকালের তত্ত্বজ্ঞানীরা এইরূপ উক্তিই করে থাকেন। আর, প্রধান চরিত্র জুর্দন খাঁয়ের তো কথাই নেই, তিনি টাকা করেছেন এইজন্যে পিতৃপরিচয় দিতেও অসম্মত।

মূল নাটকের চরিত্রের নামের সঙ্গে অনুবাদ-নাটকের চরিত্রের নামের ধ্বনি-সংগতি রক্ষা করে নামকরণ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, আমরা তার একটু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে দিতে ইচ্ছে করি—

মূল	অনুবাদ
Jordan	জুর্দন খাঁ
Lucilia	রোষনী
Cleontes	খেলাৎ খাঁ
Coviel	কবলু খাঁ

মোলিয়েরের আরও একটি নাটক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন কয়েক বছর পরে— দায়ে পড়ে দারগ্রহ (১৯০২)। এতেও সমাজের মজার ব্যাপার বিবৃত। বংশ-কৌলীন্যের দাপটে যেমন বহু বৃদ্ধ তরুণীভার্যা গ্রহণ করতেন, তেমনি কাঞ্চন-কৌলীন্যের গুমরেও অনেক বৃদ্ধের বিবাহ-বাসনা জেগে উঠত। এমনি এক জগমোহন বিবাহ করতে উদ্যত হল দশ বছরের বালিকা কমলমণিকে। এ সব ক্ষেত্রে বৃদ্ধের নাকাল হওয়াই স্বাভাবিক। জগমোহনও কিভাবে লাঞ্ছিত হলেন, এ নাটক তারই একটি মনোরম চিত্র।

মোলিয়েরের কাছ থেকে যেমন কোনো সামাজিক কদাচার রক্ষা পায় নি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাত থেকেও তেমনি রক্ষা পায়নি কোনো সামাজিক গ্লানি। কিন্তু যাঁরা একদিন নাট্যজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন তাঁরা আজ কোথায়?

মোলিয়ের সম্বন্ধে মালার্মে (১৮৪২-১৮৯৮) যে উক্তি করেছেন, জ্যোতিরিন্দ্র সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য। মালার্মে বলেছেন, "They [Corneille,

Moliere, Racine] are not popular. Their names are popular perhaps ;… The mob has read them once, that is true ; and without understanding them. But who rereads them ? only artists."[১০]

মোলিয়েরর ছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরও অনেক ফরাসি অনুবাদ করেছেন— আঁদ্রে শেভ্রিয়োঁর ভারতবর্ষ (১৯০৩) ; ফেবাল, গাব্রিয়েল মার্ক, শার্ল গলেত, ইউজেন মারে, ভ্যালেয়ার, ইউজেন দোরিয়াক, ইত্যাদির গল্প ও ভিক্টর হুগো ও কপ্পের কবিতা-সংকলন ফরাসি প্রসূন (১৯০৪) ; পিয়ের লোতির ইংরাজবর্জিত ভারতবর্ষ (১৯০৯) ; এবং পিয়ের লোতির কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও অনুবাদ করেন, যথা— প্রবাসীর আত্মকথা, ঘণ্টাতিনেকের আত্ম-নিবেদন, ভারতের উপকূলস্থ মাহে বন্দর, ওবক বন্দর। ভিক্টর কুঁজ্যার সত্য সুন্দর মঙ্গল (১৯১১) ; থিয়োফিল গোতিয়েরের তিনটি উপন্যাস— শোণিতসোপান (১৯২০) অবতার (১৯২২) মিলিতোনা (১৯২৩) ; এ ছাড়া দোদে, মঁপাসাঁ, জোলা, বালজাক ইত্যাদির গল্পও তিনি অনুবাদ করেন।

পিয়ের লোতি ও গোতিয়ের সম্বন্ধে এখানে দু-একটি কথা বলা হয়তো প্রয়োজন। কেননা, আমরা লক্ষ্য করেছি, মোলিয়েরের পর এই দুই লেখকের অধিক সংখ্যক রচনার প্রতি জোতিরিন্দ্রনাথ মনোযোগী হয়েছেন। লোতি (১৮৫০-১৯২৩) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমসাময়িক, দুজনের জন্ম ও মৃত্যু মাত্র দু-এক বছর আগে পিছে ; লোতি তাঁর ছদ্মনাম, আসল নাম Julien Viaud ; তিনি নাবিক, দেশপরিভ্রমণই তাঁর কাজ ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তিনি দেখেছেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অশেষ নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক দেশের মানুষেরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন। বিদেশীর চোখে ভারতবর্ষের রূপ কি রকম, দেশবাসীর কাছে তা প্রকাশ করার জন্যেই বুঝি লোতির রচনা অনুবাদ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

আর থিয়োফিল গোতিয়ের (১৮১১-১৮৭২) ছিলেন একজন শিল্পী। মাত্র চব্বিশ বছরের যুবক গোতিয়ের তাঁর *Mademoiselle de Maupin* উপন্যাসের ভূমিকায় সাহিত্যের নূতন থিয়োরি প্রচার করেন— Art for art's sake। ইনি মোলিয়েরের বিপরীত। সমসাময়িক ঘটনা থেকে নিজেকে তফাতে রেখে

ইনি শিল্পের খাতিরেই শিল্প সৃষ্টি করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ ভাগে নিজের শিল্পীসত্তার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে এই শিল্পীটির সৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজের ভাষায় তা রূপান্তরিত করেন মূল ফরাসি থেকে। অবতার গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, গোতিয়েরের "লিখিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট গল্প রচনা আছে, Avatar একটি। ইংরাজীতে বোধ হয় ইহার অনুবাদ নাই।" মিলিতোনা গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "ইহার ইংরাজী অনুবাদ নাই।"

ফরাসি থেকে অনুবাদের সময়ে তিনি ইংরেজি মরাঠি ও সংস্কৃত থেকে অনুবাদকার্যেও ব্যাপৃত আছেন। এবং সেই সঙ্গে সংগীত ও চিত্র রচনাতেও রত—এ দুই বিষয়ে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হবে। এখানে আমরা অনুবাদ-প্রসঙ্গ নিয়ে আরও কয়েকটি কথা বলি।

১২৮৫ বঙ্গাব্দের (১৮৭৮) কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতীতে তিনি ব্রহ্মদেশীয় নাটক ও নাট্যাভিনয় প্রকাশ করেন। এই রচনা ১৯০৪ সালে রজতগিরি নামে প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বে হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-১৮৮৪) "ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে লিখিয়া প্রকাশ" (১৮৭৪) করেন রজতগিরি-নন্দিনী। হরচন্দ্র ইতিপূর্বেও অনেক নাটক রচনা করেন, কিন্তু তাঁর কোনো রচনা সাফল্যলাভ করে না, কেননা তাঁর ভাষায় লালিত্য ও রস সামান্য।

স্বদেশ বা বিদেশ—কোনো দেশের কোনো বিষয়ে বৈশিষ্ট্য দেখলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার দ্বারা আকৃষ্ট হন, এই নাটক রচনা তারই ফল। ব্রহ্মদেশকে সেকালে মগের মুল্লুক বলে আখ্যাত করা হত, এবং সেখানকার অধিবাসীদের অসভ্য বলেই পরিচয় ছিল। কিন্তু সেই দেশের নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য দেখে তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখলেন ব্রহ্মদেশীয় নাটক ও নাট্যাভিনয়। "নাট্যাভিনয় ব্রহ্মবাসীদিগের একটি জাতীয় অনুষ্ঠান"—এইজন্য স্বদেশানুরাগী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে-কোনো দেশের জাতীয় অনুষ্ঠান নিজ দেশের জনসমাজে পরিবেশন করার ইচ্ছায় হাত দিলেন এই কাজে। এবং তিনি যে সাফল্যলাভ করেছেন তার প্রমাণ পরবর্তী ঘটনা।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯১৭) আরব্য-উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বন করে আলিবাবা রচনা করে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

জনপ্রিয়তা রক্ষার জন্য তিনি অনেক বিদেশী কাহিনী অবলম্বন করে অনেকগুলি নাটক লেখেন, কিন্তু সেগুলি আশানুরূপ সমাদর লাভ করে না, অবশেষে এই ব্রহ্মদেশীয় কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন কিন্নরী। সাফল্যের দিক থেকে আলিবাবার পরেই কিন্নরী। অনেকে মনে করেন ক্ষীরোদপ্রসাদের এই নাটকটিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব বিদ্যমান।

ইংরেজি থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন এপিক্‌টেটসের উপদেশ (১৯০৭) জুলিয়স সীজার (১৯০৭) মার্কাস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা (১৯১১)।

তাঁর সাহিত্যসাধনায় এতটুকু ফাঁক নেই, সামান্য বিরতি মাত্র নেই; একটানা তিনি কাজ করে চলেছেন দেখা যায়—যখন সংস্কৃত নাটকাদি অনুবাদে হাত দিয়েছেন, তখন একে একে সেই কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। পর পর তিনি অনুবাদ করেছেন— কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ (১৮৯৯), ভবভূতির উত্তর-চরিত (১৯০০), শ্রীহর্ষদেবের রত্নাবলী নাটক (১৯০০), ভবভূতির মালতী-মাধব (১৯০০), শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক (১৯০১), বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস (১৯০১), কালিদাসের বিক্রমোর্বশী (১৯০১), কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র (১৯০১), ভবভূতির মহাবীর-চরিত (১৯০১), ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক (১৯০১), ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার (১৯০১), কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধ-চন্দ্রোদয় (১৯০২), শ্রীহর্ষদেবের নাগানন্দ (১৯০২), রাজশেখরের বিদ্ধশালভঞ্জিকা (১৯০৩), কাঞ্চন আচার্যের ধনঞ্জয়বিজয় (১৯০৪), রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী (১৯০৪), শ্রীহর্ষদেবের প্রিয়দর্শিকা (১৯০৪)।

নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বঙ্গসাহিত্যে এ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি, বঙ্গীয় পাঠকদের কাছে তিনি এতগুলি নাটকের অনুবাদ উপস্থিত করেছেন— এবং তা মাত্র চার-পাঁচ বছরের কঠোর শ্রমের দ্বারা। ১৮৯৯ সালে এই কাজে হাত দিয়ে ১৯০৪ সালের মধ্যে তিনি এই বিশাল কর্তব্য পালন করেছেন।

তাঁর মনের পরিধির পরিমাপ করা সহজ নয়। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তিনি বিভিন্ন জাতের প্রবন্ধ রচনা করেছেন তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকর্মের সঙ্গেই। প্রবন্ধাবলীর বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষ করলে বুঝতে পারা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজের মনকে কি পরিমাণে শিক্ষিত ও মার্জিত করে তুলেছেন।

১৩১২ বঙ্গাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সংগ্রহ গ্রন্থ প্রবন্ধমঞ্জরী প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "ভারতীর আরম্ভ হইতে ভারতীতে এবং সাধনা প্রভৃতি অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় আমার লিখিত যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি বাছিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা গেল।"

প্রবন্ধমঞ্জরী প্রকাশিত হওয়ার পরও কুড়ি বৎসর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন, সুতরাং প্রবন্ধমঞ্জরীতেই তাঁর প্রবন্ধ শেষ নয়। এর পরে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখেছেন, এবং অনুবাদকার্যও করেছেন।

জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশচিন্তার দ্বারা যাঁর মন জারিত, যিনি স্বদেশের ও সাহিত্যের কল্যাণের জন্য জীবন সমর্পণ করেছেন, তিনি দেশের ও সাহিত্যের হিতের জন্যে কোনো শ্রমকেই শ্রম বলে মনে করেন নি।

বিভিন্ন ভাষা থেকে তিনি সৎসাহিত্য আহরণ করে বঙ্গসাহিত্যের উদ্যানে তা প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। মধুকরের মত তিনি মধু-আহরণ করেই কাটিয়েছেন সারাটা জীবন · গৌড়জন যাতে আনন্দে নিরবধি সুধাপান করতে পারে, এই বুঝি তাঁর ইচ্ছা।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের জীবনী তাঁর নজরে আসে। বঙ্গবাসীকে সেই বীর নারীর জীবনকথা জানাবার জন্যে তিনি সেটি অনুবাদ করেন—ঝাঁসীর রানী (১৯০৩)। এবং এই মরাঠি ভাষা থেকেই তাঁর জীবনের একেবারে প্রায় অন্তিম লগ্নে তিনি অনুবাদ করেন বাল গঙ্গাধর টিলক -কৃত গীতা-রহস্য। তার নাম দেন শ্রীমদ্ভগবদগীতা রহস্য অথবা কর্মযোগ শাস্ত্র। ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন—"লোকমান্য মহাত্মা টিলক তাঁহার প্রণীত গীতারহস্য বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণকামনায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে—অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরুভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম।" কর্মযোগী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এইটিই শেষ কাজ, তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে, ১৯২৪ সালে, এই বিরাট বইটি প্রকাশিত হয়।

আমরা তাঁর এই পর্বের কথা প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছা করছি যে তিনি দেশের

লোকের স্মৃতির অতলে চলে গিয়েছেন হয়তো, কিন্তু তার দ্বারা তাঁর কোনো ক্ষতি হয় নি, কল্যাণব্রত নিয়ে তিনি কাজ করেছেন, কল্যাণব্রতীর কখনো মার নেই।

শেষজীবনে তিনি যে গীতাচর্চা করে গিয়েছেন, সেই গীতার একটি বাণী এখানে শুধু স্মরণ করতে পারি—

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিত্তাত
দুর্গতিং গচ্ছতি।

১ বঙ্গদর্শন ১২৭৯ চৈত্র।— 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' ৬৮

২ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'

৩ বঙ্গদর্শন ১২৮১ ভাদ্র

৪ শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড

৫ শ্রীহরিহর শেঠ, রবীন্দ্রনাথের জীবনে চন্দননগরের স্থান, প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন

৬ মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'

৭ রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ ফাল্গুন।

৮ শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (১৯৬০)

৯ Moliere (1622-73) : "*Le Bourgeois gentihomme* (1670), the immoral portrait of a snobbish merchant"—Geoffrey Brereton : *A Short History of French Literature.*

১০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাম্য'

১১ প্রমথ চৌধুরী, 'প্রবন্ধসংগ্রহ' : ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়

১২ Geoffrey Brereton, *A Short History of French Literature*

১৩ Mallarme, *On Moliere.* tr, Bradford Cook

বঙ্গসাহিত্যে স্থান

প্রবল আলোর দিকে সোজাসুজি তাকালে চোখে ধাঁধা লাগে। দীপ্তি গ্রহণ করার পক্ষে চোখের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে বলেই এমন হয়। প্রবল প্রতিভাও একটা দীপ্তি। তার দিকে সোজাসুজি তাকালে আমাদের মনও বিপন্ন বোধ করে; এইজন্যে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে হয়। কেননা, মনেরও গ্রহণক্ষমতার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে।

আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিভার দিকে সোজাসুজি দৃষ্টিপাত না করে তাঁর সম্বন্ধে যে উদাসীন আছি, সেটা আমাদের মনের দৈন্যেরই প্রমাণ।

যে মানুষ তাঁর একটি জীবনের একক প্রচেষ্টায় দেশের বিবিধ কল্যাণ করে গিয়েছেন, আমরা, দেশবাসীরা, তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার সম্যক সংবাদ তো রাখিই নে, তাঁর কথাও বিশেষ চিন্তা করিনে। এটা কেবল আমাদের মনের দারিদ্র্যই না, এটা তার চেয়েও সম্ভবত বেশি— এটা আমাদের মনের দৈন্য। তিনি জাতীয়-সংগীত রচনা করেছেন, তিনি গীতকাব্য রচনা করেছেন, ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন, চিত্র অঙ্কন করেছেন, দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করেছেন, ফরাসি ইংরেজি মরাঠি সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা থেকে বিবিধ গ্রন্থ অনুবাদ করে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেছেন, চিন্তা-গবেষণা-মৌলিকতার এক-একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর দীর্ঘজীবনের একটি লহমাও তিনি অপব্যয় করেছেন বলে মনে হয় না। আরও একটি কাজ তিনি করেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথকে রচনা করেছেন। তাঁর এতগুলি দীপ্ত শিখা একত্র হয়ে এমন প্রবল আলোক বিচ্ছুরিত হয়েছে যে, সেদিকে সোজাসুজি তাকাবার সামর্থ্য আমাদের হয় নি, আমাদের মন তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

আগে একবার বলে এসেছি, পুনরায় বলি— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একাই একটি ইন্‌স্টিটিউশন। সে একটি ছোট ইন্‌স্টিটিউশন নয়, বৃহৎ এক কর্মশালা। সেই বৃহৎ কর্মশালাটির কনিষ্ঠতম কেরানীটি থেকে আরম্ভ করে বলিষ্ঠতম পরিচালকটি পর্যন্ত তিনি একা। ছোট গীতিনাটিকা থেকে আরম্ভ ক'রে ভগবদ্‌গীতা পর্যন্ত ব্যাপারে একই হাত।

বাইরের উৎসাহে মানুষের কর্মশক্তি বাড়ে, পাঁচজনের স্বীকৃতিতে মানুষের উদ্যম বৃদ্ধি পায়; অনেকে বলেন, শিল্পীর সাধনার জোর বজায় রাখতে কিছু তোয়াজ ও কিছু তারিফ দরকার হয়। কিন্তু এ কথা যে খাঁটি কথা নয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার প্রমাণ। খেই ধরিয়ে দিলেই হল, তার পর তাঁর কাজ তাঁর হাতে। উদ্যমে উৎসাহে তাঁর জীবনের জ্যা এমনিতেই টান-টান হয়েই ছিল, তার উপর যে-কোনো শর স্থাপন করা মাত্র তা তীরবেগে উধাও হয়ে ছুটত। তিনি জানতেন আর্ট অতি দীর্ঘ জিনিস, কিন্তু লাইফ বড় খাটো। সেই ক্ষুদ্র জীবন দিয়ে আর্টের বেড় পাওয়া কঠিন। তাই, আর্টের দৈর্ঘ্যে পৌঁছবার জন্যে তিনি জীবনকে প্রাণপণ বেগে দৌড় করিয়েছেন। দম ছিল অফুরন্ত, তাই জীবনে তাঁর কখনো হাঁফ ধরে নি। জীবনের শেষলগ্নেও তিনি সমান উৎসাহে বৃহৎ কাণ্ড করেছেন সোৎসাহে— টিলকের গীতারহস্য অনুবাদ করেছেন। যে বয়সে লোকে সব ছেড়েছুড়ে বানপ্রস্থে যেত, তখন তাঁর তার দেড়া বয়স।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের উদ্বোধন জাতীয়-চেতনা নিয়ে। স্বদেশপ্রীতিই তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র— এই প্রীতিই তাঁর জীবনের একমাত্র প্রেরণা। দেশাত্মবোধ বললে সবটুকু বলা হল না— দেশ ও আত্মা তিনি সন্ধি করে এক করে নেন নি, তিনি দেশকেই তাঁর আত্মা বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রতিটি কর্মের মূলে এই বোধ, বিশেষ করে তাঁর সাহিত্যকর্মের।

ফরাসি-প্রসূন গ্রন্থে ফরাসি কবি কপ্পের যে অনুবাদ আছে তার একটি হচ্ছে— ফরাসি-জার্মান যুদ্ধে জার্মান সৈন্য ফরাসি দেশ অধিকার করে যখন সেখানেই অবস্থান করছিল, তারই বর্ণনা, তাতে বলেছেন—

মণি-মুক্তা-অলংকার কিবা তাহে প্রয়োজন,
মাতৃভূমি থাকে যদি
দাসী হয়ে দাসত্ব-আঁধারে।

এই সঙ্গে আর-একটি কথাও বলে নেওয়া যায়। নিজের দেশের প্রতি তাঁর যেমন মমতা, অন্যদেশের জাতীয়তার প্রতিও তাঁর তেমনি মমত্ব।

ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদের সে-আমলে যেমন চোখেই দেখা হোক না, তাদের মগ বলে যতই অবজ্ঞা করা হোক না, সে দেশের জাতীয়-নাটকের অনুবাদ

তিনি করেছেন বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে। তিনি অনুবাদ করে তার নাম দিলেন রজতগিরি। তাঁর মনের বনিয়াদ পাকা, তাই তিনি সে নাটক জনপ্রিয় করার জন্যে তাকে কিন্নরী করে তুললেন না।

একটি পরাধীন দেশের নাগরিকের মর্মবেদনা তিনি অন্তরাত্মা দিয়ে অনুভব করেছেন, তাঁর হৃদয়ের বেদনার সেই প্রতিধ্বনি তাঁর রচিত মৌলিক নাটকাবলীর মধ্যেও অনুরণিত। বিদেশীর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করার জন্যে যে আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল, সেই আকাঙ্ক্ষা দেশের জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্যে ঐতিহাসিক নাটক লিখে দেশের মানুষের সম্মুখে তা উপস্থাপিত করেন। দেশের মধ্যে যত ক্লেদ ও গ্লানি, যত ভণ্ডামি ও ইতরামি—সব দূর করা সহজ নয়; কিন্তু সকলকে সে বিষয়ে সচেতন করে তুলতে না পারলে তার প্রতিবিধান কোনো দিনই সম্ভব হয় না। এই জন্যেই তাঁর প্রহসন-রচনায় হস্তক্ষেপ, এবং এইজন্যেই সামাজিক অনাচারকে কেন্দ্র করে রচিত বিদেশী নাটক তিনি অনুবাদ করলেন বঙ্গভাষায়। এর দ্বারা, এইসব অনাচার ও অনাচারী সম্বন্ধে দেশের লোকের যদি চোখ ফোটে, তবে দেশেরই মঙ্গল। তাঁর সাহিত্যসাধনার মূলকথা এই মঙ্গলপ্রচেষ্টা। আর্টের খাতিরেই আর্ট—এই কথার যিনি উদ্ভাবক, সেই ফরাসি লেখক গোতিয়ের -রচিত গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেছেন; অর্থাৎ গোতিয়ের তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং গোতিয়েরের তিনি অনুরাগী হন। কিন্তু গোতিয়েরের বাণী তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। সাহিত্যের খাতিরেই তিনি সাহিত্যসাধনা করেন নি, দেশের কল্যাণ-সাধনের উদ্দেশ্যেই তাঁর সাহিত্যসাধনা। জীবনের প্রথম সাহিত্যপ্রচেষ্টা এই উদ্দেশ্যেরই পরিণাম, এবং জীবনের শেষ কাজটিও এই উদ্দেশ্যেরই পরিণতি। প্রথমজীবনে যা রচনা করলেন তা দেশাত্মবোধক নাটক, জীবনের শেষ লগ্নে যা অনুবাদ করলেন তাও ভারতেরই মর্মবাণী—গীতা।

মাটির যত গভীরে শিকড় চালনা করতে পারা যায় কাণ্ডটি ততই মজবুত হয়, শাখাপ্রশাখা ততই পল্লবিত হয়ে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন গভীর নিবিড় আশ্লেষে দেশের মাটির অগাধ বেষ্টন করে ধরেছিলেন, এই জন্যেই তাঁর রচিত সাহিত্যের গঠন এমন গাঢ়, এবং তার শাখাপ্রশাখা এমন সতেজ।

কি অনুবাদকার্যে, কি মৌলিক রচনায়, তাই তাঁর এই সুঠাম মনটির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সেই মন ক্লাসিক মন।

লোকরঞ্জন করার চেয়ে লোকহিতকেই তাই তিনি বড় করে ধরেছেন। তাঁর রচনা নিয়ে চারিদিকে সোরগোল পড়ল কিনা, সেদিকে তাই তাঁর দৃক্‌পাত নেই। তিনি নিজের মনে নিজের কাজ করে চলেছেন। বাহিরের লোক তা কতটা গ্রহণ করল, সে হিসাব নেবার অবকাশ তাঁর নেই। নাম-সংকীর্তন নয়, রস-আস্বাদনই তাঁর জীবনের কাজ; এই জন্যে অন্তরঙ্গের সঙ্গে তিনি সেই কাজ করেছেন।

সে রস ক্লাসিক রস। তাঁর মনের টান তাই সব সময় ক্লাসিকের দিকে। এবং, এই সঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, সেই ক্লাসিকের সঙ্গে তিনি রিয়্যালের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ দেখিয়েছেন। তিনি অনুবাদের জন্যে একদিকে নির্বাচন করেছেন কালিদাসকে ভবভূতিকে শ্রীহর্ষদেবকে রাজশেখরকে শূদ্রককে, অপর দিকে নির্বাচন করেছেন মোলিয়েরকে।

তাঁর নির্বাচিত এইসব সংস্কৃত নাটক যে ক্লাসিক সাহিত্যের অন্তর্গত সে বিষয়ে কারও মতভেদ্ হবেনা; অপর দিকে, সমালোচকেরা বলেন, ফরাসি সাহিত্য রিয়ালিস্টিক— ইংরেজি সাহিত্যের মত রোমাণ্টিকতা তার প্রাণ নয়; এবং ফরাসি সাহিত্যের বিশেষত্ব তার আর্ট; আর সে আর্ট রোম্যাণ্টিক নয়, ক্ল্যাসিক্যাল।[১] অর্থাৎ ফরাসি সাহিত্যের মধ্যেই তা হলে একাধারে ক্ল্যাসিকাল ও রিয়্যালিষ্টিক দুই গুণই আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই দ্বি-গুণ বিশিষ্ট ফরাসি সাহিত্যের মধ্যে একজন সেরা লেখককে নির্বাচন করেন। এইখানেই তিনি ধরা দিলেন, আমরা তাঁর মনের ঝোঁক কোন্‌দিকে তার স্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে গেলাম।

কিন্তু কেবল এই ভাবে প্রমাণ পেয়েই আমরা পরিতুষ্ট নই। আমরা তাঁর কৃত কর্মের দ্বারা তার প্রমাণ প্রত্যাশা করি।

দেশপ্রাণতা জিনিসটা আজ কাল বা পরশুর জিনিস নয়— এ চিরকালের মানুষের মনের একটা চিরকালীন বোধ। মনের একটা সাময়িক ঝাল মেটাবার জন্যে ইনি লিখেছিলেন কিঞ্চিৎ জলযোগ, মনের একটা শখ মেটাবার জন্যে মানময়ী; কিন্তু তাঁর মনের খোরাক হচ্ছে মাটির অনেক গভীরে— সেই রসের

নাম দেওয়া যেতে পারে চিরায়ত রস ; তাই তিনি যখন কলম বাগিয়ে ধরলেন তখন ঝাল বা শখ মেটাবার জন্যে নয়— গভীর কথা গভীর ভাবে বলার জন্যে ; যাতে তিনি পেতে পারেন সেই পরম রসের সন্ধান। একের পর এক তিনি লিখে গেলেন ঐতিহাসিক নাটক— যার আবেদন কোনো কালে বাসী হবার হয় ; পুরাতন বলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে, কিন্তু অর্বাচীন বলে তাকে অবজ্ঞা করা যায় না। সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক নাটক আছে— দৃষ্টান্তস্বরূপ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনূদিত নাটকাবলীর কথাই বলা যায়, সেগুলিও পুরাতন, সেগুলিও প্রত্যাখ্যাত— কিন্তু তার প্রতি কারও অবজ্ঞা আশা করি নেই। আজও তাই কালিদাস ভবভূতি শ্রীহর্ষ রাজশেখর শূদ্রক আমাদের পূজ্য।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলা যায়, দীর্ঘকাল অখ্যাত অজ্ঞাত থাকার পর হালে (১৯৬০) দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অনেক নাট্যপ্রতিষ্ঠানের দ্বারা নূতন উদ্যমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। তাঁর রচনার আবেদন সাময়িক হলে সে আবেদন এতদিনে ফুরিয়ে যাবার কথা। যা সত্য তা নাকি কখনো মরে না, শতশতাব্দীর বিস্মৃতির তল থেকেও তা পুনরায় জেগে ওঠে, উপেক্ষায় বা অনাদরে অস্থিরও নাকি হয় না। প্রসঙ্গান্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন, জ্যোতিরিন্দ্র-প্রসঙ্গে আমরা তা পুনরুচ্চারণ করি।

তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রীরা রক্তমাংসে গড়া প্রত্যক্ষ মানুষ, তাদের মুখের ভাষায় কোনো জড়তা নেই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নাগরিক ভাষায় তারা কথা বলে। তাদের ভাষার মধ্যে কোনো অবাস্তবিকতা নেই, শহুরে মানুষেরা পথে-ঘাটে যে রকম সহজ স্বাভাবিক ভাষা ব্যবহার করে, তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রীরাও সেই রকম ভাষাতেই কথা বলে। যেহেতু এটা একটা নাটক, যেহেতু পাত্রপাত্রীরা মঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে সেজেগুজে এসে দাঁড়াবে, সেই জন্যেই তাদের মুখের কথাতেও যথেষ্ট আলোকপাত করে তা উজ্জ্বল ও সাজগোজ পরিয়ে শৌখিন করে তোলা হয় নি। তাদের মুখের ভাষা আটপৌরে। সে ভাষায় যথেষ্ট কারুকার্য ক'রে তাঁর উপর কৃত্রিমতার আবরণ দেওয়াই সহজ কাজ— তাদের কথাগুলি সহজভাবে বসানোই কঠিন।

নাগরিক-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর টান আরও প্রকাশিত হয়েছে অনুবাদের জন্যে মৃচ্ছকটিক নির্বাচন দ্বারা। ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "তৎকালে নাগরিক সমৃদ্ধি ও বিলাসিতা যে চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল তাহা বসন্তসেনার ভবন-বিভবের বর্ণনা পাঠ করিলেই বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়।" এবং এই নাগরিক কথাটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "ইংরাজি civilization শব্দের মূল ধরিয়া অনুবাদ করিতে হইলে উহাকে নাগরিকতা অথবা নাগরিক সভ্যতা বলা যাইতে পারে।"

তিনি নিজেও নাগরিক সভ্যতায় মানুষ, এইজন্যে এই নাগরিকতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ। এর আরও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়— ফরাসি-প্রসূনে ভিক্তর হুগো থেকে অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ আছে, তার একটির কয়েকটি ছত্র এইরূপ—

বলিতেছি তোমাদের যে মায়ের কথা
তাঁহার নিবাসভূমি পুরী কলিকাতা।[২]

হুগো কলকাতার কথা বলেন নি, তিনি তাঁর দেশের নগরের কথা বলেছেন, জ্যোতিরিন্দ্র সেই কাহিনীকে এনে ফেলেছেন 'পুরী কলিকাতা'য়। এই কলিকাতা পুরীটিই তাঁর প্রাণ, এইজন্যে এর কথা কখনো তিনি বিস্মৃত হননি। তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রীরাও এই শহরেই প্রাণধারণ করছে বলে তাই মনে হয়।

সাহিত্যক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় নাট্যকার রূপে। মৌলিক নাটক রচনা বন্ধ করে তিনি যখন অনুবাদে আত্মনিয়োগ করলেন তখন সংস্কৃত নাটকগুলিই তিনি অনুবাদ করেছেন। তাঁর জীবনটাই একটি নাটক, অনেক ঘটনা ও দুর্ঘটনায় ও অনেক ঘাত-প্রতিঘাতে এ জীবন তৈরি। তাঁর সাহিত্য-কর্মের মধ্যে তাই বুঝি তাঁর জীবনেরই প্রতিধ্বনি।

পৃথিবীর সেরা সাহিত্য চয়ন করে এনে তিনি বঙ্গবাসীকে দান করার জন্যে তৎপরতা দেখিয়েছেন। নগর-কলকাতায় তাঁর মন গঠিত, কিন্তু সে-মন এই নগরের চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী ছিল না। নীড়ের পাখি যেমন তার নীড়টি ভালোবাসে কিন্তু উড্ডীন হতে চায় উন্মুক্ত আকাশে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তেমনি এই নগরের নীড়ের পাখি, কিন্তু তিনি পাখির মতই উদারভাবে

বিচরণে ব্যগ্র ছিলেন। এইজন্যে ভারতবহির্ভূত সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন তাঁর স্বচ্ছন্দ পরিভ্রমণ, বঙ্গের বাহিরের ভারতীয়·অন্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি। তিনি ইংরাজি ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন, মরাঠি থেকেও অনুবাদ করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "যখন দেখিব, আমাদের সাময়িক সাহিত্য-পত্রাদিতে মরাঠি গুজরাটি হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ-সকলের সমালোচনা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তখনই জানিব আমরা কতটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছি, এবং যখন দেখিব, একসময়ে সমস্ত য়ুরোপে যেরূপ ফরাসি ভাষার আদর ছিল, সেইরূপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক, বাঙ্গালার সাহিত্যসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া, বাঙ্গালা ভাষা আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সহিত শিক্ষা করিতেছে, তখনই জানিব, বঙ্গীয়-সাহিত্য-গগনে গৌরব-রবির উদয় হইয়াছে।" ৩

বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর যেমন মমত্ব, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্যের প্রতিও তাঁর যে তেমনি শ্রদ্ধা, তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন আজ থেকে কত বর্ষ আগে? উক্ত উক্তি তাঁর ১৩০২ বঙ্গাব্দের।

তিনি আগাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আমরা একবার এ কথা বলেছি। পুনরায় তা বলতে হচ্ছে এই প্রসঙ্গে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচয়সাধনের জন্যে বর্তমানে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে।

ভারতবর্ষে এই কারণে সাহিত্য অকাদামী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে তিনি প্রস্তাব পেশ করেছেন বহুদিন আগে। বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি বঙ্গসাহিত্যের প্রতিও আন্তরিক মমত্ব প্রকাশ করেছেন, ইউরোপে ফরাসি সাহিত্যের মর্যাদার মত ভারতবর্ষে বঙ্গ-সাহিত্যের মর্যাদা তাঁর কাম্য।

বঙ্গভাষায় অনুবাদের জন্যে তাই তিনি গ্রহণ করেন ইউরোপের ঐ সেরা সাহিত্যটিই।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমরা এই মানুষটি সম্বন্ধে উদাসীন। তাঁর সাহিত্য-চর্চার বিষয় তেমন আলোচনা হয় নি। নিভৃত নেপথ্যে বসে তিনি সাধনা করেছেন—

লোকরঞ্জন লোকগঞ্জন না করি দৃক্‌পাত
যাহা শুভ যাহা ধ্রুব

তিনি তার সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন।

তিনি অগ্রিম জন্মগ্রহণ করেছেন। এখন সময় অনেক এগিয়ে এসেছে, তাঁর চিন্তাশীল মনের সমসাময়িক কাল এদেশে এসে পৌছতে আর বুঝি দেরি নেই। অচিরে তা এসে পৌছলে সেই কাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে। এবং আন্তরিক অভিনন্দনের দ্বারা অভিবাদন জানাবে। হয়তো সকলেই মুখর হয়ে উঠবে তাঁর সাহিত্যকীর্তি নিয়ে।

তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা হয় নি বললেই হয়। এইভাবে অনালোচিত থাকার জন্যেই দেশের লোকের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নতুনদাদার অনেক নবীনত্বের কথা বলেছেন, নতুনদাদার কাছে ঋণস্বীকারও করেছেন জীবনের বিভিন্ন পর্বে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলেন নি। যদি রবীন্দ্রনাথ কিছু বলতেন তা হলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতি দেশের লোকের মন আকৃষ্ট হত অনেক আগে।

১ Lytton Strachey : *Landmarks in French Literature*

২ 'ফরাসি-প্রসূন', "হারাধন"

৩ মারাঠী ও বাঙ্গালা, সাধনা ১৩০২ বৈশাখ। 'প্রবন্ধমঞ্জরী'

সংগীতসাধনা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে সংগীতের স্থান কোথায় আমরা তার আভাস পেয়ে এসেছি। জীবনের প্রথম লগ্ন থেকে সংগীত-নাটকাদি নিয়েই তাঁর অনেক সময় কেটেছে। বাড়ির আবহাওয়াও ছিল এর অনুকূল, আমরা তাও লক্ষ করে এসেছি।

নানা কাজের মানুষ তিনি, কখনো অনেক কাজ যুগপৎ চলেছে, কখনো বা এক-একটি কাজ তাঁর জীবনের এক-একটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সংগীত তাঁর জীবনব্যাপী বিস্তৃত ছিল। সুরসাধনা এবং নতুন সুর রচনার জন্যে তিনি জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করেছেন, এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে তিনি তাঁর মন্ত্রশিষ্যের ন্যায় করে নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত সেই সুরে কথার যোগান দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেও যে সংগীতের কথা রচনা করেছেন, এবং স্বরলিপি-রচনা করেছেন, এখানে আমরা সেই আলোচনা করব। এবং গান সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের জন্যে তাঁর উদ্যোগের বিষয়ও কিঞ্চিৎ আলোচনা করার ইচ্ছে।

রামমোহন রায়ের আমল থেকেই কৃষ্ণ ও বিষ্ণু দুই ভাই ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ছিলেন। কৃষ্ণ আগেই লোকান্তরিত হন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে দেখেন নি। তাঁদের সময়ে বিষ্ণুই সমাজের গায়ক। বিষ্ণুর জনপ্রিয়তা তখন খুব বেশি। এর কারণ, দীর্ঘকালীন তানের দ্বারা গানকে তিনি আচ্ছন্ন করে শ্রোতাদের অধৈর্য করে তুলতেন না, এবং গানের কথারও যে একটা মূল্য আছে, বিষ্ণু তাঁর গানে সেটি পূর্ণমাত্রায় বুঝিয়ে দিতেন।

বিষ্ণুর গাওয়া হিন্দী গান ভেঙে সত্যেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন।

তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বড় বড় গায়কদের আশ্রয় দেওয়া হত। তাঁদের মধ্যে রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের জমিদারের ভ্রাতা রাজচন্দ্র রায় এবং যদুভট্ট উল্লেখযোগ্য। রমাপতি অনেক গান রচনা করেছেন, যদুভট্টও হিন্দী গান রচনা করতেন।

১৮৬৮ সালের জুন মাসে সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই চলে যাবার পর, এঁদের গান ভেঙে ব্রহ্মসংগীত রচনা করতেন তিন ভ্রাতা— দ্বিজেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

তাঁদের এই কাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল খুব। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "যাহার যেদিন রচনা হইত পিতৃদেব সেই রচিত গান সন্ধ্যার পর শুনিতেন। তাঁহার ভালো লাগিলে আমরা উৎসাহিত হইতাম।"[১]

ব্রহ্মসংগীত-রচনার জন্য তখন তাঁদের মধ্যে খুব উৎসাহ। শৌখিন বা পেশাদার যাই হোক-না কেন, কোনো গায়কের কোনো গান ভালো লাগলেই সেটি টুকে নিয়ে এসে সেই গান ভেঙে ব্রহ্মসংগীত রচনা করতেন তাঁরা। এই ভাবেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগীত রচনার হাতে খড়ি। ব্রহ্মসংগীতে যে বড় বড় ওস্তাদী সুর প্রবেশ করেছে তার কারণ এই— ওস্তাদী গান ভেঙেই এই গান রচনা আরম্ভ হয়। বাংলায় গানের উন্নতি যদি হয়ে থাকে তা হলে তা এইজন্যেই হয়েছে।-

এই প্রথা অনুযায়ী অগ্রসর হয়ে, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় প্রতিভা-বলে ব্রহ্মসংগীতের প্রভূত উন্নতিসাধন করেছেন। কিন্তু সে অন্য কথা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই ভাবে অনেক গান রচনা করেছেন। কিন্তু কেবল গানের কথা রচনা নয়, গানের সুর রচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব সামান্য নয়। তিনি যে সুর-রচনা ক'রে তার কথা-ভাগ রচনার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে উৎসাহ দিয়েছেন—এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলোকে পিয়ানো-যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যেসকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম।"[২]

তাঁর সংগীতপ্রিয়তার ও সংগীতনিষ্ঠার কথা সে সময়ে সকলের মধ্যেই

প্রচারিত হয়। ১৮৭৫ সালের ৪ জুন তারিখে আমরা তাঁকে নূতন পদে অভিষিক্ত দেখি। আদিব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসংগীতের স্থায়িত্ব ও উন্নতি সাধনের জন্য সমাজমন্দিরের দ্বিতল গৃহে ঐ তারিখে আদিব্রাহ্মসমাজ-সংগীতবিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রবি ও বুধ বার ব্যতীত প্রত্যহ সায়াহ্ন ৭।।০ ঘটিকা থেকে রাত্র ১০টা পর্যন্ত ছাত্রদিগকে এখানে বিনা-বেতনে উচ্চাঙ্গের কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীত শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষা দিতেন যদু ভট্ট।

তরুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সংগীতবিদ্যালয়ের সম্পাদক-পদে বৃত হন।

তাঁর সাধনার ধারাই এই। যখন যে কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন, সেই কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন। তা না হলে যন্ত্র কি করে কথা বলে উঠতে পারে? তাঁর হাতের যাদুতে পিয়ানোযন্ত্রের 'সুরগুলা নানা প্রকার কথা কহিতেছে' বলে বোধ হত নিশ্চয়ই তাঁর সাধনার একাগ্রতার জন্যই।

গানের সুর মুখে মুখে তুলে দিয়ে সাধারণের মধ্যে সুর প্রচার করা অসম্ভব কাজ। এ ভাবে কখনো গানের প্রচার বা প্রসার হয় না। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্য পন্থা আবিষ্কার প্রয়োজন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগীতসাধনা আত্মকেন্দ্রিক ছিল না। সংগীতচর্চা করে নিজে বড় একজন গানের ওস্তাদ হয়ে উঠবেন— এ উচ্চাশা তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। তিনি তাঁর আনন্দের ভাগ সকলের মধ্যে বিতরণ করার জন্যে যেমন উৎসুক, সর্বসাধারণের মধ্যে গানের চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যেও সমান প্রস্তুত। এইজন্যে, গানের সুর বা স্বর কি ভাবে অক্ষর দিয়ে ধরা যেতে পারে, তার পন্থা উদ্ভাবনের জন্যে তাঁর তৎপরতাও লক্ষণীয়।

তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথও একজন কৃতী ও উৎসাহী পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বরলিপি প্রস্তুতের প্রণালী সম্বন্ধে প্রস্তাব দাখিল করেন। ১৭৯১ শকের কার্তিক (১৮৬৯ অক্টোবর) সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি 'সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী' জানান, এবং উক্ত প্রণালী অনুযায়ী পাঁচটি ব্রহ্ম-সংগীতের স্বরলিপি প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত এই প্রণালী কিছুকাল অনুসৃত হয়, এবং ১২৯২ বঙ্গাব্দ আশ্বিন-কার্তিক (১৮৮৫ সেপ্টেম্বর

-অক্টোবর) সংখ্যা বালক পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় —'নূতন স্বরলিপি'।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বরলিপি সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাবটি প্রকাশিত হওয়ার বছর দুই আগে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৯০৪) 'বঙ্গৈকতান' নামে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম স্বরলিপি পুস্তক প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের নাম 'নূতন স্বরলিপি' দিয়েছেন সম্ভবত এই কারণেই।

কৃষ্ণধন ইউরোপীয় রৈখিত প্রণালী অনুকরণে বাংলায় এই স্বরলিপি প্রবর্তনের চেষ্টা করেন, তাঁর এই পদ্ধতি প্রচলিত হয়নি, এইজন্যেই সম্ভবত আমরা তাঁকে বিস্মৃত হয়েছি।

কিন্তু সেকালে কৃষ্ণধন একজন নামজাদা সংগীত-বিশারদ ছিলেন। এবং সংগীত-বিষয়ক অনেক গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন, যথা— বঙ্গৈকতান (১৮৬৭), *Hindusthani Air Arranged for the Pianoforte* (১৮৬৮), সংগীত-শিক্ষা (১৮৬৮), সেতার-শিক্ষা (১৮৭৩), গীতসূত্রসার (১৮৮৫), হারমোনিয়ম-শিক্ষা (১৮৯৯)।

বিভিন্ন গ্রন্থে কৃষ্ণধন সম্বন্ধে উল্লেখ আছে— দিলীপকুমার রায়ের 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জী' হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 'সংগীত পরিবর্তন' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' প্রভৃতি।

কৃষ্ণধন-প্রবর্তিত স্বরলিপি-পদ্ধতি প্রচলিত না হলেও এই বিষয়ে তাঁকে পথিকৃৎ বলা যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজের স্বরলিপিপ্রণালী অবশ্যই বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করে আসছিলেন। এবং কি ভাবে এই প্রণালীর সংস্কার করে আরও সহজ করা যেতে পারে তার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় ছিলেন। কেননা, বালক পত্রিকায় নূতন স্বরলিপি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার বছর তিনেক বাদে আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নূতন পদ্ধতির প্রস্তাব-সহ সাধারণ্যে উপস্থিত হতে দেখতে পাই। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের (১৮৮৯) পৌষ-সংখ্যা ভারতী ও বালকে তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন,

নাম—'গানের স্বরলিপি'। তাঁর উদ্ভাবিত এই পদ্ধতি সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি। কিন্তু নিজের এই উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, ব্যাপারটি আরও সহজ ও সর্বজনবোধ্য করার জন্যে তিনি নিজের পদ্ধতিরই সংস্কার সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন। অবশেষে তিনি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সেই পদ্ধতির উদ্ভাবন করলেন, যাকে বলা হয়— আকার-মাত্রিক স্বরলিপি। সংখ্যা-মাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির প্রস্তাব দাখিল করার বছর-তিনেক পরে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ তাঁর আবিষ্কৃত এই নূতন পদ্ধতির কথা প্রকাশ করেন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা সাধনা পত্রিকায় তিনি তাঁর আবিষ্কৃত এই পদ্ধতি প্রকাশ করেন, প্রবন্ধের নাম 'সার্গম স্বরলিপির আকার-মাত্রিক নূতন পদ্ধতি'।

এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করে তিনি তার সংস্কার সাধনের জন্যেও ব্যাপৃত ছিলেন। এবং স্বরলিপি যাতে সকলে সহজ ভাবে ধরতে এবং বুঝতে পারেন সেইজন্যে তিনি অনেক কাল পরে পত্রান্তরে[১] প্রকাশ করেন— 'আকার-মাত্রিক স্বরলিপির চিহ্নাবলী'; এবং যেসব চিহ্ন ব্যবহার করেন তা বিশেষ-ভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলা গীতিনাট্যের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যের কিয়দংশের স্বরলিপি প্রকাশ করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক এই আকার-মাত্রিক স্বরলিপি উদ্ভাবনের পর অনেক কাল কেটে গিয়েছে। অনেক সংগীতশিল্পী ও সংগীতবিজ্ঞানী তার পরে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে পদ্ধতিটি দিয়ে গিয়েছেন, এ পর্যন্ত তার কোনো পরিবর্তন হল না। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই আকার-মাত্রিক পদ্ধতিই প্রচলিত আছে। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেন স্বরলিপির চরম কথাটিই বলে গিয়েছেন। এর চেয়ে সহজ প্রণালী আর হয়তো নেই। কোনো রকম জটিলতার মধ্যে না গিয়ে কেবল ছাপাখানার সাধারণ টাইপ ব্যবহার করে স্বরলিপি ছাপানোর এই সহজ পদ্ধতির উদ্ভাবন যিনি করেছেন, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সংগীত ও স্বরলিপি নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের কাছে এর জন্যে তাঁরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ।

ব্রহ্মসংগীত ও অন্যান্য বিবিধ সংগীত এবং জাতীয়-সংগীত তিনি রচনা

করেছেন এবং সেসব সংগীতে সুরও দিয়েছেন তিনি তাঁর জীবনের নানা পর্বে। কিন্তু সংগীতসাধনায় এই তাঁর চরম কথা নয়, চরম কাজও নয়।

সংগীত-সম্পর্কিত আর কি কি বিষয়ে তিনি উদ্যোগী ছিলেন, এবং বিভিন্ন সময়ে তিনি সেসব বিষয়ে কি কি কাজ করেছেন— সে বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

তিনি যে নূতন স্বরলিপিপদ্ধতি— আকার-মাত্রিক— উদ্ভাবন করলেন তা বিশদভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৯৭ সালের জুন মাসে বের করেন স্বরলিপি-গীতি-মালা। এতে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, দ্বিজেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচিত ১৬৮টি গানের আকার-মাত্রিক স্বরলিপি আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত একত্রিশটি গান আছে, তার মধ্যে দুইটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথের এবং একটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সম্মিলিত রচনা। এই স্বরলিপি-গীতি-মালা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক 'সংকলিত ও ব্যাখ্যাত'। বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা ডোয়ার্কিন অ্যাণ্ড সন এই স্বরলিপি-সংকলনটি প্রকাশ করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, গানের রাগ তান নির্দেশ ছাড়াও তিনি তাঁর নিজের উদ্ভাবিত পন্থা অনুযায়ী প্রত্যেক গানের লয় নির্দেশ করেছেন। লয়-নির্দেশ মাত্রামান (metronome) যন্ত্রের বীট (beat) অনুযায়ী দেওয়াই বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু সাধারণের পক্ষে মাত্রামান যন্ত্র সহজলভ্য নয় বলে তিনি সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য লয়-নির্দেশের নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাঁর প্রবর্তিত স্বরলিপি-পদ্ধতিটি যদি কেউ বুঝতে না পারেন তাহলে তিনি স্বয়ং তা বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন, তিনি 'শিক্ষার্থীর প্রতি' শীর্ষক ভূমিকায় লেখেন, "যদি কোনো শিক্ষার্থী স্বরলিপির কোনো অংশ ঠিক বুঝিতে না পারেন তাহা হইলে আমাকে পত্রের দ্বারা জানাইলে আমি তাহা বুঝাইয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। অথবা গ্রন্থস্থিত কোনো গান যদি মৌখিক শুনিতে ইচ্ছা করেন, কিংবা নিয়মিতরূপে গান শিক্ষা করিতে চাহেন তাহা হইলে তাহারও বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।"

এই উক্তিটি কেবল একজন সংকলকের নয়, গানকে তিনি প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন, এই উক্তি সেই সাধক-শিক্ষকের।

বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বর্তমানে গানের স্বরলিপি প্রকাশের সুবিধা হয়েছে এই নতুন পদ্ধতির প্রবর্তনের জন্যই। আমরা একটু আগে বলেছি, ছাপাখানায় যেসব অক্ষর বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কেবল সেইগুলির ব্যবহার দ্বারাই এই স্বরলিপি নির্মাণ করা যায়। এইজন্যেই সাময়িক পত্রিকার পাতায় স্বরলিপির আত্মপ্রকাশ এতটা সহজ হয়েছে। যাঁরা এইভাবে স্বরলিপি প্রকাশ করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের অজানিতে, এই স্বরলিপি প্রকাশের দ্বারাই এর উদ্ভাবকের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে চলেছেন।

স্বরলিপি-গীতি-মালা প্রকাশের প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংগীত ও স্বরলিপি প্রকাশনী একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন আরম্ভ করেন— বীণাবাদিনী। এই-জাতীয় মাসিক পত্র ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। এই কারণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্পাদিত এই বীণাবাদিনী মাসিক পত্রিকা সংগীত-বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্রিকা রূপে আখ্যাত করা যেতে পারে। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়— শ্রাবণ ১৩০৪ (জুলাই ১৮৯৭)। বীণাবাদিনীর তৃতীয় সংখ্যার শীর্ষে মুদ্রিত হয় এই ছত্র—

সাহিত্যসংগীতকলাবিহীনঃ সাক্ষাৎপশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ

পরবর্তী সংখ্যায় তৎস্থলে স্থান পায় এই শ্লোক—

বীণাবাদন তত্ত্বজ্ঞ রাগবিদ্যা-বিশারদঃ
মূর্চ্ছনাশ্রুতিসম্পন্নঃ মোক্ষমার্গঞ্চ গচ্ছতি

সংগীত-বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ, স্বরলিপিতে ব্যবহৃত চিহ্নের ব্যাখ্যা, নানা জাতীয় হিন্দী ও বাংলা গানের এবং গতের স্বরলিপি এবং পাঠকদের পত্র বীণাবাদিনী'তে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া, ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত কয়েকটি গানের স্বরলিপিও বীণাবাদিনী'তে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বছর-দুই চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভারত-সংগীত-সমাজের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন বলেই বীণাবাদিনী পরিচালনা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ভারত-সংগীত-সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মাথায় এসেছে ইতিপূর্বেই।

১৮৯৪ সালের মার্চ মাস থেকে ১৮৯৭ সালের প্রথম ভাগে অবসর গ্রহণ

পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল ছিল সাতারা। এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছুকাল মেজদাদার পুনার বাসায় অতিবাহিত করেন। তখন মরাঠি পণ্ডিতের কাছে মারাঠী ভাষা শিক্ষা করেন এবং তার ফলে মারাঠী ভাষা থেকে বঙ্গভাষায় বিভিন্ন রচনা অনুবাদ করেন। এই সময়ে তিনি পুনায় গায়ন-সমাজ দেখে কলকাতায় অনুরূপ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন, "উদ্দেশ্য— বাংলাদেশে সংগীতশিক্ষা, সংগীত-অধ্যাপনা, তাহার প্রচার এবং বাংলার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন"[৪]।

বীণাবাদিনীর প্রথম সংখ্যায়— শ্রাবণ ১৩০৪ (জুলাই ১৮৯৭)— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর এই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে লেখেন—

"কলিকাতা সংগীত-সমাজ।— উৎসাহদাতার অভাবে হিন্দু সংগীতের ক্রমশই অবনতি ও লোপাপত্তি হইতেছে। ইহার প্রতিবিধানার্থ সংগীত-সমাজ নামক একটি সভা যাহাতে আমাদের মধ্যে স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা ও উদ্যোগ চলিতেছে।.."

এই কথা লিখে তিনি পরিকল্পনাটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা দান করেন— সংগীত-সমাজের অধীনে সংগীত-শালা রাখা হবে সংগীতানুরাগীরা যাতে সপ্তাহে অন্তত একদিন মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন তার ব্যবস্থা হবে, এবং উৎকৃষ্ট যাত্রা কীর্তন কথকতার বন্দোবস্ত করা হবে— ইত্যাদি।

আমরা লক্ষ করে এসেছি যে, কোনো প্ল্যান বা পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সময় অতিবাহিত করতে পারেন না, সেই প্ল্যান অনুযায়ী অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করতে না পারলে যেন তাঁর শান্তি নেই। এ ক্ষেত্রেও তাই হল, বীণাবাদিনীতে কলিকাতা-সংগীত-সমাজের পরিকল্পনা পেশ করার অব্যবহিত পরেই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন এই সংগীত-সমাজ, একটু পরিবর্তন করে নাম দিলেন ভারত-সংগীত-সমাজ।

সমাজটি পরিচালনার জন্য করণীয় সব কাজই করা হল, কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হল, এবং শহরের বিভিন্ন ধনী ব্যক্তি মুক্তহস্তে এই সমাজ পরিচালনার জন্য চাঁদা দিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও চাঁদা দিলেন, এ সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'পিতৃদেব সম্বন্ধে তাঁর জীবনস্মৃতি'র এক জায়গায় বলেছেন, "যখন আমি সংগীত-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করি, সেখানে বিশুদ্ধ

সংগীতের চর্চা হইবে শুনিয়া তিনি ১০০০৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিতে আমাকে অনুমতি করেন।"[১]

কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে প্রথমে সমাজের অধিবেশন বসত। ক্রমে সব শ্রেণীর লোকই এর সভ্য হতে আরম্ভ করলেন। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় কাজও বেশ অগ্রসর হয়ে চলেছে, সমাজও তার ঘোষিত উদ্দেশ্য অনুসারেই কাজ করে চলেছে। কোনো গুণীব্যক্তি কলকাতায় এলে তাঁকে সমাজে নিয়ে আসা হত, এবং গানবাজনা হত। ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকেরা সকলেই এসে একত্র হতেন, এর দ্বারা তাঁদের মেলামেশার সুবিধেও হত। সবই হল, কিন্তু সচরাচর যা হয়ে থাকে এখানেও সেই অঘটন ঘটল, দলাদলি আরম্ভ হয়ে গেল। এবং তার পরিণামে মোকদ্দমা পর্যন্ত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দলের হার হল। কিন্তু তাতে তাঁর উৎসাহ যেন দ্বিগুণিত হল, নূতন বাড়ি ভাড়া করে সেখানে ভারত-সংগীত-সমাজ নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হল। এবার এর পৃষ্ঠপোষক হলেন কুমার মন্মথনাথ মিত্র। এইবার সংগীত-সমাজ দীর্ঘজীবী হয়।

সংগীত-সমাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনেকগুলি নাটক বিভিন্ন সময়ে অভিনীত হয়, যথা— অশ্রুমতী, পুনর্বসন্ত, বসন্তলীলা, ধ্যানভঙ্গ, হিতে বিপরীত, অলীকবাবু ইত্যাদি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভারত-সংগীত-সমাজের প্রথম সম্পাদক, পরে তিনি অন্যতম সভাপতি নির্বাচিত হন।

ভারত-সংগীত-সমাজের মুখপত্র-রূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর পর একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন— সংগীত-প্রকাশিকা। ১৩০৮ আশ্বিন (১৯০১ সেপ্টেম্বর) মাসে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটির ব্যয় নির্বাহের জন্যে ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর মাণিক্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা অর্থ সাহায্য করতেন। পত্রিকাটির শীর্ষদেশে এই শ্লোকটি লিখিত ছিল—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

সংগীত-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদির অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, এবং তানসেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ওস্তাদের

পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—

"আমাদের ভারতবর্ষই সংগীতকলার জন্মস্থান। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, এইখানেই সপ্তস্বর প্রথমে উদ্‌ভাবিত হইয়া পরে দেশবিদেশে প্রচারিত হয়। আমাদের সংগীত-পদ্ধতিতে, বিশেষত আমাদের রাগরাগিণীর স্বরবিন্যাসে ও মূর্তিকল্পনায় যেরূপ একটি কলানৈপুণ্য ও গুণপনা দেখা যায়, তাহা অন্য কোনো সভ্যজাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় কিনা সন্দেহ। এই সংগীতবিদ্যা আমরা কোনো জাতির নিকট হইতে ধার করিয়া পাই নাই— ইহা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। এইজন্য বলিতেছি, যাহাতে আমাদের পুরাতন সংগীতবিদ্যা ও সংগীতকলার বহুল প্রচার ও স্থায়িত্ববিধান হয় সে বিষয়ে শুধু সংগীতানুরাগী কেন স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির মাত্রেরই উৎসাহ প্রদান করা কর্তব্য।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার এ একটি নিদর্শন, এবং তাঁর স্বদেশচিন্তা যে ভারতচিন্তা এ তারও নিদর্শন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগীত-সমাজটি তাই বীণাবাদিনীতে প্রকাশিত প্রস্তাব-অনুযায়ী কলিকাতা-সংগীত-সমাজ নয়, ভারত-সংগীত-সমাজ নামেই অভিহিত তিনি করেছিলেন।

সংগীত-প্রকাশিকা পত্রিকাটি দীর্ঘকাল, আনুমানিক ১৩১৭ পর্যন্ত, ধরে চলেছিল।

গ্রন্থশেষে তাঁর রচিত গানের তালিকা দ্রষ্টব্য— পরিশিষ্ট ৪।

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি, প্রবাসী ১৩১৮ মাঘ

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি'

৩ সমালোচনী ১৩০৯ ভাদ্র

৪ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'

চিত্রসাধনা

আজ থেকে প্রায় অর্ধশত বৎসর আগে 'জনৈক শিল্পাসেবী' নামের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে কোনো এক ব্যক্তি লেখেন—

"শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রেখাঙ্কনশিল্পী। তাঁহার রেখায় প্রাণ আছে। সে প্রাণ তাঁহার রেখাঙ্কিত বিষয়সম্ভূত নহে— রেখারই সরু মোটা বাঁকা সোজা দাগের মধ্যে। সে দাগের প্রত্যেক অংশের তাৎপর্য আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে, স্থিতি এবং ব্যাপ্তি আছে; সে দাগের আরও শক্তি আছে— যাহা মনোযোগ আকর্ষণ করে, কেবলমাত্র সে রেখার প্রতি নহে; রেখার অন্তরালে যে সীমাহীনতা আছে, তাহারও প্রতি।

"কিন্তু কয়জন জানেন যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিল্পী? তিনি একাধারে নাটককার, সাহিত্যিক, বহুভাষাবিৎ, সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ, সদ্‌বন্ধু ইত্যাদি নানারূপে বিখ্যাত। যাঁহারা তাঁহার তাড়নায় কোনো-না-কোনো সময়ে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া তাঁহাকে sitting দেন নাই তাঁহারা জানেন না যে, এই মনস্বী পুরুষের ড্রয়িং-বুকের পাতায় পাতায় কত ব্যক্তির মুখাকৃতি তাঁহাদের অন্তর্নিহিত বিশেষত্বের জলন্ত ছাপ লইয়া বিদ্যমান। রেখা পদার্থটা অসত্য হইলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রেখাঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে যে সতেজ সত্য বিরাজিত তারা অনেক বিখ্যাত শিল্পীর বহুমূল্য চিত্রেও দুর্লভ।"[১]

এই কথাই একাধারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রসাধনার ভূমিকা এবং উপসংহার।

অতি সামান্য সূচনা থেকে একটি বৃহৎ ঘটনার অনুষ্ঠানের ব্যাপার আরও আছে। একটি ক্ষুদ্র বীজ যদি উর্বর মাটিতে উপ্ত হয় তাহলে যথাকালে তা বিরাট মহীরুহে পরিণত হতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রসাধনার সূচনাতেও এই রকম অতি ক্ষুদ্র বীজের সন্ধান আমরা পাই।

তখন তিনি হিন্দুস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স বারো কি তেরো। ক্লাসে বসে তিনি একবার তাঁর মাস্টার-মশায়ের একটা ছবি আঁকেন। মাস্টার-মশায়ের নাম জয়গোপাল শেঠ। তিনি যে মাস্টার-মশায়ের ছবি আঁকছেন তা কেউ টের পান না। কিন্তু যখন জানাজানি হল তখন ছবিটি নিয়ে নাকি

টানাটানি পড়ে যায়, কেননা ছবিটা হয়েছিল অবিকল আসলেরই অনুরূপ। ছবিটি নিয়ে টানাটানির কারণ হচ্ছে এই যে, মাস্টার-মশায়টি দেখতে ছিলেন একটু অদ্ভুতরকমের— যেমন রোগা তেমনি লম্বা, নাকটা গড়ুর পাখির মত সামনে বাঁকানো; তাঁর চালচলনও ছিল অস্বাভাবিক— দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে হাতের আঙুল মেলে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতেন, দেখতে লাগত হাড়গিলের মত।

এ বর্ণনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে দিয়েছেন। কিন্তু সেই নগণ্য ও জঘন্য ব্যক্তিটি যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পেন্সিলের আঁচড়ে বিখ্যাত হয়ে গেলেন, জয়গোপাল শেঠের তা জানা হল না।

কিন্তু জয়গোপাল শেঠের চিত্রই তাঁর প্রথম চিত্র নয়। প্রথম তিনি চিত্র আঁকেন এরও বছর-দুই আগে, অর্থাৎ তাঁর বয়স যখন দশ-এগারো। ব্যারিস্টার সত্যপ্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড সিংহ) মহাশয়ের পিতৃব্য প্রতাপনারায়ণ সিংহ তখন মণিরামপুরে আছেন। মেজদাদার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মণিরামপুরে যান। কেন যেন একদিন তাঁর প্রতাপনারায়ণের ছবি আঁকার ইচ্ছে হয়, এবং ইচ্ছাপূরণও তিনি করেন। ছবিটি দেখে সকলে তাঁর প্রশংসা করেন। তাঁর প্রথম আঁকা ছবির প্রশংসা শুনে তাঁর উৎসাহ হয়, তখন তিনি বাড়ির লোকদের ছবি এঁকে এঁকে হাত পাকাতে আরম্ভ করেন।

স্বাভাবিক অনুরাগ ও স্বাভাবিক ক্ষমতা -বলে তিনি প্রতিকৃতি-চিত্রণ আরম্ভ করেন কিশোরকালে। জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর এই অনুরাগ অক্ষুণ্ণ ছিল। নিজের মনের খুশিতেই তিনি চিত্র অঙ্কন করতেন। এইসব চিত্র যে প্রকাশের কোনো দরকার আছে, এমন কথা তিনি কখনো মনে করেন নি। আত্মীয়-অনাত্মীয় পরিচিত-অপরিচিত ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে অসংখ্য পেনসিল-স্কেচ তিনি করেছেন। নিজের সম্বন্ধে তিনি সব ব্যাপারেই উদাসীন, নিজের অঙ্কিত চিত্র-সম্বন্ধেও তাঁর ঔদাসীন্য তেমনি। তাঁর জীবদ্দশায় মাত্র তাঁর আঁকা কয়েকটি চিত্র প্রকাশিত হয়— তার 'মুখচেনা' প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১২৯২ বৈশাখ সংখ্যা বালক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজনারায়ণ বসু। উক্ত প্রবন্ধটি তাঁর প্রবন্ধমঞ্জরী গ্রন্থে (১৩১২) পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, এবং তৎসহ কয়েকটি চিত্রও সন্নিবিষ্ট আছে, সেখানে অন্যান্য কয়েকটি চিত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের

চিত্রও মুদ্রিত হয়েছে। এর পর ১৩১৮ ফাল্গুন সংখ্যা ভারতী পত্রে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিত্র এবং ১৩২০ বৈশাখ সংখ্যা· মানসী পত্রে প্রমথ চৌধুরীর চিত্র প্রকাশিত হয়। ভারতী পত্রে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী দেখে বিখ্যাত শিল্পী উইলিয়ম রোটেনস্টাইন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাতে, তাঁর কাছ থেকেই এই ছবি দেখে রোটেনস্টাইন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত আরও চিত্র দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ সে সংবাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে জানালে তিনি কয়েকটি খাতা পাঠিয়ে দেন। তার উত্তরে রোটেনস্টাইন জ্যোতিরিন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন—

11, Oak Hill Park, Frognal
Hampstead
Sep. 14. '12

My dear sir,

Let me thank you for your kindness in sending over the three books containing your drawings. As I expected from the reproductions I saw in an article on your brother, they are admirable. I know of few drawings which show at the same time so much sensitiveness of line and sincerity in characterisation, and there is a beauty and nobility in the expression you give to your sitters which it would be difficult to match. I do not know which I prefer, the drawings of the men or of the women. Your drawings of ladies remind me of the early drawing by Dante Gabriel Rossetti and the admirable drawings by the great French artist, Puvis de Chavanes. Indeed the books have been and still are a source of great delight to me, and all to whom I have shown them have had similar feelings regarding them. One or two of your sisters it has been my privilege to meet—. I need not speak of your brother Rabindranath, so dear to all of us here ; there is a beautiful drawing of his son and one of Kawagachi, whom I saw at Benares, I hope, with your permission, to get one or two of your

drawings reproduced here. If ever I return to India—a hope which is very near my heart— the privilege of your acquaintance will be one of the pleasures to which I shall look forward.

Your brother's presence among us is a great joy to us and his friendship I count as one of the great assets of my life. Once more let me thank you for your prompt response to my wish to see more of your work.

Believe me to be most faithfully yours

William Rothenstein.

রবীন্দ্রনাথও তাঁর জ্যোতিদাদার চিত্রের সমাদরে আনন্দিত হয়ে লেখেন।'—

"ভাই জ্যোতিদাদা,

"আপনার ছবির খাতা আমি Rothensteinকে দেখিয়েছি। তিনি এখানকার একজন খুব বিখ্যাত artist; তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বল্লেন, আমি তোমাকে বলছি, তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশে প্রথমশ্রেণীর ড্রয়িং যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হতে পারে। এতদিন যে, আমাদের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর হয় নি, এর মত এমন অদ্ভুত ঘটনা কিছু হতে পারে না। most marvellous, most magnificent—এই ত তাঁর মত। তিনি বলেছেন, এখানকার সব চেয়ে বিখ্যাত art criticকে তিনি এই ছবি দেখাবেন, এবং এর একটা ছোট সমালোচনা তিনি নিজে লিখবেন। Portfolioর আকারে একটা selection তোমাদের করা উচিত।… যেটা যথার্থ আপনার নিজের জিনিস এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চর্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত হতে দেওয়া উচিত হয় না। আপনার এ ছবি এখানে যাঁরাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করছেন। রোটেনস্টাইন খুব একজন গুণজ্ঞ লোক, এঁর মতে আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথমশ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত; এ কথাটা চাপা রাখলে চলবে না। ২৯ ভাদ্র ১৩১৯।

আপনার স্নেহের রবি"

১৯১৪ সালে রোটেনস্টাইনের উদ্যোগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত পঁচিশ খানি প্রতিকৃতির একটি সংগ্রহ° বিলাতে প্রকাশিত হয়।

Twenty-five Collotypes
from the Original Drawings by
Jyotirindra Nath Tagore
Hammersmith
Made & printed by
Emery Walker Limited
1914

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রে তিনি কতটা মুগ্ধ উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় রোটেন-স্টাইন তা মুক্তকণ্ঠে বলেছেন। চিত্রসংগ্রহ পুস্তকটি যোগাযোগের অভাবে এদেশে বিশেষ প্রচারিত হয় নি এবং এখন দুষ্প্রাপ্য, এইজন্যে এখানে ভূমিকাটির অধিকাংশ তুলে দেওয়া হল—

Two or three years ago I noticed, in a Bengali Review sent me by a friend, some small reproductions of what appeared to me to be remarkable drawings. When Mr. Rabindranath Tagore was in England last year I discovered they were done by one of his own brothers. He immediately wrote for some of the originals, and I recieved from the artist, Mr. Jyotirindra Nath Tagore, the generous loan of a number of his sketch books. Mr, Tagore is not an artist by profession. He has long been in the habit of making drawings of his friends and relations, for his own pleasure and interest, and these drawings seem to me to show just those qualities of concentration and sincerity which we should expect, but so rarely get from the amateur. The heads show a sensitiveness to form which is unusual. They seem to me also to be drawn with the most perfect naturalness. Here is neither pre-occupation with Western models nor a conscious attempt to follow a Mogul tradition. The drawings of Indian ladies are especially remarkable. The 17th and 18th centuries imposed so weak and characterless a

vision of woman on the European artist that one has almost to go back to Durer and Holbein to find such frank and sincere portraits as these. Seeing the extraordinary variety and interest of the life about them, I have always wondered why the younger Indian painters adopt both the subjects and the formulas of the Mogul and Rajput tradition.

This is probably a momentary phase in the growth of modern Indian painting and is clearly due to a gallant desire to resist the thoughtless adoption of bad European workmanship and trivial and stupid subject matter. But there is good European painting and drawing and no lack of noble vision, and the influence of these would perhaps not be harmful, though probably few, if any examples of this kind have reached India. If no vital school can be found on the conscious adoption of an alien style, it is not likely to be brought to life by the practice of conscious archaism. It is not art which produces art, but passion. Art is the cultivation of passion, which like all cultivation, demands infinite labour, skill and patience, as well as infinite will, if it is to bear ripe and wholesome fruit. Something of this passion I feel in the drawings of Mr. Jyotirindra Nath Tagore. It is of a simple and modest kind, but in each of the drawings one feels he was absorbed by the unique desire to express something of the delicacy of form and gravity of haracter of his sitter.

I know of few modern protrait drawings which show greater beauty and insight.

W. Rothenstein.

জহুরীই জহর চিনতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রের সমাদর হল একজন প্রখ্যাত শিল্পীর দ্বারাই। রোটেনস্টাইন তাঁর চিত্রকে Durer ও Holbein প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীর চিত্রের সঙ্গে তুলনীয় বলে ঘোষণা করলেন। এবং অবশেষে বললেন—

I know of few modern drawings which show greater beauty and insight.

এ প্রশংসা সামান্য প্রশংসা নয়।

কিন্তু একজন বিদেশী চিত্রকরের প্রশংসাই তিনি কেবল পান নি, আমাদের দেশের একজন সেরা চিত্রশিল্পীও এই চিত্র দেখে বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করেছেন, তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর পিতৃব্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নতুনকাকা বলেই ছেলেবেলা থেকে যাঁকে তাঁরা সম্বোধন করতেন, অবনীন্দ্রনাথ সেই নতুনকাকার ছবি সম্বন্ধে বলেছেন—

"এমনি গান বাজনা অভিনয় ধর্মকর্ম যখন যেদিকের পথ শৈশবে যৌবনে আমার সামনে খুলেছে সেই সেই পথের গোড়ায় আমি নতুনকাকা মশায়কে দেখতে পাই। কয়েক বছরের কথা, রাঁচীতে আর একবার তাঁর কাছ পেয়েছিলেম। তাঁর প্রথম প্রশ্ন হল— তোমার ছবির কাজ কেমন চলছে। তারপর নিজের আঁকা ছবির খাতা আমার হাতে দিয়ে বললেন, দেখ। এই ছবির সমস্ত খাতা মৃত্যুকালে আমাদের তিনি দিয়ে গেছেন—'নতুনকাকা-মশায়ের শেষদান'—এই কথাটি লিখে। এই ছবির খাতা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে আমার সেদিন মনে হল, কই, আমরাও তো ছবি আঁকি, কিন্তু ছেলেবুড়ো আপনার-পর ইতরভদ্র সুন্দর-অসুন্দর নির্বিচারে এমন করে মানুষের মুখকে যত্নের সঙ্গে দেখা এবং আঁকা আমাদের দ্বারা তো হয় না— আমরা মুখ বাছি। কিন্তু এই একটি মানুষ তিনি কত বড় চিত্রকর হবার সাধনা করেছিলেন যে, সব মুখ তাঁর চোখে সুন্দর হয়ে উঠল, কি চোখে তিনি দেখতেন যে বিধাতার সৃষ্টি সবই তাঁর কাছে সুন্দর ঠেকল, কোনো মুখ অসুন্দর রইল না। রূপবিদ্যার সাধনা পরিপূর্ণ না করলে তো মানুষ এমন দৃষ্টি পায় না!"[৪]

যে শিল্পী তাঁর চোখের সমস্ত জাদু দিয়ে পৃথিবী দেখেছেন, যে শিল্পী তাঁর তুলির সমস্ত জাদু উজাড় করে চিত্ররচনা করেছেন, সেই শিল্পী-অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'রূপবিদ্যার সাধনা পরিপূর্ণ না করলে তো মানুষ এখন দৃষ্টি পায় না!'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রসাধনা হচ্ছে এই রূপবিদ্যার সাধনা। সব জিনিসের মধ্যেই তিনি সুন্দরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, এই জন্যে তিনি মুখ বাছেন নি—

রাজামহারাজা থেকে আরম্ভ করে একজন সামান্য পাঙ্খাপুলারের চিত্রও তিনি অঙ্কন করেছেন। আসল শিল্পীর পরিচয় বুঝি এইখানেই।

একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর একটি মাত্র চিত্র বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্রপত্রিকায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে— এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা ; বিহারীলালের আর কোনো চিত্র নেই।

'নতুন কাকামশায়ের শেষদান' রূপে তিনি তাঁর যাবতীয় চিত্র গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে যান। এইজন্যে চিত্রগুলি রক্ষা পেয়েছে বলা যায়। চিত্রগুলির অধিকাংশ রবীন্দ্রভারতীর সংগ্রহে আছে। গ্রন্থশেষে তার একটি তালিকা দেওয়া হল— পরিশিষ্ট ৫।

১ মানসী ১৩২০ বৈশাখ

২ মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পত্র 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

৩ যোগাযোগের অভাবে এই গ্রন্থটি এদেশে তেমন প্রচারিত হয়নি। এখন সংগ্রহ করাও কঠিন। এর থেকে কয়েকটি চিত্র পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এই দুইটি পত্রিকায়—বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৫০ "অবনীন্দ্রনাথ", কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ "সৌদামিনী দেবী"। VISVA-BHARATI QUARTERLY, November 1940 "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর"।

৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর', বঙ্গবাণী ১৩৩২ আষাঢ়।

বিভিন্ন কর্মোদ্যম

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্টিমার-পরিচালনার বিষয় আমরা আলোচনা করেছি। স্টিমার-পরিচালনায় আত্মনিয়োগের পূর্বে তিনি কিছুদিন অন্য ব্যবসায় করেছেন। ব্যবসায়-চালনার জন্যে যে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দরকার তা তিনি লাভ করেছেন সম্ভবত জমিদারি-পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে।

তাঁদের জীবনের সেই বাল্যলীলার— সেই অদ্ভুতনাট্য নিয়ে অট্টহাসির— যুগ পার হবার পর, ১৮৭২ সালে তাঁর নিজস্ব রচনা 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রকাশিত হয়। এই প্রহসনটি প্রকাশিত হওয়ার পরই তিনি পিতা কর্তৃক নিযুক্ত হন জমিদারি-পরিদর্শনে। তৎপূর্বে জমিদারি-সংক্রান্ত অনেক কাজ নিজ হস্তে তাঁকে শিক্ষা দেন দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর সেই অদ্ভুতনাট্যের অন্যতম সঙ্গী গুণেন্দ্রনাথের সঙ্গে জমিদারির কাজের ব্যাপারে কটকে যান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। কিন্তু এই কাজের ফাঁকেই তিনি সেখানে থাকাকালেই রচনা করলেন তাঁর জীবনের প্রথম নাটক পুরুবিক্রম (১৮৭৪)।

এই মানুষটির বিষয় চিন্তা করলেই আমাদের মনে হয় রবার্ট লুই স্টিভেনসনের ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইডের কথা— একটি শরীরের মধ্যে দ্বিবিধ প্রাণীর অস্তিত্বের কথাটা। তিনি কর্মের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রেখেও যেন আত্মমগ্ন। ডক্টর জেকিলের মত তিনি তাঁর সাধনার ল্যাবরেটরিতে বসে সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করছেন এবং গবেষণালব্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা নির্মাণকার্য সম্পাদন করছেন; অকস্মাৎ যেন বদল হয়ে যাচ্ছে তাঁর মূর্তি ও মেজাজ— তিনি প্রবল বিক্রমে ল্যাবরেটরির জাঙাল ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেকে মুক্তপুরুষ বলে ঘোষণা করছেন— যেন বলছেন, এখন তিনি মিস্টার হাইড। হাইড সৃষ্টি করেছিল ত্রাস, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই মূর্তিতে আমরা পাই অন্য জিনিস, পাই তাঁর আত্মবিশ্বাস। তিনি জাতশিল্পী, তাই বলে অকর্মণ্য তিনি নন— তিনি যে জন্ম-কর্মীও এ বিশ্বাসও তাঁর ছিল। তাই সাহস ছিল অফুরন্ত। তিনি ব্যবসায়িক কাজেও নিজেকে যুক্ত করে দিতে কুণ্ঠিত হন নি।

হাটখোলায় পাটের আড়ৎ খুললেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

এই সময়টা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম কর্মবহুল সময়। এই সময়ে

(১৮৭৭) তিনি 'সঞ্জীবনী সভা' নিয়ে ও ভারতী পত্রিকা প্রকাশ বিষয়ে খুবই কর্মব্যস্ত। এই সাহিত্যিক ব্যস্ততার মধ্যে সাহিত্যবহির্ভূত বিষয়েও তাঁর উৎসাহের পরিচয় স্বরূপ এইখানে এই কাজের কথা বলা দরকার।

আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে, ভারতীর জন্য রচিত প্রবন্ধাদি নিয়ে জানকীনাথ ঘোষালের রামবাগানস্থ গৃহে গিয়ে দল বেঁধে আলোচনা হত। জানকীনাথ তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একজন খ্যাতিমান কর্মী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যেও স্বাদেশিকতা কতটা প্রবেশ করেছে হিন্দুমেলার পর 'সঞ্জীবনী সভা'র কার্যধারা থেকে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। বাঙালিও যে ব্যবসা করতে জানে ও পারে— এই কথাটি প্রমাণ করার জন্যে এই কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। বস্তুত, তিনি ব্যবসায়-বুদ্ধিতে পাকা না হয়েও এই কাজে নামতে যে সাহসী হয়েছেন, তার মূলে আছে তীব্র স্বাদেশিকতা। এর প্রমাণ অচিরেই আমরা পাব।

পাটের ব্যবসায়ে তিনি সহযোগী রূপে পেলেন ভগ্নিপতি জানকীনাথকে। এই ব্যবসায়ে কতটা যোগ্যতা দেখাতে পেরেছিলেন সে খবর পাওয়া যায় না, কিন্তু বাংলার পণ্য নিয়ে বাণিজ্য করে বাংলার সন্তান যে ক্ষতিগ্রস্ত হন নি তা জানা যায়। এই কাজ বেশি দিন তিনি করেন নি। পাটের বাজার খারাপ হওয়ায় অল্প দিন পরেই আড়ৎ বন্ধ করলেন, কিন্তু হিসেব করে দেখা গেল লাভ নেহাত মন্দ হয় নি।

তখন তিনি আঠাশ-উনত্রিশ বয়সের যুবক। এই সাফল্যে উল্লসিত হয়ে তিনি কর্মের উদ্যম পরিহার করলেন তো নাইই, নূতন কর্মের প্রেরণাই বুঝি পেলেন। তিনি আরম্ভ করলেন নীলের চাষ। শিলাইদহে।

জমিদারি কাজে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছে ইতিপূর্বেই। তিনি শিলাইদহ-কুঠিতে বাস করতেন এবং পাবনা কুষ্টিয়া অঞ্চলে জমিদারি দেখাশুনা করে বেড়াতেন। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। বিষয়কর্ম নিয়ে তিনি ব্যস্ত থাকেন, তারই ফাঁকে ফাঁকে খোঁজেন আত্মবিনোদনের উপাদান। বাঙালি ছেলেদের মধ্যে সৎসাহস সঞ্চার করার জন্যে বন্দুক-ছোঁড়ার অভ্যাস তিনি অনেককে করিয়েছেন। সেই বন্দুক নিয়ে নিজেই শিকারে বের হওয়ার ইচ্ছে তাঁর জাগে। এইজন্যে জমিদারির লোকজনদের বলে দিতেন কোনো

শিকারের খোঁজ থাকলে যেন তাঁকে জানানো হয়। একদিন কাছেরই জঙ্গলে একটি বাঘের আগমনসংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দু-নলী বন্দুক হাতে নিয়ে রওনা হলেন। এবং বাঘ শিকার করে মৃত বাঘটি নিয়ে আসেন কাছারি-বাড়িতে। তাঁর জীবনস্মৃতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও এই ঘটনার কথা বলেছেন, "সেই আমার বাল্যবয়সে একদিন শিলাইদহে যখন খবর আসিল যে গ্রামের বনে একটা বাঘ আসিয়াছে, তখন আমাকে তিনি শিকারে লইয়া গেলেন ;•• বনের বাহিরে জুতা খুলিয়া একটা বাঁশগাছের আধ-কাটা কঞ্চির উপর চড়িয়া জ্যোতিদাদার পিছনে কোনোমতে বসিয়া রহিলাম।"[১] এ গেল পদব্রজে বাঘ শিকার। হাতির পিঠে চেপে ব্যাঘ্রশিকারে বহির্গত হয়েছেন তিনি, এবং বাঘের নিকটবর্তী হওয়া মাত্র বাঘটি লাফ দিয়ে কিভাবে পালিয়ে গেল তার বর্ণনাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং দিয়েছেন তাঁর জীবনস্মৃতিতেই। এবং হাতিতে চড়ে নিয়মিত শিকার করার ইচ্ছায় তিনি তাঁদের অশিক্ষিত হাতিকে শিকারী হওয়ার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে গিয়ে বিষম বিপদে পড়েছিলেন ; তার পিঠে চেপে বন্দুক ছোঁড়া মাত্র আওয়াজে ও গন্ধকের গন্ধে নিরীহ হাতিটি উন্মত্ত হয়ে উঠে তার সুবিপুল অঙ্গটি এমন ভাবে আন্দোলন করতে আরম্ভ করল যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিঠে বসে থাকতেও পারেন না, নামতেও পারেন না ; অবশেষে বিষম ঝুঁকি নিয়ে তিনি হাতিটির লেজ ধরে ঝুলে নেমে পড়েন। এই প্রসঙ্গের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন, "হস্তী তাহার নিজ হিত বুঝিল না, শিক্ষার মাহাত্ম্য বুঝিল না— সে ঘোর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।•• মূর্খ হস্তীকে শিখাইতে গিয়া আমিও এমনি হস্তীমূর্খ বনিয়া গিয়াছিলাম।"

শিলাইদহের সঙ্গে এই যোগ আছে। এখানে ও আশপাশের গ্রামে আগে অনেক নীলকর সাহেব বাস করত। শিলাইদহের নীলকুঠিটা তাঁদের জমিদারির কাছারি-বাড়িতে তখন পরিণত। তার পাশে ভাঙাচুরা অবস্থায় পড়ে ছিল কতকগুলো ভ্যাট— নীলের রস জাল দেবার পাত্র।

এইসব দেখে তিনি উৎসাহ বোধ করলেন। সেই ভ্যাটগুলো সারিয়ে নিয়ে আরম্ভ করলেন নীলের বাণিজ্য। হাতে তখন পাটের ব্যবসার মুনাফা আছে, সেই টাকা খাটাতে আরম্ভ করলেন এই নূতন কাজে। এ কাজে তাঁর

উৎসাহ কতটা ছিল তার সামান্য একটু পরিচয় পাওয়া যায় এর থেকেই যে, ঐ ভ্যাটে বা হাউজে জল আনার জন্যে পদ্মা থেকে তাঁর নূতন নীলকুঠি পর্যন্ত একটা খাল তিনি কাটালেন।

যে কাজে তিনি হাত দেন তা দীর্ঘস্থায়ী হোক বা না হোক, তার সাফল্যের জন্যে চরম চেষ্টা সব সময়ই তাঁর থাকে। এই কাজে তিনি নূতন, কোনো অভিজ্ঞতা তাঁর নেই, তৎসত্ত্বেও চার-পাঁচ বছর তিনি এই ব্যবসা করেন, এবং নীলের চাষে তাঁর উন্নতিও হয় খুবই।

কেবল ব্যবসা করা নয়, নীল-বাণিজ্যের ইতিহাস ও নীল-প্রস্তুতের পদ্ধতি তিনি বিশদ ভাবে পাঠ করেন। তাঁর এই অর্জিত জ্ঞান তিনি প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন, সেই সময়েই তিনি ভারতীতে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাতে উক্ত ইতিহাস ও উক্ত পদ্ধতি উল্লিখিত আছে; এবং উপসংহারে তিনি জানান যে ইউরোপীয়দের উদ্যম ও নৈপুণ্যের জন্যই তাহারা এই বাণিজ্য যেখানেই করেছে সেখানেই সফল হয়েছে— সে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ বা উত্তর-আমেরিকা হোক, অথবা ভারতবর্ষই হোক। তিনি স্বদেশপ্রাণ, তবুও তাঁকে বলতে হয়েছে যে, "অনেকে ক্রমাগত এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, ইংরাজেরা আমাদের দেশ হইতে অজস্র ধনরত্ন লুটিয়া লইয়া যাইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করেন। আমাদের লক্ষ্মী আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যে বিদেশীয়দিগকে আশ্রয় করিতেছেন, তাহার কারণই এই যে আমরা অযোগ্য, আমাদের নিজের দোষেই আমরা তাঁহার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।"[২]

ইউরোপীয়দের যে উদ্যম ও নৈপুণ্যের প্রশংসা তিনি করেছেন, তিনি নিজে তার অধিকারী ছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় নীলের বাণিজ্যে তাঁর লাভের কথায়। এ কাজেও তাঁর লাভ কম হয় না।

কিন্তু হঠাৎ নীলের বাজার পড়ে গেল। হঠাৎ নীলের বাজারে মন্দার কারণ হচ্ছে— জার্মানরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একরকম মেকী নীল তৈরি তখন আরম্ভ করেছে। এ সম্বন্ধে সে সময়ের 'নেচার' পত্রিকা লেখেন—"Prof. Baeyer succeeded, some years ago, in preparing indigo artificially, but the process was so expensive that it was not

likely to be of much practical importance. He has now, however, succeeded in effecting the synthesis in another way, by which he can not only produce the indigo much more cheaply but can produce it within the fibre of the material to be dyed. The arificial production of olizarin has already wrought a great change in the commercial reactions of the south of France, and if indigo be produced synthetically at a lower price than it can be grown, similar alterations may result in some parts of our Indian Empire."[২]

'নেচার' পত্রিকার ভবিষ্যদ্‌বাণী অবশেষে ফলল নীলের চাষ করে নীল প্রস্তুত করতে যে খরচ পড়ে তার অনেক কম খরচেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরি হল নীল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের আর-একটি কার্যের উপর যবনিকাপাত ঘটল, তাঁর জীবনস্মৃতিতে তিনি বলেছেন, "নীলের বাজার একেবারে খারাপ হইয়া গেল। আমিও কাজ উঠাইয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। যাহাই হউক, নীলে আমি বেশ লাভ করিয়াছিলাম।"

এবারেও মোটা মুনাফা হাতে, এইজন্যে তাঁর দুশ্চিন্তার শেষ নাই, "এখন এই টাকা লয়া আমি কি করিব— এই চিন্তা আমার মনে খুব প্রবল হইয়া উঠিল।"

কিন্তু উদ্যোগীর সুযোগের অভাব হয় না। কাজই যার কাছে জীবনতুল্য, জীবনধারণের প্রেরণার জন্যে কাজ এসে তাকে ধরা দেয়।

অনেক টাকা হাতে, এখন সেই টাকা নিয়ে কি করা হবে— এই ঘোরতর দুশ্চিন্তার হাত থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যে কাগজে বের হল একটি বিজ্ঞাপন। কাগজটির নাম 'এক্সচেঞ্জ গেজেট'। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে যে, একটি জাহাজের খোল নীলাম হবে।

বিজ্ঞাপনটি দেখা মাত্র তিনি স্থির করে ফেললেন যে, এই খোলটি কিনে তিনি জাহাজী কারবার করবেন। সে সময়ে কলকাতা থেকে খুলনা অবধি রেললাইন বসার কথা চলছে। তিনি মনে করলেন, খুলনা থেকে বরিশাল

পর্যন্ত এই জাহাজ চালাবেন। এই রকম চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটলেন রয়াল এক্সচেঞ্জে। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন ভিড়ের মধ্যে। নীলামের ডাক আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, সকলেই ডাকছে, তিনিও ডাক আরম্ভ করলেন। তাঁর সর্বোচ্চ ডাক সাত হাজার টাকায় নিষ্পত্তি হল। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে ঠকলেন কি জিতলেন তারও নিষ্পত্তি হয়ে গেল যখন তাঁর কাছ থেকে অনেকে বেশি দামে সেটি কিনবার প্রস্তাব করল। তাতে তিনি বুঝলেন তাঁর জিৎ হয়েছে। সেই আনন্দের উত্তেজনা নিয়ে, এবং বাংলায় বাঙালির দ্বারা জাহাজ-চালানো প্রবর্তন তিনিই করবেন' এই গর্ব বুকে পোষণ করে তিনি গৃহে ফিরলেন। — তাঁর মনের এই অবস্থার কথা তিনি তাঁর জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

গবর্নমেণ্টের জাহাজসমূহের এক ইঞ্জিনিয়ারকে তিনি এই খোলটি দেখালেন। এতে ভালো একটি স্টিমার তৈরি হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ বেড়ে গেল। তিনি বড় বড় জাহাজের কারখানায় ঘুরতে লাগলেন, অবশেষে কেল্‌সো নামে এক কোম্পানি স্টিমারটি তৈরি করে দেবার ভার নিল। ভার নিল বটে, কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দিতেও পারল না, জাহাজটা মজবুতও হল না। প্রায়ই বিগড়ে যেতে লাগল। অবশেষে এক ফরাসিকে পাওয়া গেল, জাহাজের কলকব্জা সে বোঝে। সেই হল কম্যাণ্ডার। জাহাজের নাম 'সরোজিনী'।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেল্‌সো কোম্পানি যদি জাহাজটি দিতে পারত, তাহলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুবিধে হত। কিন্তু জাহাজ পেতে তাঁর একটু দেরি হওয়ায়, ইতিমধ্যে ফ্লোটিলা কোম্পানি নামে এক জাহাজী কারবারী বিলাত থেকে এসে ঐ লাইনে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। বলা যায় না, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যদি সময়মত জলে জাহাজ নামাতে পারতেন, তাহলে ফ্লোটিলা কোম্পানি দূর দেশ থেকে এসে এই লাইনে জাহাজ চলছে দেখে সেখানে নাও আসতে পারত। কিন্তু তা হবার নয়। ফ্লোটিলা কোম্পানির জাহাজের সঙ্গে আসরে এসে নামল 'সরোজিনী'— ২৩ মে ১৮৮৪ তারিখে।[৭]

একই লাইনে দুটি কোম্পানি— একটি বিদেশী, একটি স্বদেশী। দুই কোম্পানিতে পাল্লা চলল খুব। মাত্র একটি স্টিমার নিয়ে এই প্রতিযোগিতায়

অসুবিধে হচ্ছিল বলে আরো চারটি জাহাজ কিনলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সে চারটির নাম 'বঙ্গলক্ষ্মী' 'স্বদেশী' 'ভারত' এবং 'লর্ড রিপন'। এই পাঁচটি জাহাজ খুলনা-বরিশাল যাত্রী বহন করত, এবং মাঝে মাঝে মাল নিয়ে কলকাতাতেও আসত।

স্বদেশী জাহাজ চলছে— বাঙালির জাহাজ চলছে; এতে বরিশালের লোকজনদের মধ্যে, বিশেষ করে ছাত্রসমাজের মধ্যে, খুবই উত্তেজনা আরম্ভ হয়েছে। ইংরেজ কোম্পানির জাহাজে না গিয়ে যাত্রীরা যাতে এই স্বদেশী স্টিমারে যায় তার জন্যে তাদের প্রবল উৎসাহ।

এই উৎসাহ ও উদ্দীপনার কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। "খুব ভোরে আমাদের জাহাজ এখান [বরিশাল] থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনায় যায়। ফ্লোটিলা কোম্পানির জাহাজও সেই সময় যায়। পাছে আমাদের জাহাজে লোক না গিয়ে প্রতিপক্ষের জাহাজে যায় এই জন্য কতকগুলি ভদ্রলোক ও স্কুলের ছাত্র রাত্রি ৪টার সময় উঠে দলবদ্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাজের ঘাটে প্রত্যহ উপস্থিত হন ও যদি কোনো যাত্রী প্রতিপক্ষের জাহাজে যেতে চায় তাকে অনেক প্রকার বুঝিয়ে এমনকি পায়ে পর্যন্ত ধরে ফিরিয়ে আনেন,·· তাদের বুঝাতে থাকেন,'·· দেশের টাকা দেশে থাকে এটা কি প্রার্থনীয় নহে?' ·· সেদিন আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এখানে একটি বৃহৎ সভা হয়েছিল। ··এখানকার হাকিম উকিল জমিদার দোকানদার মহাজন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।··· উৎসাহ দেখলে নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়— নিরুদ্যম হৃদয়েও উদ্যমের ভাব আসে।"[৫]

এই স্বদেশী উদ্যোগটিকে কেন্দ্র করে বরিশালে সেদিন জাতীয় সংকীর্তন পর্যন্ত হয়েছিল। এই স্টিমার চালনার দ্বারা দেশের মধ্যে স্বাদেশিকতা সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে এইটেই এক মস্ত লাভ।

প্রতিযোগিতা চলেছে খুবই তীব্রভাবে। উভয় পক্ষই ক্রমে ভাড়া কমাতে আরম্ভ করল। এতে লোকসান হচ্ছে দু-তরফেরই। এতেও কার হার কারজিৎ হত বলা শক্ত। কিন্তু সহসা একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। খুলনা থেকে মাল নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্টিমার 'স্বদেশী' কলকাতায় আসার সময় সারাপথ নির্বিঘ্নে এসে, ঘাটের পাষাণে ঘা খাওয়ার মত, হাওড়ার পুলের নীচ দিয়ে

যাওয়ার সময় জেটিতে ধাক্কা খেয়ে গঙ্গায় ডুবে গেল। সমস্ত মালসমেত ভরাডুবি হয়ে গেল। স্বদেশী কোম্পানির প্রতি দেশের লোকের এত শুভেচ্ছা ও উৎসাহ জলমগ্ন হয়ে গেল 'স্বদেশী'র সঙ্গে। জাহাজটি যেরকম ধাক্কা খেয়ে ডুবে গেল, তার চেয়েও প্রবল ধাক্কা নিশ্চয় লেগেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। কিন্তু এই প্রচণ্ড ঘা খাওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে কি করে ব্যবসা গুটিয়ে হার স্বীকার করবেন— এই চিন্তা করছেন। এমন সময় এল এক আপস-প্রস্তাব। দু পক্ষের এই ভাবে ভাড়া কমানোর পাল্লা দিয়ে লোকসান করে কি লাভ? প্রস্তাব নিয়ে এলেন প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (পরে রাজা)। ফ্লোটিলা কোম্পানি কারবার কিনে নিতে প্রস্তুত। এ সুযোগ না হারিয়ে তাঁর স্বদেশী স্টিমার কোম্পানি বিক্রি করে দিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। এই ঘটনার কথা তাই তাঁর স্পষ্ট মনে ছিল। এবং তৎকালে তিনি এ সম্বন্ধে লিখেওছিলেন।[১] তিনি পরে লিখেছেন, "দেশের লোক কলম চালায়, রসনা চালায়, কিন্তু জাহাজ চালায় না"— বোধকরি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল।.. স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন, সে খোল একদা ভরতি হইয়া উঠিল শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে— ঋণে এবং সর্বনাশে।"[১]

কিন্তু এ কথা ঠিক, এ ব্যাপারে যা ক্ষতি হয়েছে তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, কিন্তু যা লাভ হয়েছে তা জমা হয়েছে দেশের খাতাতেই— রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্যটির সঙ্গে সকলেই একমত।

দেশের লোকের এতে লাভই হয়েছে, তারা স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু এজন্যে তাদের ঋণও অবশ্য হয়েছে, সে ঋণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে।

অবশেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুগ্রহ এই যে, লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না।"

চিনতে পারেন কি না পারেন তা অবশ্য বলা কঠিন। কিন্তু চেনার চেষ্টা বুঝি থাকে। অন্তত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সে চেষ্টা ছিল। তার প্রমাণ তাঁর



"১ ও ২ সংখ্যক চিত্র দেখ, সুবক্তা মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের ছবিটি দেখ— ইঁহার চোখের নীচের পাতা কেমন ফুলো. ইহাতেই ইঁহার ভাষাশক্তি প্রকাশ পাইতেছে।"

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'মুখচেনা', বালক ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ



"ভুরু চোখের কাছাকাছি থাকিলে, চরিত্রের দৃঢ়তা গভীরতা একনিষ্ঠতা প্রকাশ পায়। [বামে] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি দেখ।"

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'মুখচেনা', বালক ১২৯২ শ্রাবণ

'মুখচেনা'। জাহাজের কারবার নিয়ে তখন তিনি মত্ত, কিন্তু তিনি তাঁর মনের ধর্মটি বজায় রেখেছিলেন, সাহিত্যের ও শিল্পের চর্চায় তখনও তিনি রত।

সত্যেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ১২৯২ সালের (১৮৮৫) বৈশাখ মাসে বালক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। —এই প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উক্ত সচিত্র প্রবন্ধ 'মুখচেনা'। যে আর্টের উপর নির্ভর করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই মুখচেনার বিষয়ে চর্চা ইংরেজিতে তাকে বলে ফিজিয়নমি— 'the art of judging character from the face or appearance'।

যখন জাহাজের কারবারে তিনি লিপ্ত, এবং যখন কার্যক্ষেত্রে কারো মুখ বা চেহারা দেখে তার চরিত্র তিনি হয়তো ধরতে পারেন নি, তখনও তিনি মুখ দেখে মানুষের স্বভাব নিরূপণের গবেষণায় নিজেকে মগ্ন করে রেখেছেন। বরিশালে ষ্টিমার চালাচ্ছেন, এবং "এ সময় আমি জাহাজেই বাস করিতাম"* বলে তিনি নিজে স্বীকারও করেছেন; তবুও তিনি যে সাহিত্য ও শিল্প-চর্চা তখন বজায় রেখেছেন এটা কম বাহাদুরি নয়। প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং নিজের বক্তব্য প্রকাশ করার জন্যে চিত্রও অঙ্কন করে নিয়েছেন। 'মুখচেনা'' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "কতকগুলি অক্ষর ও তাহার যোগাযোগে যত বাক্য হয় তাহা শিখিলে যেমন আমরা একটি ভাষা শিখিতে পারি, সেইরূপ মুখচিহ্ন দেখিয়াও আমরা মানুষের চরিত্র বুঝিতে পারি। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র এত বিভিন্ন যে তাহার অনুরূপ মুখের গঠনচিহ্নও অসংখ্য। তাহা আয়ত্ত করা সহজ নহে। সেইজন্য পণ্ডিতেরা এখনও ইহাকে বিজ্ঞানে পরিণত করিতে পারেন নাই।"

এ সত্ত্বেও মানুষের কপালকে নানা ভাগে বিভক্ত ক'রে, চোখ ভুরু ইত্যাদির শ্রেণীবিন্যাস ক'রে তিনি মনুষ্যচরিত্রের বিচার করেছেন। এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছে তার উদাহরণরূপে দাখিল করেছেন— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু। এবং নিজের আঁকা তাঁদের পেন্সিল স্কেচের দিকে পাঠককে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করেছেন। যথা, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি দেখ।"

এ গেল ফিজিয়নমির কথা, এ ছাড়া আরো অনেক খেয়াল তাঁর ছিল, তাঁর 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায় যে, অতিলৌকিক ব্যাপার উদ্‌ঘাটনের জন্যে তাঁর

আগ্রহ হয়। কোথাও কোনো গণৎকার বা ভবিষ্যদ্বক্তা এসেছেন জানতে পারলেই তিনি বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সেখানে ছুটতেন। কিন্তু তাঁদের বাণী শুনে যখন বুঝতে পারতেন যে সেই ভবিষ্যতের পনেরো আনাই ফাঁকি তখন তাঁর শখ মিটে যেত। প্লাঞ্চেটে তাঁর কিছু বিশ্বাস বুঝি হয়েছিল, যাঁরা এই জিনিসকে ব্যঙ্গ করে plain cheat বলেন তাঁদের সঙ্গে তাহলে তিনি একমত ছিলেন না, কেননা, প্লাঞ্চেটের কাণ্ড দেখে অনেক সময় তিনি নাকি আশ্চর্য হয়েছেন। কোষ্ঠীবিচারের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি যায়, কিন্তু তাঁর মতে "এ সমস্ত ব্যাপার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষিত হওয়া উচিত।"

তিনি সাহিত্য-সংগীত-চিত্রকলার সাধক, কিন্তু তাঁর এই উক্তি থেকে বোঝা যায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিও তাঁর ছিল। বস্তুত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে মাথা ঝালাই করে নিতে না পারলে মাথায় বুঝি ছিদ্র থেকে যায়, সেই ছিদ্রপথে অন্যান্য বুদ্ধি গড়িয়ে নেমে যাওয়া বিচিত্র নয়। ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের শিশুকাল থেকে বিজ্ঞানপাঠ দেওয়া হয়েছে— রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে এ কথা পরিষ্কার জানা যায়। এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের মত দার্শনিকও যে বিজ্ঞানচর্চা করেছিলেন এবং তাঁর মাথা সাফ ছিল— এ সংবাদও আমরা জানি। সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ তো বিজ্ঞানেরই ছাত্র। রবীন্দ্রনাথও শেষবয়সে 'বিশ্বপরিচয়' রচনা করেছেন।

যাই হোক, বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর মাথা সাফ করেছিলেন কিনা তা জানা না গেলেও, আমরা তাঁর আর-একটি বিষয়ে চর্চার কথা এখানে উল্লেখ করব। সেটি হচ্ছে ফ্রেনলজি— শিরোমিতি-বিদ্যা।

যে সময়ে জাহাজী কারবার করতে করতেই তিনি ফিজিয়নমি-চর্চা করে প্রবন্ধ লিখেছেন, সেই সময়েই তিনি পত্রান্তরে ফ্রেনলজি সম্বন্ধেও প্রবন্ধ লেখেন— এটিও সচিত্র[৮]।

ফ্রেনলজি-চর্চা এ দেশে আরম্ভ হয় ১৮৪৫ সালে। ঐ বছর ৭ই জুন তারিখে কয়েকজন বিদ্বান ও উৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় কলকাতায় ফ্রেনলজিকাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির সভ্য রাধাবল্লভ দাস ১৮৫০ সালের মার্চ মাসে 'ডাং ইশপর্জিম ও মেং কোম্ব সাহেব কৃত ফ্রেনলজি গ্রন্থ এবং

ফ্রেনলজিকাল চার্ট হইতে সার সংগ্রহ করিয়া' বাংলায় 'মনস্তত্ত্ব সারসংগ্রহ' গ্রন্থ প্রকাশ করেন[৯]।

যা-কিছু নতুন তার প্রতিই তাঁর আগ্রহ। এই মস্তিষ্কতত্ত্ব জিনিসটা তাঁর কাছে নূতন ছিল বলে এই দিকে তিনি আকৃষ্ট হন। এবং তিনি এ-বিষয়ে চর্চা করতে আরম্ভ করেন। অনেক বন্ধুবান্ধবের মাথা তিনি দেখে দিতেন। তিনি পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মাথা দেখে তাঁর স্বভাবের কথা যা বলেন পণ্ডিত মহাশয় স্বীকার করেছিলেন যে তার অনেক মিলেছে। কিন্তু তিনি যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ফ্রেনলজিতে তাঁর এত বিশ্বাস, কিন্তু এর সব বিচারই অভ্রান্ত কিনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন যে, মোটামুটি মেলে বটে, কিন্তু সব মেলে না।

পুরোপুরি না মিললেও এতে অনেক যে মেলে এও কম আকর্ষণের কারণ নয়। তাই দেখা যায়, তিনি তাঁর উক্ত প্রবন্ধ রচনার চৌদ্দ বছর পরেও ঐ বিষয়ে আলোচনা করেছেন— সাধনা পত্রিকায় আষাঢ় ১২৯৯ সংখ্যায় লিখেছেন—'আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেনলজি'।

এ সমস্তই মাথার রহস্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মস্তিষ্কও রহস্যে ভরা ছিল বলা যায়। যখন তাঁর মাথায় কোনো চিন্তা উদিত হত, তখনই তা তিনি কার্যে পরিণত করতেন।

তিনি বিবিধ শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করেছেন, কিন্তু কোনো ধরা বাঁধা নিয়মের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে শিক্ষালাভে উৎসাহ পান নি। এইজন্যে শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। খেলার মধ্যে দিয়ে পড়াই বুঝি অভিপ্রেত ছিল তাঁর।

তিনি বলেছেন, "আমার মতে প্রাথমিক শিক্ষা রামায়ণ-মহাভারতে যতটা হয়, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না।"[৬] 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' থেকে আমরা তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির কিছুটা আভাস পাই। এবং জানতে পারি দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ এই পদ্ধতি অনুমোদন করেছেন।

পদ্ধতিটি বিশেষ জটিল নয়, শিশুদের গান গাওয়া খেলা করা গল্প করার সঙ্গে সঙ্গে পড়ানো ও অঙ্ক শেখানো। যথা—

সম্মুখে ভারতবর্ষের মানচিত্র টাঙানো, তখন শিশুদের গাইতে বলা হয় তাদের পরিচিত গানটি—

দেশ দেশ ভাই আমাদের দেশ
সকল দেশের আগে সেই কোন্ দেশ
ভাই, আমাদের দেশ।
উত্তরেতে হিমালয় দক্ষিণে সাগর
পূবে দক্ষিণে ভাই পাহাড় মনোহর
ভাই, পাহাড় মনোহর।··

ইত্যাদি। এর দ্বারা শিশুদের ভূগোল শেখা হয়ই, সেইসঙ্গে নিজের দেশের আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গেও যেমন পরিচিত করা যায়, সেইসঙ্গে তাদের মনে স্বদেশপ্রীতিও জাগে।

এইরূপ অনেক গান রচনা করে তিনি শিশুদের দিয়ে গাইয়ে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এ পদ্ধতি কেউ গ্রহণ করুক বা না করুক— বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। এর দ্বারা, আর-কিছু না হলেও, আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, দেশের ছেলেদের সহজ পদ্ধতিতে এবং সংগীতের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের জন্যে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল।

এই পদ্ধতির সঙ্গে হয়তো আমাদের সেকালের সেই 'ঘোষাণো' পদ্ধতিটির মিল আছে। রাজনারায়ণ বসু যার উল্লেখ করেছেন এইভাবে, "তখন ঘোষাণোর রীতি ছিল। ঘোষাণোর অর্থ পয়ার ছন্দে গ্রথিত, কোনো দ্রব্য-শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত দ্রব্যের ইংরেজি নাম স্বর করিয়া মুখস্ত বলা। আপনি এক স্কুল দেখিতে গেলেন, স্কুলমাস্টার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ঘোষাব? গ্যার্ডেন (garden) ঘোষাব, না স্পাইস (spice) ঘোষাব?' ইহার অর্থ, উদ্যানজাত সকল দ্রব্যের নাম মুখস্ত বলাব, না, সকল মসলার নাম মুখস্ত বলাব? যদি স্থির হইল গ্যার্ডেন ঘোষাও, তবে সর্দার পোড়ো চেঁচিয়ে বলিল, 'পম্‌কিন (pumpkin) লাউ কুম্‌ড়ো'। অমনি সকলে বলিয়া উঠিল, 'পম্‌কিন—লাউ কুমড়ো।' সর্দার পোড়ো বলিল, 'কোকোম্বর (cucumbar) শসা'··এই সকল শব্দগুলি একত্র করিলে একটি কবিতা উৎপন্ন হয়—

পম্‌কিন লাউ কুমড়ো, কোকোম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বার্তাকু, প্লোমেন্‌ চাসা॥

কখনো কখনো সঙ্গীত আকারে ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা অর্থ বসানো হইত।..”[১০]

বাহ্যতঃ এই দুই পদ্ধতির মধ্যে মিল অবশ্যই আছে। কিন্তু ‘ঘোষাণো’টা কেবল তোতাপাখির মত মুখস্ত করানো ভিন্ন কিছু নয়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার মধ্যে মনের খুশির যোগসাধন করে বিষয়টি যাতে একেবারে মর্মমূলে গিয়ে পৌঁছয় তারই ব্যবস্থা করেছিলেন। এর সুফলও তিনি লাভ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের পৌত্র ও পৌত্রীর শিক্ষার ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর জীবনসায়াহ্নে রাঁচীর ‘শান্তিধামে’।

এই ধরণের শিক্ষণপ্রণালীর একটা মজা এই যে, লেখাপড়াটা যে একটা মস্ত কাজ এই সচেতনতা থাকে না, শিক্ষার্থীরা নিজেরা মনের খুশিতে থাকে এবং সেই খুশি প্রকাশ করার মধ্যে দিয়েই তাদের জানা হয়ে যায় বিবিধ জিনিস। এই ধরণের শিক্ষালয়টিকেও তাই একটা কঠিন কাঠামো দিয়ে গড়া কয়েদখানা বলেও মনে হয় না; মনে হয় বুঝি-বা খেলে বেড়াবার মতই একটা উন্মুক্ত প্রান্তর।

প্রান্তরের মত উদার ও উন্মুক্ত ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন। এইজন্যে কোনো নূতন হাওয়া এলে তা কোনো বাধার সম্মুখীন হয় নি। অবারিত ভাবে তা বয়ে চলেছে এই প্রান্তরের উপরে। তাঁর জীবনসায়াহ্নে তাঁকে আমরা শিক্ষাসংস্কারে ব্যস্ত দেখতে পেলাম। বস্তুত, তাঁর মন ছিল সংস্কার-প্রয়াসীই।

তাঁর যৌবনে আমরা তাঁকে সমাজসংস্কারে রত দেখতে পাই। সে-সময়ের মেয়েদের অবরোধ-ব্যবস্থার বিষয়ে আমরা অবহিত আছি। তখন কোনো মেয়ের লেখাপড়া শেখাটাই ছিল সমাজের পক্ষে এক ভয়ংকর ব্যাপার। সেই অবস্থার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই ব্যবস্থার জাঙাল ভেঙে যেন চুরমার করে দিলেন। তিনি “ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন। বৌঠাকুরানীকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন, এমন ঘটনাও সেদিন ঘটেছিল।”[১১]

নিজের অন্তঃপুরিকা স্ত্রীকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে পুরাতন কলকাতার রাজপথ দিয়ে এভাবে বেড়াতে বের হওয়া তখনকার দিনে কতটা বিস্ময়কর ঘটনা তা অনুমান করা যেতে পারে বর্তমান কালের এতটা সংস্কারবিহীন সমাজের সঙ্গে তুলনা করলেই। এখনকার কালের কোনো সাহসী পুরুষের পক্ষে সহসা এইভাবে সস্ত্রীক হাওয়া খেতে যাওয়ার কথা ভাবতেও আমাদের কেমন বিস্ময় লাগে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সাহস ও ভরসা পেয়েছিলেন তাঁর মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। সত্যেন্দ্রনাথ বিলাতি সমাজ দেখে এসেই পরিবারের মধ্যে আমূল সংস্কারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। তার উপর তাঁর কর্মস্থল বোম্বাইতে গিয়ে সেখানে 'নরনারীর মেলা'[১১] দেখে— বোম্বাইয়ে গিয়ে প্রথমেই তাঁর চোখে নতুন ঠেকে মেয়ে-পুরুষের একত্র মেলামেশা— "এই বিষয়ে কলিকাতা ও বোম্বায়ের মধ্যে ভয়ানক প্রভেদ। কলিকাতায় ভদ্রমহিলাগণ সকলেই অন্তঃপুরবাসিনী, বাহিরে কোথাও একটি কুলস্ত্রীর মুখ দেখিবার যো নাই। বোম্বায়ে পথে-ঘাটে যেখানে যাও ভদ্রমহিলা চোখের সামনে পড়ে।" এই নূতন জিনিসটি বঙ্গসমাজে প্রচলিত করার জন্যে তিনি সেকাজে অগ্রসর হওয়ার প্রথম ধাপ অনুসারে তা পরিবারে প্রবর্তন করার প্রয়াসী হন। অবরোধপ্রথা দূর করার জন্যে অগ্রজের একাগ্রতা[১২] দেখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এমন উৎসাহিত হন যে, যখন মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যেতে হলে ঘেটাটোপ-মোড়া পালকির সঙ্গে প্রহরী হাঁটে এবং গঙ্গাস্নানের অনুমতি পেলে বেহারারা পালকিসুদ্ধ মেয়েদের জলে চুবিয়ে আনে, সেই সময়ে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের পুরস্ত্রীকে তিনি করলেন ঘোড়সওয়ার।

এ তাঁর দুঃসাহসী মনেরই একটি চলন্ত চিত্র বিশেষ। তিনিও এ কথা স্মরণ করে জীবনসায়াহ্নে বলেছেন, "স্ত্রীস্বাধীনতার আমি এত বড় পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, গঙ্গার ধারের কোনো বাগানবাড়িতে সস্ত্রীক অবস্থানকালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্যন্ত শিখাইলাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়িতে আসিয়া দুইটি আরব ঘোড়ায় দুইজনে পাশাপাশি চড়িয়া, বাড়ি হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌছিয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত।••

সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। আমি তখন উদ্দাম নব্যভাবের নেশায় উন্মত্ত। এইরূপে অন্তঃপুরের পর্দা তো উঠাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের পর্দাটিও একেবারে উঠিয়া গেল।"[৬]

পাছে লোকে কিছু বলে— এই ভয়ে ভীত হলে কোনো নূতন কাজ করা যায় না। কিন্তু যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে"[১১] তাঁর পক্ষেই এরূপ কাজ কবা সম্ভব।

কিন্তু এই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই ঘটনার কিছুকাল আগে স্ত্রীস্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করে লিখেছিলেন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'। তাঁর এ কাজের জন্যে তিনি অনতিকাল পরেই অবশ্য দুঃখ ও অনুতাপ প্রকাশ করেন। এও অবশ্য মনের উদারতার লক্ষণ।

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি'

২ 'নীলের বাণিজ্য', ভারতী ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ

৩ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বে জাহাজ চালনায় একজন বাঙালির নাম পাওয়া যায়। "ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী কলিকাতা হইতে কাল্না পর্যন্ত যাত্রী ও মাল যাতায়াতের জন্য দুইখানি স্টীমার চালাইতেছেন প্রতি শনিবার ও বুধবার প্রাতে কলিকাতা ছাড়ে এবং রবি ও বৃহস্পতিবার কাল্না ছাড়িয়া থাকে।..." —সুলভ সমাচার, ২১ জুন ১৮৭৯। সাহিত্যসাধক-চরিতমালা ৬৮।

৪ দ্র° রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সরোজিনী-প্রয়াণ', ভারতী ১২৯১ শ্রাবণ-ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ।

৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বরিশালের পত্র', বালক ১২৯২ (১৮৮৫) শ্রাবণ। 'প্রবন্ধমঞ্জরী'।

৬ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'

৭ দ্র° জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রবন্ধমঞ্জরী'

৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিরোমতি-বিদ্যা', কল্পনা, ৪র্থ বর্ষ (১৮৮৫)।

৯ দ্র° সাহিত্যসাধক-চরিতমালা ৬৮।

১০ রাজনারায়ণ বসু, 'সে কাল আর এ কাল'

১১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা'

১২ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস'

১৩ দ্র° ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, 'পুরাতনী' : পরিশিষ্ট।

পরিশিষ্ট

১. অশ্রুমতী-প্রসঙ্গ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাগজপত্রের মধ্যে শ্রীইন্দিরা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত কতকগুলি পত্র—

ক.

Barabazar Library
203, Harrison Road, Calcutta.
the 25th September 1901

From Pandit Keshab Prasad Misra
Honourary Secretary to the Barabazar Library

To
Babu Jyotirindranath Tagore
Jorasanko

Dear Sir,

Myself and several prominent members of the Library have carefully gone through your book entitled 'Ashrumati' and find therein, to our great astonishment, that Maharana Pratap Singh, the greatest of the Hindu Sovereigns, had a daughter in the person of Ashrumati, who deeply fell in love with a Mahomedan Prince. Would you please let us know the source from which you have got your information in connection with it.

Yours truly
Keshab Prasad Misra
Hony, Secretary to the Barabazar Library.

খ.

Barabazar Library
203, Harrison Road, Calcutta.
the 30th September 1901

From Pandit Keshab Prasad Misra
Hony. Secretary to the Barabazar Library.

To
Babu Jyotirindranath Tagore

Dear Sir,

Whilst much admiring the style, direction and poetry of your drama 'Ashrumati' I am constrained to say that it is not proper to associate prominent historical characters with matters quite foreign to them. Everything has its limits, and even dramatic and poetical imagination with its great latitude is no exception to it. Considering the great regard which the Rajputs have for their religion and the spirit of exemplary independence possessed by the great Maharana Pratap Singh, the story of his alleged daughter, Ashrumati's love for the Mahomedan Prince Salim, based upon pure imagination, is a slur cast on the sacred memory of the Maharana, who has been highly revered by the Hindu Society. In the eyes of many persons reading the drama, the noble and lofty ideas and notions, rightly entertained and cherished by them, towards that great Rajput are apt to be sullied ; and in the interest of history and justice it is highly desirable that nothing should be done to lower him in the estimation of the Hindu Public. I trust that you will please see your way to stop either further publication of the book or to substitute some fictitious character in the place of the much esteemed name of Maharana Pratap Singh.

Yours truly
Keshab Prasad Misra
Hony. Secy. to the Barabazar Library.

গ. 'ভারতমিত্র' পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত পত্র

১ অক্টোবর ১৯০১

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত 'ভারতমিত্র' পত্রিকায় 'অশ্রুমতী'র যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহা আমি পাঠ করিলাম এবং তদ্বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা নিম্নে লিখিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া ইহার অনুবাদ কিম্বা মর্মার্থ 'ভারতমিত্র' প্রকাশ করিলে পরম বাধিত হইব।

মহারাণা প্রতাপ সিংহকে আমি আরাধ্য দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার কুলনিষ্ঠা, তাঁহার দেশভক্তি আমাদের আদর্শস্থল। চরিত্রের এই উচ্চ আদর্শ বঙ্গবাসীর সম্মুখে অর্পণ করাই এই নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি স্বীকার করি, 'অশ্রুমতী' বলিয়া প্রতাপ সিংহের কোনো কন্যা ছিল না। ইহা আমার কল্পনা মাত্র। আমার এইমাত্র বক্তব্য, এই নাটকে যে কল্পিত ঘটনাবলী যোজিত হইয়াছে তাহাতে প্রতাপ সিংহের চরিত্রগৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। যখন প্রতাপ সিংহ আসন্ন মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইয়া শক্ত সিংহের নিকট শুনিলেন যে সেলিম পাপ-হস্তে অশ্রুমতীকে স্পর্শ পর্যন্ত করে নাই, তখন তিনি তাহার প্রাণনাশ করিতে ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু অশ্রুমতীর মনেও পাছে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ হইয়া থাকে— এই আশঙ্কায় তিনি তাকে চিরকুমারী-ব্রত গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। ইহা অপেক্ষা অটল কর্তব্যনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

আর-এক কথা। যদি বলেন, রাজপুত-মহিলা হইয়া অশ্রুমতী কি করিয়া একজন বিধর্মী মুসলমানকে ভালবাসিল, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য এই— অশ্রুমতী অতি শিশুকালেই নিরুদ্দেশ হয় এবং বহুকাল ভীলদের নিকটে থাকায় এবং তাহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায়, নিজের কুলধর্ম-জ্ঞান তাহার মন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল; সে জানিত না— কে রাজপুত, কে মুসলমান। সেলিম তাহাকে দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে মনে করিয়া তাহার প্রতি প্রথমে সে কৃতজ্ঞ হয়, পরে সেই কৃতজ্ঞতা প্রেমে পরিণত হয়। ইহা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। এবং কি অবস্থায় পড়িয়া অশ্রুমতী

রাজপুত-মহিলার অযোগ্য কাজ করিয়াছিল তাহা যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে অশ্রুমতীকেও দোষ দেওয়া যায় না। আর-এক কথা, অশ্রুমতী সেলিমকে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল— শুধু ইহাতেই প্রতাপ সিংহের কুলে কলঙ্ক আসিতে পারে না। এবং মনে মনে ভালবাসাতেও যদি কিছু কলঙ্ক হইয়া থাকে, অশ্রুমতী চিরকুমারী-ব্রত-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করায় প্রতাপ সিংহ সে কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

এই নাটকের প্রতি লেখকের যেরূপ আন্তরিক বিদ্বেষ ও বিরাগ তাহাতে বলিতে সাহস হয় না, আর একবার যেন তিনি এই নাটকখানি ধীরভাবে পড়েন— আমার বিশ্বাস আর একবার ভাল করিয়া পড়িলে তিনি আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

এই নাটকে ঐতিহাসিক ভুল ও অসংলগ্নতা থাকিতে পারে; কিন্তু এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাণা প্রতাপ সিংহের উপর আমার যে শ্রদ্ধা-ভক্তি তাহা কাহারও অপেক্ষা কম নহে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘ. 'ভারতমিত্র' পত্রিকার সম্পাদকের চিঠি

The "Bharat Mitra Office,".
Established 1878, Telephone No. 137
97, Muktaram Babu's Street. Calcutta.
the 8th October, 1901.

To

Babu Jyotirindra nath Tagore
19, Store Road, Ballygunj. Calcutta.

Sir,

I cannot sufficiently thank you for your desire to amend the wrongs your work the "Ashrumati" has caused to the Hindus of Rajputana and Upper India. To err is no doubt human, but to admit it when shewn and correct it

when fully convinced are rare qualifications of great men only. By this noble sacrifice you have proved yourself worthy of this latter class. With these few words of thanks for your laudable wish, which will no doubt be brought into action in the near future

I remain
Yours ever faithfully
Balmukund Gupta
Editor "Bharat Mitra"

৬. কেশবপ্রসাদ মিশ্রকে লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্রের কিয়দংশ

মান্যবরেষু

আপনার ১৭ অক্টোবরের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার পত্রের উত্তর বাঙ্গালায় লিখিতেছি, কেননা, ইংরাজি ভাষায় আমার তেমন অধিকার নাই। তজ্জন্য আমাকে মার্জনা করিবেন।

কেহ কেহ মনে করেন, সেলিমের সহিত অশ্রুমতীর ভালবাসা হওয়ায় প্রতাপ সিংহের শুভ্র যশে কলঙ্ক পড়িয়াছে। কিন্তু আপনারা যদি প্রণিধান করিয়া নাটকখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া দেখেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন আমি এই ভালবাসার বিশুদ্ধতা বরাবর রক্ষা করিয়াছি শারীরিক স্পর্শে ইহাকে দূষিত হইতে দিই নাই।

চতুর্থ অঙ্ক ১৭৮ পৃষ্ঠা

"সেলিম।—দেখ যেন প্রতাপ সিংহ তার দুহিতাকে কলঙ্কিত না করেন— আমি শপথ করে বলচি ও পবিত্র দেহে আমার এই কলঙ্কিত পাপিষ্ঠ হস্তের কখন স্পর্শ পর্যন্ত হয়নি।"

বিবাহ হওয়া দূরে থাক্, শারীরিক স্পর্শ হয় নাই। এ অবস্থায় প্রতাপ সিংহের কুলমর্যাদার কি কোন হানি হইতে পারে?—বিন্দুমাত্র নহে।

পঞ্চম অঙ্কের ১৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি— উহাতে সমস্ত প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রতাপ সিংহ অশ্রুমতীকে বিষ খাওয়াইতে উদ্যত হইলে তাঁহার ভ্রাতা শক্ত সিংহ প্রবেশ করিয়া প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিলেন—

"প্রতাপ।—কি বল্লে শক্ত সিংহ? আমার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হয় নি?

শক্ত সিংহ।—না, মহারাজ হয়নি। সেলিম যে রকম যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন, তাতে কোন্ সরলা বালার মন আর্দ্র না হয়? কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানি—আর তরবারি স্পর্শ করে শপথ করতে পারি, সেলিম কর্তৃক অশ্রুমতীর কোনো অসম্ভ্রম হয়নি—শত্রু হলেও মুক্তকণ্ঠে আমার সে কথা স্বীকার করতে হবে—এ আপনাকে আমি শপথ করে বলচি—কোনও প্রকার কলঙ্ক অশ্রুমতীকে আজও পর্যন্ত স্পর্শ করেনি— আপনি সে বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন হোন।

প্রতাপ। আ! আ! শক্ত সিংহ! ভাই! তোমার কথায় তবু একটু আশ্বস্ত হলেম। অশ্রুমতী! এইদিকে এস। আমি যতদূর আশঙ্কা করেছিলেম, ততদূর বাস্তবিক নয় শুনে তবু নিরুদ্বিগ্ন হলেম। কিন্তু এখন আমার আর একটি কথা বলবার আছে—অশ্রুমতী, সেই কথাটি যদি রক্ষা কর, তাহলে আমি এখন সুখে মরতে পারি।

অশ্রু।—বল বাবা, আমি তা রক্ষা করব।

প্রতাপ।—পুরোহিত!

পুরোহিত।—মহারাজ!

প্রতাপ।—অশ্রুমতীকে নিয়ে গিয়ে এখনি মহাদেবের মন্দিরে যোগিনীব্রতে দীক্ষিত কর। চিরকুমারী হয়ে মহাদেবের ধ্যান করুক—মনেও যদি কোনো কলঙ্কস্পর্শ হয়ে থাকে তাও অপনীত হবে - যাও, নিয়ে যাও।"

তবে যাহারা মনে করেন, এই ভালবাসার কথা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাঁহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য পুনর্মুদ্রণের সময় এই বিষয়ে একটি ভূমিকা লিখিয়া দিব স্থির করিয়াছি। ইহা বুঝা উচিত, নাটক ও ইতিহাস এক জিনিষ নহে! কোনো দেশের কোনো নাটকেই ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষিত হয় না।

যদি কেহ বলেন, প্রতাপ সিংহের দুহিতা একজন মুসলমানকে ভালবাসিবে? —দেখুন কিরূপ অবস্থায় অশ্রুমতী মানুষ হইয়াছিল। সে জানিত না, রাজপুত কে মুসলমান কে? যে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল তাকেই সে ভালবাসিবে তাহাতে আশ্চর্য কি?

চ. ১৩২৭ সালে প্রকাশিত অশ্রুমতীর অষ্টম সংস্করণে গ্রন্থকারের 'কৈফিয়ৎ'

কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রাণা প্রতাপ সিংহের অশ্রুমতী নাম্নী কোনো কন্যা ছিল কিনা এবং অশ্রুমতী ও সেলিমের মধ্যে বাস্তবিকই কোনো প্রেমের ব্যাপার ঘটিয়াছিল কিনা। ইহার উত্তরে আমার নিবেদন -

রাণা প্রতাপ সিংহের একটি কন্যা আরাবল্লি পর্বতের অভ্যন্তরস্থ এক টিন-খনির মধ্যে হারাইয়া যায় এবং তত্রত্য ভীলগণ কতৃক পরিবর্ধিত ও প্রতিপালিত হয়। এইটুকুই ইহার ঐতিহাসিক কিংবা কিংবদন্তীমূলক ভিত্তি। বাকী সমস্তই কপোলকল্পিত। 'অশ্রুমতী' নামও মৎ-প্রদত্ত। এইরূপ নিরাশ্রয় বালিকার সৈনিকদিগের কবলে পতিত হওয়া অসম্ভব ঘটনা নহে। তাহার পর সেলিম উহাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, বিশ্বাস করিয়া সেলিমের প্রতি ঐ বিমূঢ়া সরলা বালা যে কৃতজ্ঞ হইবে এবং সেলিমের যত্নাতিশয্যে এ কৃতজ্ঞতা যে ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হইবে, তাহাতেও আশ্চর্য নাই। ইহা মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণাম। বলা বাহুল্য, স্থলবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে মানবপ্রকৃতির কিরূপ বিকাশ ও পরিণাম ঘটে তাহা প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য কার্য। কোনো মুসলমানের প্রতি হিন্দু ললনার অনুরাগের কথা শুনিয়া কেহ কেহ আঁৎকিয়া উঠেন। যেন এরূপ ঘটনা অত্যন্ত অস্বাভাবিক, যেন এরূপ কেহ কখনও শুনে নাই, যেন ইতিপূর্বে কোনো উপন্যাসেই এরূপ ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। তবে যদি কেহ বলেন, রাণা প্রতাপ সিংহের দুহিতাকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া রাণার শুভ্র যশকে কলঙ্কিত করা উচিত হয় নাই— তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য--যিনি অশ্রুমতী নাটক ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তিনিই জানেন, যাহাতে রাণা প্রতাপ সিংহের শুভ্র যশ কলঙ্কিত না হয়, যাহাতে অশ্রুমতীর বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্কের স্পর্শ মাত্র না থাকে, সে বিষয়ে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি ও যত্নবান হইয়াছি। যথা—

"প্রতাপ। কি বল্লে শক্তসিংহ? আমার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হয়নি?

শক্ত।—আমি বিলক্ষণ জানি, আর তরবারি স্পর্শ করে বলতে পারি, সেলিম কর্তৃক অশ্রুমতীর কোনো অসম্ভ্রম হয়নি—শত্রু হলেও মুক্তকণ্ঠে আমার এক কথা স্বীকার করতে হবে। এ আপনাকে আমি শপথ করে বলছি --

কোনও প্রকার কলঙ্ক অশ্রুমতীকে আজও পর্যন্ত স্পর্শ করেনি—আপনি সে বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন হোন।”

এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া প্রতাপ সিংহ বিষপ্রয়োগের আদেশ রহিত করিলেন বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্তে কঠোর যোগিনী-ব্রত পালনের আদেশ করিলেন।

“প্রতাপ সিংহ—ওর মনেও যদি কলঙ্ক স্পর্শ করে থাকে—আমি সে কণামাত্র কলঙ্কও ওর বিবাহ দিয়ে কুলপরম্পরায় প্রবাহিত করতে চাইনে।”

অতএব দেখা যাইতেছে, এইরূপ আদেশ করিয়া রাণা প্রতাপ সিংহ স্বকীয় শুভ্র যশকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, এবং অশ্রুমতীর আচরণ হইতে ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে—অশ্রুমতীর স্বর্গীয় প্রেমে কোনো পার্থিব কলঙ্কের স্পর্শমাত্র হয় নাই।

নিবেদক

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছ.

Bharat-Jiwan Office
Old Chowk, Benares City
29. 10. 1901

From
Ram Krishna Varma,
Commisson Agent,
Proprietor and Publisher, Bharat-Jiwan.

মান্যবর মহাশয়

আমরা হিন্দী-সাহিত্যসেবার নিমিত্ত প্রায় অন্যান্য ভাষা হইতে উত্তমোত্তম পুস্তকগুলির হিন্দী অনুবাদ করিয়া থাকি— অনেকগুলি পুস্তক এরূপ প্রকাশ করিয়াছি। আপনার রচিত ‘অশ্রুমতী’ নাটক আমি নিজ খরচে ছাপাইয়াছিলাম, কিন্তু কতিপয় পত্রে উহার কুৎসা রটাইয়া আমাকে বাধিত করিল যে ভবিষ্যতে যেন আর বিক্রয় না করি। তন্নিমিত্ত আমাকে প্রতুল অর্থহানি সহ্য করিতে হইয়াছে।

আপনার ‘সরোজিনী নাটক’ এক মহাশয় হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন— এ বহুদিনের কথা। বাজারে আর বই পাওয়া যায় না। এ

নিমিত্ত আমি অনুবাদককে লিখিয়াছিলাম—উনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পুনঃ ছাপাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু আমার প্রার্থনা যে যদি মহাশয়ও আজ্ঞা প্রদান করেন তাহা হইলে আরও উত্তম হইবে; কারণ ইহা প্রকাশ হইলে আপনার কীর্তি হিন্দী-সমাজেও প্রকাশিত হইবে। প্রতিউত্তর একান্ত প্রার্থনীয়।

বশম্বদ
শ্রীরামকৃষ্ণ বর্মা

পুনঃ

1. গাজীপুরের মোখ্‌তার লালা উদিত লালকে আপনি 'অশ্রুমতী' অনুবাদ-আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি নিজের খরচে ছাপাইয়াছিলাম।

2. 'সরোজিনী'র প্রথম অনুবাদে অনেক ভাষার দোষ রহিয়াছে, এবারে তাহাও শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। রাম

195, Cornwallis Street,
Nov. 30th, 1903.

সবিনয় নিবেদন,

আপনাকে অনেক দিন পত্র লিখি নাই, আপনার সহিত সাক্ষাৎও নাই। বোধ হয় ৺ কৃপায় আপনার কায়িক কুশল আছে। এ পক্ষের সকল কুশল জানিবেন।

একটি কথা বলিবার আছে, গত কল্যকার তারিখের 'রঙ্গালয়' পত্রে দুইটি প্যারা আছে উহাতে বাঙ্গালী গ্রন্থকারের দায়িত্বের কথা তুলিয়া আপনার 'অশ্রুমতী'র কথাও লেখা আছে। ব্যাপার এই যে, 'রাজস্থান সমাচার' নামক হিন্দী কাগজে এবং সেই সঙ্গে 'বেঙ্কটেশ্বর সমাচার' প্রভৃতি অন্য সকল হিন্দী কাগজে আপনার 'অশ্রুমতী'র কথা ধরিয়া বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন চলিতেছে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে অশ্রুমতীর অনুবাদ হইয়া উহার অভিনয়ও চলিতেছে। এই অভিনয়-কারণ লোকের মনে অনায়াসেই বাঙ্গালী-

বিদ্বেষ যেন দৃঢ়ীভূত হইতেছে। যে সকল হিন্দুস্থানী লেখক-বন্ধু বাঙ্গালীর পক্ষপাতী তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে বলিতেছেন যে, আপনি যদি সোজা মহারাণা উদয়পুরকে পত্র লিখিয়া ত্রুটি স্বীকার করেন এবং প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন যে, ভবিষ্যতে নূতন সংস্করণ করিতে হইলে অশ্রুমতীর ভাব পরিবর্তিত করিয়া দিবেন, তাহা হইলে বর্তমান কালের আন্দোলনটা একেবারেই নিভিয়া যায়। উদয়পুরের বর্তমান মহারাণা ফতেহ সিংহ বাহাদুর বড়ই যোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি আপনার স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাইলে জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগকে শান্ত রাখিতে পারেন। রাজস্থানে একটা ক্ষত্রিয়-সভা হইয়াছে। এই সভার সদস্য 'রাজওয়াড়ার'-সকল করদ নৃপতি; এই সভার প্রতাপও খুব। বাঙ্গালী-বিরোধের আন্দোলনটা এই সভাই গ্রহণ করিয়াছে। তাই আশু কুফল ফলিবে বলিয়া আমার আশঙ্কা খুব হইয়াছে। আপনি বাঙ্গালীর শিরোমণি, বাঙ্গালী জাতির মঙ্গলকামনা আপনি করিয়া থাকেন, বাঙ্গালী জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে আপনি নানাবিধ ত্যাগ স্বীকারও করিতে পারেন, বিশেষ, আমার আপনার উপর একটু আব্দার চলে; তাই সাহস করিয়া এত কথা লিখিতে পারিতেছি। সত্য বটে, নাটকের হিসাবে 'অশ্রুমতী'তে কোনো দোষ নাই, সত্য বটে নাটককারের সকল দেশেই যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে; সে স্বাধীনতার আপনি কোথাও অপব্যয় করেন নাই, তথাপি যখন একটা অছিলা ধরিয়া দুষ্ট হিন্দুস্থানী লেখকগণ বাঙ্গালী জাতির প্রতি বিষম বিদ্বেষের উদ্গার করিতেছে, তখন একটু সাবধান হইলে, একটু নরম হইলে বাঙ্গালীরই পক্ষে শ্লাঘার কথা হইবে, জানিবেন। আমি শুনিলাম যে, পূর্বে আপনি উদয়পুরের কোনো এজেন্টের নিকট স্বীকার পাইয়াছিলেন যে, অশ্রুমতীর নূতন সংস্করণে আপনি ভাব বদলাইয়া দিবেন। বোধ হয় হিন্দী বঙ্গভাষীতে ও ভারতমিত্রে এ কথা প্রকাশিতও হইয়াছিল। যদি আমার খবর ঠিক হয়, তাহা হইলে এমন অনুমান করা আমার পক্ষে অন্যায় হইবেনা যে, আপনি মহারাণা বাহাদুরের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া পত্র লিখিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। একখানি চিঠিতে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ভাষায় রাণা প্রতাপবংশাবতংস বর্তমান মহারাণা ফতেহ সিংহ মহোদয়ের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতে বোধ হয় আপনার সঙ্কোচ বোধ হইবে না।

বিশেষ যখন এইরূপ করিলে একটি প্রবল জাতিসম্প্রদায়ের amour propreর পুষ্টি হইবে এবং বাঙ্গালী জাতির সদ্ভাবের সূচনা করা হইবে, তখন আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি এ ব্যাপারে সঙ্কোচ করিতেই পারেন না।

মহারাণা বাহাদুরকে সরাসরি আপনি পত্র লিখিলে হয়ত তাঁহার হস্তগত না হইতে পারে। আপনি যদি ত্রুটি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন তো আমাকে বলিবেন, আমি যোগ্য লোকের দ্বারা আপনার পত্র 'খোলা দরবারে' মহারাণার হস্তগত করাইয়া দিতে পারিব; এবং যাহাতে আপনার মর্যাদানুসারে রাণা-দরবার হইতে পত্রোত্তর ও অভিবাদন আপনার হস্তগত হয়, সে পক্ষেও যথেষ্ট চেষ্টা করিব। আপনি জানিবেন যে, ত্রুটি স্বীকার করিলে হিন্দুস্থানী সমাজে তথা মহারাণার দরবারে আপনার মানসম্ভ্রমের বৃদ্ধিই পাইবে। আমি 'সাহিত্য-পরিষদে'র সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছি। যদি বাঙ্গালী বুধমণ্ডলীর পক্ষ হইতেও এই ব্যাপার লইয়া মহারাণার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির প্রতিষ্ঠা রাজস্থানে বাড়িয়াই যাইবে।

আমার পত্রের উত্তর দিবেন। যদি প্রয়োজন মনে করেন তো আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথা কহিতে পারি। অনেকদিন দেখাশুনা নাই, একবার দেখা করিলেও কোনো অ-লাভ নাই। ইতি ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩১০।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

খ. পত্রের খসড়া। পত্রটি প্রেরিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না

18, Store Rd, Balligunj,

To
H. H. the Maharana of Oodeypore etc. etc.

Your Highness,

It has been brought to my notice lately that a certain Bengali drama of mine called "Ashrumati", which was published by me about 25 years ago, has had the misfortune to incur the displeasure of a section of the Rajput

community, on account of an imaginary love-episode introduced by me between Ashrumati, a fictitious daughter of Rana Pratap Singh, and Selim, son of Akbar.

I beg to be allowed to tell you, who are the head of the Rajput, and the one who can claim to be most interested in the matter,—that nothing could have been farther from my thoughts than to cast the slightest slur on the illustrious fame of Pratap Singh, the hero of the whole of Hindusthan. On the other hand, I have endeavoured in my drama to portray his character in all its greatness and nobility.

The episode alluded to is slight enough in itself as your Highness may see for yourself it you deign to glance over the book, and is also purely imaginary. Nevertheless, if I have, however, unwittingly hurt the feelings of the Kshatriya Community of India in any way, all I can say is that I am exceedingly sorry—and that I am willing to do all that is possible for me to remove any misconception there may exist in this connection.

I have the honour
to be your most obidient servant.

ঞ. গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র

আপনার 'অশ্রুমতী' পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। 'সরোজিনী'র ন্যায় ইহাতেও ভাষার সরলতা ও মধুরতা এবং গল্পের রচনানৈপুণ্য প্রচুর পরিমাণে আছে। ইহাতে চিত্রিত চরিত্রগুলির স্ব-স্ব দোষগুণ সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতাপ সিংহের বীরোচিত স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও স্বদেশানুরাগ, শক্ত সিংহের ভ্রাতৃভক্তি, সেলিমের উদারতা ও ভীলজাতির সরলতা অতি উজ্জ্বলরূপে রঞ্জিত হইয়াছে। সরলভাবে বলিতে গেলে পৃথ্বিরাজের চরিত্রটি আমার তত ভাল লাগে নাই। তিনি কবি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু এত প্রণয়ে চপলতা ও মলিনার প্রতি এরূপ কর্কশ ব্যবহার কবির যোগ্য কোনো মতেই হয় নাই। প্রতাপ সিংহের কন্যা হইয়া

অশ্রুমতীর যবনের প্রতি প্রণয় হওয়া কতদূর যথাযোগ্য হইয়াছে তদ্বিষয়ে মতামত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার জীবনের পূর্ব বৃত্তান্ত মনে রাখিলে বিরুদ্ধ মতের অনেকটা খণ্ডন হইবে। তাঁহার শেষ সঙ্গীতটি অতি মনোহর হইয়াছে। যদিও তাহার ভিতর বাসনার আভাস কিছু কিছু পাওয়া যায় এবং সেটা যোগিনীর স্বভাবোচিত হয় নাই, কিন্তু তিনি কি অবস্থায় যোগিনীব্রতে দীক্ষিত হন তাহা স্মরণ রাখিলে এ দোষের অনেক লাঘব দেখা যাইবে। এ আভাসটুকু না থাকিলে তাঁহাকে দেবী বলিতাম, থাকা সত্ত্বেও নিষ্কলঙ্ক হতভাগিনী মানবী বলিয়া অশ্রুমতীর জন্য অশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকা যায় না।

মন্মথনাথ ঘোষ লিখিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থ থেকে পত্রগুলি সংকলিত

২. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-প্রসঙ্গ

ক. অনুবাদকের ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন—

লোকমান্য মহাত্মা তিলক তাঁহার প্রণীত গীতারহস্য বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ-ক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণকামনায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে, —অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরুভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি অনুবাদ শেষ করিয়া উহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায় এতদিনের পর উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া, আমার এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কেবল একটা আক্ষেপ রহিয়া গেল—এই অনুবাদ-গ্রন্থখানি মহাত্মা তিলকের করকমলে স্বহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্বেই তিনি ভারতবাসীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।

খ. এই গ্রন্থপ্রকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে দুই-একটি কথা এখানে বলা যায়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গীতারহস্যের উপক্রমণিকার কিয়দংশ অনুবাদ করে মাসিক পত্রে প্রকাশ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে সমগ্র গ্রন্থখানি অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন এবং লোকমান্য টিলককে অনুবাদ-প্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা করে পত্র লেখেন। ভারতবর্ষে এই গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য টিলক স্বয়ং প্রভূত অর্থব্যয়ে হিন্দী ও গুজরাটী সংস্করণ এবং তামিল তেলুগু ও কর্ণাটী সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বঙ্গভাষাতেও এর অনুবাদ প্রকাশ করাবেন। সুতরাং তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে লিখলেন—

বোম্বাই

২০শে অক্টোবর ১৯১৭

মহাশয়,

ইহার বহুপূর্বে আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, তজ্জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। উহার কারণ এই যে, আমি গত দেড় মাস এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম এবং আপনার পত্রের উত্তর দিতে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। এ ওজর কিছুই নহে তাহা জানি, কিন্তু ইহাই যথার্থ কারণ।

বাঙ্গালা ভাষায় আমার গীতাসম্বন্ধীয় গ্রন্থের অনুবাদ করাইবার নিমিত্ত আমি ব্যগ্র। কিন্তু বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রীয় উভয়বিধ ভাষাতে ব্যুৎপত্তি আছে এতাবৎকাল এরূপ কোনও পণ্ডিতের সন্ধান পাই নাই। গত এপ্রিল মাসে আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম এবং তখন শুনিয়াছিলাম যে আপনার এক ভ্রাতা গীতারহস্যের উপক্রমণিকার একটি বঙ্গানুবাদ একটি মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি তখন শুনিয়াছিলাম যে তিনি সমগ্র গ্রন্থখানি অনুবাদ করিবেন কিনা তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং আমি আর ঐ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান করি নাই; আমি মনে করিতেছিলাম আর কাহাকেও এই কার্যের ভার প্রদান করিব। এখন দেখিতেছি আপনি এ বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন, তখন আমার আর কোনও ভাবনা নাই, এবং অনুবাদ যে ঠিক মূলানুযায়ী হইবে তৎসম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত।

আমি যে অনুবাদককে তিন হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিব এ সংবাদ সত্য নহে। তবে প্রয়োজন হইলে অনুবাদের জন্য দুই হাজার টাকা ব্যয় করিতে এবং অনুবাদের স্বত্ব ক্রয় করিয়া নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিতে আমি প্রস্তুত আছি। হিন্দী ও গুজরাটী সংস্করণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধেও আমি ইহাই করিয়াছি এবং অধুনা যন্ত্রস্থ তামিল তেলুগু ও কর্নাটী সংস্করণের জন্যও ঐরূপ ব্যবস্থা করিতেছি।

আমার অভিপ্রায় এই যে, অনুবাদটি মূল মহারাষ্ট্রীয়ের ন্যায় বিষয়ের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় লিখিত হয়। আমি যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় বিষয়টির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যাহাতে আমাদের মেয়েরাও অনায়াসে সকল কথা বুঝিতে পারেন। অনুবাদটিও এইরূপ হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ, আমার ইচ্ছা অনুবাদের ছাপা ও বাঁধাই ঠিক মূলের অনুরূপ হয় এবং উহার মূল্য তিন টাকা মাত্র ধার্য হয়।

এই সকল শর্তে কার্য করিলে আমি অনুবাদ হইতে কিছুই লাভ করিতে চাহি না, বরঞ্চ অনুবাদককে সমস্ত ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। যদি তিনি অনুবাদ নিজ ব্যয়ে প্রকাশ না করেন, আমি অনুবাদককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া নিজে অনুবাদ-প্রকাশের সমস্ত ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছি। এ

পর্যন্ত যতগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই শেষোক্ত ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

এবিষয়ে সমস্ত কথাবার্তা স্থির করিবার পূর্বে উপরিলিখিত প্রস্তাবগুলির সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি। আগামী সপ্তাহে আমি ? পুণার ঠিকানায় (কেশরী অফিস, পুণা সিটি) পাঠাইবেন।

পত্রোত্তর প্রদানের বিলম্বের জন্য পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ভবদীয়

বালগঙ্গাধর টিলক

গ. বালগঙ্গাধর টিলকের আর-একটি পত্র

পুণা

২০শে ডিসেম্বর ১৯১৭

মহাশয়,

আগামী কংগ্রেসের জন্য আগামী ২৬শে হইতে ৩০শে পর্যন্ত কলিকাতায় থাকিব। তখন আপনার কোনও প্রতিনিধির সহিত গীতারহস্যের বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধিবর্গের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে আমি অবস্থান করিব। কংগ্রেস অনুসন্ধান কার্যালয়ে কিংবা অমৃতবাজার পত্রিকা কার্যালয়ে অনুসন্ধান করিলে আমার ঠিকানা অবগত হইতে পারিবেন। আপনার কোনও প্রতিনিধি বা বন্ধুকে আমার সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া বাধিত করিবেন।

ভবদীয়

বালগঙ্গাধর টিলক

মন্মথনাথ ঘোষ লিখিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থ থেকে পত্রগুলি সংকলিত

৩. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জী

গ্রন্থাবলী : কালানুক্রমিক তালিকা

১. কিঞ্চিৎ জলযোগ ॥ প্রহসন। ১৭৯৪ শক। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২

২. পুরুবিক্রম নাটক ॥ ১৭৯৬ শকাব্দা। ৯ জুলাই ১৮৭৪
এই নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে—১৮৭৯ সালে মুদ্রিত—
রবীন্দ্রনাথের গান 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩ সরোজিনী ॥ চিতোর-আক্রমণ নাটক। ১৭৯৭ শকাব্দা। ৩০ নবেম্বর ১৮৭৫।
এই নাটকের 'জ্বল্‌জ্বল্‌ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ' গানটি রবীন্দ্রনাথ-রচিত।

৪. এমন কর্ম আর করব না ॥ প্রহসন। আষাঢ় ১৭৯৯ শক। ৭ জুলাই ১৮৭৭
এই প্রহসনটি ১৯০০সালের এপ্রিল মাসে অলীকবাবু নামে পুনর্মুদ্রিত।

৫. অশ্রুমতী নাটক। শ্রাবণ ১২৮৬। ৪ নবেম্বর ১৮৭৯
এই নাটকের একটি গান 'গহনকুসুম-কুঞ্জমাঝে' রবীন্দ্রনাথ-রচিত।

৬. মানময়ী ॥ গীতি-নাটিকা। ১৮০২ শক। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ
এই নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ-রচিত এই কয়টি গান অন্তর্ভুক্ত—
ক. আয় তবে সহচরী
খ. ছিলে কোথা বলো
গ. চলো চলো, চলো চলো, চলো ফুলধনু।
১৮৯৯ সালে পুনর্বসন্ত নামে পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৭ স্বপ্নময়ী নাটক ॥ ১২৮৮ সাল। ২৪ মার্চ ১৮৮২
১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুমেলায় দ্বিতীয়বার পঠিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা—'দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর'— পরিবর্তিত আকারে এই নাটকের অন্তর্ভুক্ত।

৮. হঠাৎ-নবাব ॥ প্রহসন। মোলিয়েরের। ফরাসি থেকে অনুবাদ। বৈশাখ ১৮০৬ শক। ২৫ এপ্রিল ১৮৮৪

৯. হিতে বিপরীত ॥ কৌতুক-নাট্য। ২৬ বৈশাখ ১৩০৩। ৭ মে ১৮৯৬

১০. পুনর্বসন্ত ॥ গীতিনাট্য। ১ চৈত্র ১৩০৫। ১৪ মার্চ ১৮৯৯
১৮৮০ সালে প্রকাশিত মানময়ীর পরিবর্তিত রূপ।

১১. অভিজ্ঞান শকুন্তলা ॥ নাটক। কালিদাস। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩০৬ সাল। ১৮ অক্টোবর ১৮৯৯।

১২. বসন্ত-লীলা ॥ গীতি-নাটিকা। ১৩০৬ সাল। ২৯ মার্চ ১৯০০

১৩. ধ্যান-ভঙ্গ ॥ গীতি-নাটিকা। ১৩০৬ সাল। ১৫ এপ্রিল ১৯০০

১৪. উত্তর-চরিত ॥ নাটক। ভবভূতি। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭। ৭ জুন ১৯০০

১৫. অলীকবাবু ॥ নাটক। ১৯০০
১৮৭৭ সালে প্রকাশিত 'এমন কর্ম আর করব না'র নূতন সংস্করণ।

১৬. রত্নাবলী নাটক ॥ শ্রীহর্ষদেব। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
ভাদ্র ১৩০৭। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০০

১৭. মালতী-মাধব ॥ নাটক। ভবভূতি। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩০৭ সাল। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০০

১৮. মৃচ্ছকটিক ॥ নাটক। শূদ্রক। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
৮ মার্চ ১৯০১

১৯. মুদ্রা-রাক্ষস ॥ নাটক। বিশাখ দত্ত। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩০৭ সাল। ১০ মার্চ ১৯০১

২০. বিক্রমোর্বশী ॥ নাটক। কালিদাস। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩০৮ সাল। ৪ জুন ১৯০১

২১. মালবিকাগ্নিমিত্র ॥ নাটক। কালিদাস। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১ আষাঢ় ১৩০৮। ১৫ জুন ১৯০১

২২. মহাবীর-চরিত ॥ নাটক। ভবভূতি। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩০৮ সাল। ৮ অক্টোবর ১৯০১

২৩. চণ্ডকৌশিক ॥ নাটক। ক্ষেমীশ্বর। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩০৮ সাল। ৪ ডিসেম্বর ১৯০১

২৪. বেণীসংহার নাটক ॥ ভট্টনারায়ণ। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩০৮ সাল। ১৪ ডিসেম্বর ১৯০১

২৫. প্রবোধ-চন্দ্রোদয় ॥ নাটক। কৃষ্ণমিশ্র। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ। ১৩০৮ সাল। ২৪ মার্চ ১৯০২ .

২৬. নাগানন্দ ॥ নাটক। শ্রীহর্ষদেব। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ। ১৩০৯ সাল। ১ অগস্ট ১৯০২

২৭. দায়ে পড়ে' দার-গ্রহ ॥ প্রহসন। মোলিয়েরের। ফরাসি থেকে অনুবাদ। ১৩০৯ সাল। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০২

২৮ ভারতবর্ষে ॥ ভ্রমণকাহিনী। আঁদ্রে শেফ্রিয়োঁ। ফরাসি থেকে অনুবাদ। ১৩১০ সাল। ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৩

২৯. ঝাঁশির রানী ॥ জীবনী। মরাঠী থেকে অনুবাদ। ১৩১০ সাল। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৩

৩০ বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা ॥ নাটক। রাজশেখর। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ। ১৩১০ সাল। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৩

৩১. রজত-গিরি ॥ ব্রহ্মদেশীয় নাটক। ১৩১০ সাল। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪

৩২ ধনঞ্জয়-বিজয় ॥ নাটক। কাঞ্চনাচার্য। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ। ১৩১০ সাল। ৩ মার্চ ১৯০৪

৩৩ কর্পূরমঞ্জরী ॥ নাটক। রাজশেখর। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ। ১৩১১ সাল। ২৩ এপ্রিল ১৯০৪

৩৪ প্রিয়দর্শিকা। নাটক। শ্রীহর্ষদেব। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ। ১৩১১ সাল। ২৩ মে ১৯০৪

৩৫. ফরাসি-প্রসূন। গল্প ও কবিতা। ফরাসি থেকে অনুবাদ। ১৩১১ সাল। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪

৩৬ প্রবন্ধমঞ্জরী ॥ প্রবন্ধ-সংকলন। ১৩১২ সাল। ১২ অগস্ট ১৯০৫

সূচী ॥ ইংরেজি ও হিন্দু-সভ্যতা। ফের্ডিনা-ডে-লেসেপ এবং সুয়েজ খাল। ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। জীব-জগতের ক্রমাভিব্যক্তি। সৌন্দর্যতত্ত্ব। নিদ্রা, স্বপ্ন, মস্তিষ্ক ও আত্মা। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ও কলিকাতার ভূতত্ত্ব। রামিয়াড, বা উনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ। জাপানের বর্তমান উন্নতির মূল পত্তন। জাপানের বর্তমান

উন্নতি। ইংলণ্ডে স্বাধীনতার উন্নতি। জাতি ও বংশের উৎকর্ষ-সাধন। সমাজ-বিজ্ঞান। ইন্দ্রিয়-বিভ্রম। নীলের বাণিজ্য। জাতীয়তা ও বিজাতীয়তার উপদ্রব। জাতীয়তার নিবেদনে অনতিজাতীয়তার বক্তব্য। রুষীয় ভাষা ও সাহিত্য। মেঘনাদবধকাব্য। মনোবৃত্তির সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ। কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন। মারাঠী ও বাঙ্গালা। ভারতে নাট্যের উৎপত্তি। ভারতের নাট্যকলা ও রচনা-পদ্ধতি। আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেনলজি। সম্মোহন-তত্ত্ব। ভারতের দারিদ্র্য ও সাক্ষাৎবাণিজ্য। বৃত্তি-নির্বাচন। লোক-চেনা। তুকারামের অভঙ্গ। বসন্তরোগ। ফরাসি ও ইংরেজ। মুখ-চেনা। বরিশালের পত্র। বীর জননী। একটি অপূর্ব বাড়ী। বড়লোকের মা। যোগসিদ্ধজ্ঞান ও যোগানন্দ। আবেদন, না আত্মচেষ্টা। স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ। অপরাধীগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা। স্ত্রীপুরুষভেদে অপরাধের ন্যূনাধিক্য। ইংলণ্ডে অপরাধীর সংশোধন-পদ্ধতি। শিরোমিতি বিদ্যা। সঙ্গীত-কলা॥

সা র সং গ্র হ : জাপানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। বিংশতি শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অদ্ভুত কাণ্ড। স্ত্রীলোকের কাজ করা কেন উচিত নহে। ভাষাশিক্ষার রহস্য। ভৌতিক বিজ্ঞানের দুরাকাঙ্ক্ষা। যুদ্ধের অভিনব অস্ত্র। সার্বজনিক ব্যাঙ্ক। ভবিষ্য যুগের ইংরাজ মহিলা। দারিদ্র্য ও অপরাধ। জীবিত পশুর দেহচ্ছেদ। টেনিসনের ধর্মবিষয়ক মত। ইংরাজের উপর সূর্যতাপের প্রভাব। খ্রীষ্ট ধর্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম। হিন্দু বিজ্ঞান কিরূপে বিনষ্ট হইল। সাধারণ বিদ্যালয়ে কলাবিদ্যার শিক্ষা। অধ্যাপক টিণ্ড্যাল সম্বন্ধে স্পেন্সরের উক্তি। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে শ্রীমতী বেস্যাণ্টের মত।

৩৭. এপিক্‌টেটসের উপদেশ ॥ ইংরেজি থেকে অনুবাদ।
১৩১৪ সাল। ১৮ জুন ১৯০৭

৩৮. জুলিয়স্ সীজার ॥ নাটক। ইংরেজি থেকে অনুবাদ।
১৩১৪ সাল। ২৮ অক্টোবর ১৯০৭

৩৯. ইংরাজ-বর্জিত ভারতবর্ষ ॥ ভ্রমণকাহিনী। পিয়ের লোতি। ফরাসি থেকে অনুবাদ। ১২ মার্চ ১৯০৯.

৪০. মার্কাস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা ॥ ইংরেজি থেকে অনুবাদ। আষাঢ় ১৩১৮। ১২ নবেম্বর ১৯১১

৪১. সত্য, সুন্দর, মঙ্গল ॥ প্রবন্ধ। ভিক্টর কুজ্যাঁ। ফরাসি থেকে অনুবাদ। ২০ ডিসেম্বর ১৯১১

৪২. শোণিত-সোপান ॥ উপন্যাস। ফরাসি থেকে অনুবাদ। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭। ১৯২০

৪৩. অবতার ॥ উপন্যাস। গোতিয়ের। ফরাসি থেকে অনুবাদ। শ্রাবণ ১৩২৯। ১৯২২

৪৪. মিলিতোনা ॥ উপন্যাস। গোতিয়ের। ফরাসি থেকে অনুবাদ। বৈশাখ ১৩৩০। ৭ জুন ১৯২৩

৪৫ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র ॥ বালগঙ্গাধর টিলক। মরাঠী থেকে অনুবাদ। ১৯২৪

জীবনকথা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ॥ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত। ফাল্গুন ১৩২৬। ১৯২০

স্বরলিপি

স্বরলিপি-গীতি-মালা ॥ ১৩০৪ সাল। ১২ জুন ১৮৯৭

দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচিত ১৬৮টি গানের স্বরলিপি -সংকলন।

চিত্রসংগ্রহ

TWENTY-FIVE COLLOTYPES from the original Drawings of Jyotirindranath Tagore.

বিশিষ্ট ইংরেজশিল্পী রোটেনস্টাইনের ভূমিকা সম্বলিত। বিলাত থেকে প্রকাশিত। ১৯১৪

৪. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত সংগীত ॥ বর্ণানুক্রমিক তালিকা

সংকেতার্থ :

ব্রস্ব, কা — ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি, কাঙালিচরণ সেন

ব্রস্ব, সা — সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত নূতন ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি

ব্রহ্মসংগীত

অগণন ভুবন ভাবধারী ॥ নটনারায়ণ। ঝাঁপতাল। ব্রস্ব, কা ১

অগতির গতি অনাথনাথ হে তুমি ॥ ললিত-বসন্ত। সুরফাঁক্তা। ব্রস্ব, কা ২

অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে ॥ আলাইয়া। কাওয়ালি। ব্রস্ব, কা ১। ব্রস্ব, সা ১

অন্তরে ভজ রে তাঁরে ॥ ইমন-ভূপালী। চৌতাল। ব্রস্ব, কা ৫

অন্তরের ধন প্রাণরঞ্জন ॥ মাদ্রাজী সিন্ধু। কার্ফা। সঙ্গীত-প্রকাশিকা ১৩১৫ শ্রাবণ

আঁখিরঞ্জন ডাকি হে তোমারে ॥ গৌড়সারঙ্গ। আড়াঠেকা

আজ আনন্দে প্রেমচন্দ্রে নেহারো ॥ মিশ্র বেহাগ্। ঝাঁপতাল। ব্রস্ব, কা ১। ব্রস্ব, সা ৩

আজি বিশ্বজন গাইছে মধুর স্বরে ॥ খাম্বাজ। সুরফাঁক্তা। ব্রস্ব, কা ২

আদিনাথ প্রণব রূপ সম্পূরণ ॥ ইমন-কল্যাণ। সুরফাঁক্তা। ব্রস্ব, কা ২। ব্রস্ব, সা ২

আয় সবে মিলে যাই প্রভুর দ্বারে ॥ পঞ্চার। সুরফাঁক্তা। ব্রস্ব, কা ৪

আহা আজি পুলকে পূরিল দিক্ ॥ গৌরী। কাওয়ালি

এ কি এ মোহের ছলনা ॥ কাফি-কানাড়া। কাওয়ালি। ব্রস্ব, কা ২

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম ॥ সিন্ধু বিজয়। তেওরা। ব্রস্ব, কা ১

ও হৃদয়নাথ এস হে হৃদয়াসনে ॥ ধোরিয়া। আড়াঠেকা। ব্রস্ব, কা ৪

ওহে দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু তুমি ॥ বেহাগ। চৌতাল। ব্রস্ব, কা ২

কঠিন দুঃখ পাই হে মোহান্ধকারে ॥ কাফি-সিন্ধু। চৌতাল। ব্রস্ব, কা ৩

কত দিন গতিহীন ॥ নট-মল্লার। কাওয়ালি। ব্রস্ব, কা ৫

দশদিশি কিবা আজি মধুময় ॥ সাহানা। কাওয়ালি। ব্রহ্ম, কা ১
দেহি হৃদয়ে সদা শান্তিরস ॥ নিসাসাগ। ঝাঁপতাল। ব্রহ্ম, কা ১
ধন্য তুমি ধন্য, ভবজলধিতারণ ॥ দেওনট। ফেরতা। ব্রহ্ম, কা ৫। ব্রহ্ম, সা ৩
ধন্য তুমি হে পরমদেব ধন্য ॥ পরজবসন্ত। চৌতাল। ব্রহ্ম, কা ৪
ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী ॥ ঝিঁঝিট। একতাল। ব্রহ্ম, কা ৩। ব্রহ্ম, সা ৪
নিতি নূতন শোভা ॥ খাম্বাজ। কাওয়ালি। আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২২ আশ্বিন ও কার্তিক
নমঃ শংকরায় মহেশ ভবনায়ক ॥ ইমন-কল্যাণ। সুরফাঁক্তা। ব্রহ্ম, কা ১
নিরঞ্জন নিরাকার ॥ ভৈরবী। চৌতাল। ব্রহ্ম, কা ৫
পর্বতে পাথারে ব্যোমে ॥ কানাড়া। চৌতাল। ব্রহ্ম, কা ২
পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অলক্ষ্য নিরঞ্জন ॥ ইমন-কল্যাণ। চৌতাল। ব্রহ্ম, কা ৪। ব্রহ্ম, সা ৪
পরব্রহ্ম সত্য সনাতন অনাদি ॥ বেহাগ। সুরফাঁক্তা। ব্রহ্ম, কা ২
পরমদেব ব্রহ্ম জগজন পিতামাতা ॥ খাম্বাজ। একতাল। ব্রহ্ম, কা ২
প্রণমামি অনাদি অনন্ত সনাতন ॥ মাদ্রাজি ভজন। ফেরতা। ব্রহ্ম, সা ২
প্রেমদাতা দেখা দেও হে ॥ ভৈরবী। ঠুংরি
বলিহারী তব মহিমা ॥ নায়কী কানাড়া। কাওয়ালি। আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২২ আষাঢ়
বাজে সুতানে সুন্দর এই বিশ্বযন্ত্র ॥ সুরট। চৌতাল। ব্রহ্ম, কা ৪
বিঘ্নহরণ প্রভু শান্তিদাতা ॥ কর্নাটি তিলককামোদ। তেওরা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৪ শক শ্রাবণ
বিজন মন মন্দিরে বিরাজ ॥ সুরট-জয়জয়ন্তী। ঝাঁপতাল। ব্রহ্ম, কা ৬
বিমল উষায় তোমারি ॥ বহুলী। ঢিমেতেতালা। আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ
বিমল প্রভাতে মিলি ॥ ভৈরব। কাওয়ালি। ব্রহ্ম, কা ৫। ব্রহ্ম, সা ৫
বিমল-রজত ভাসে পূর্ণ করি ॥ বেহাগ। আড়াঠেকা

ব্যাকুল হয়ে তব আশে প্রভু ॥ খাম্বাজ। ধামার। ব্রহ্ম, কা ৪

ব্রহ্মন্, মোপর সদয় হও হে ॥ ইমন্-ভূপালী। তেওরা। ব্রহ্ম, কা ৩

ব্রহ্মসনাতন তুমি হে নিখিল-পালন ॥ বিহঙ্গড়া। সুরফাঁক্তা। ব্রহ্ম, কা ৬

ভব-ভয় হর প্রভু তুমি ॥ নট-নারায়ণী। কাওয়ালি। ব্রহ্ম, কা ৫

মন প্রাণ হৃদয় তাঁর পদে ॥ বেলাবলী। ঠুংরি। বীণাবাদিনী ১৩০৫

যোগী জগৎ-ত্যাগী কে বলে ॥ ছায়ানট। চৌতাল। ব্রহ্ম, কা ৪

শঙ্কর শিব সঙ্কটহারী নিস্তারো প্রভু ॥ খাম্বাজ। কাওয়ালি। ব্রহ্ম, কা ৩

শুনাও সেই দিব্যবাণী ॥ ভৈরবী। ঝাঁপতাল। আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২২ আষাঢ়

শুভ দিনক্ষণ শুভদিন এই মাসে ॥ সুখরাই কানাড়া। ঝাঁপতাল। ব্রহ্ম, কা ৪

শোভন গাও মনোহর ॥ মঙ্গল-ভৈরব। চৌতাল। ব্রহ্ম, কা ২

হরি তোমা বিনে কেমনে এ ভবে ॥ দেশ-মল্লার। ঝাঁপতাল। ব্রহ্ম, কা ৩

হৃদয়ের মম যতনেরি ধন ॥ বাহার। কাওয়ালি। ব্রহ্ম, কা ২

হৃদাসনে এসো হে এ শুভদিনে ॥ দেশকার। সুরফাঁক্তা। ব্রহ্ম, কা ১

হে অন্তরযামি ত্রাহি ॥ সিন্ধু। ঢিমাতেতালা। ব্রহ্ম, কা ১

হে দেব পরসাদ দাও হে ॥ দেশকার। ঝাঁপতাল। ব্রহ্ম, কা ৫

হে প্রাণারাম নিরঞ্জন ॥ শুক্লা-বেলাওল। চৌতাল। ব্রহ্ম, কা ৩

অন্যান্য গান

আর কি তারে পাব ॥ খাম্বাজ। মধ্যমান। স্বরলিপি গীতিমালা

আর কেন সে কথা তোলো ॥ বেহাগ। ঢিমা তেতালা। স্বরলিপি গীতিমালা

আহা কি চাঁদনী রাত হের লো সখি ॥ ভূপালী। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমালা

আহা কি রূপ হেরিনু মন মোহিল ॥ কেদারা। মধ্যমান। স্বরলিপি গীতিমালা

ও সখি, আমার কথা তায় বোলো না ॥ কামোদ। তেওট্। স্বরলিপি গীতিমালা

কি করি সজনি, সে বিনে কি হবে ॥ লুম-ঝিঁঝিট। ঠুংরি। স্বরলিপি গীতিমালা

কি সুধা ওই মদির নয়নে ॥ কেদারা। মধ্যমান। স্বরলিপি গীতিমালা

কি সুন্দর প্রভাত রে ॥ জৌনপুরী-টোড়ী। একতাল। স্বরলিপি গীতিমালা

কি হবে এ জীবনে ॥ ইমন্। আড়াঠেকা। স্বরলিপি গীতিমালা

কে গো তুমি হা হা ॥ সিন্ধুড়া। ধামার। সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৪ ফাল্গুন

কেন প্রিয়ে অকারণে ॥ ইমন্। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমালা

কেমনে যাবো বলো গৃহমাঝে ॥ কামোদ। ধামার। স্বরলিপি গীতিমালা

কৈ এলো কৈ এলো সে ॥ ভৈরব। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমালা

কোয়েলিয়া মাতোয়ারা আনন্দে ॥ গান্ধারী-তোড়ী। মধ্যমান। স্বরলিপি গীতিমালা

চরণে বাজে আহা কি মধুর ॥ ভূপালী। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমালা

ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখি ॥ সিন্ধু-কাফি। মধ্যমান। স্বরলিপি গীতিমালা

ধীরে ধীরে বায়ু বহিতেছে ॥ মুম্বই। কাওয়ালি। বীণাবাদিনী ১৩০৫

পঞ্চবদনে বম্ বম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥ বেহাগ-খাম্বাজ। একতাল। বীণাবাদিনী ১৩০৫

পায়ে পায়ে বাজে রে ॥ ইমন্। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমালা

প্রাণ বড়ো ব্যাকুল হল ॥ ছায়ানট। ঢিমা তেতালা। স্বরলিপি গীতিমালা

প্রেমের কথা আর বোলো না ॥ ঝিঁঝিট। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমালা

বল্ আমায় কি হয়েছে ॥ দেশ। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমাল

ভব শিব শঙ্কর হর বিভূতি সাজে ॥ ভৈরব। সুর ফাঁকতাল। বীণাবাদিনী ১৩০৫

ভব সংসার এ যে মেলা ॥ খাম্বাজ। ঠুংরি। বীণাবাদিনী ১৩০৫

মঙ্গলধ্বনি কর লো॥ ইমন্-পূরিয়া। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমালা
মধ্যাহ্ন বেলা ঝাঁ ঝাঁ করে দিক দশ॥ মধুমাধবী সারঙ্গ। ঢিমা তেতালা। স্বরলিপি গীতিমালা
মন চুরি করিল মধুর কটাক্ষে॥ বারোয়াঁ-পিলু। ঝাঁপতাল। স্বরলিপি গীতিমালা
মরি হায় কি শোভা আঁখি জুড়ায়॥ বেহাগ্ড়া। একতাল। স্বরলিপি গীতিমালা
মুরলী কি গুণ জানে॥ যোগিয়া। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমালা
ম্লান মুখ কেন বলো প্রিয়ে॥ সুরট। তেওট্। স্বরলিপি গীতিমালা
শিব শঙ্কর বোম্ বোম্ ভোলা॥ খাম্বাজ। কাওয়ালি। বীণাবাদিনী ১৩০৫
শ্যাম আমার নিশিদিন রয়েছে॥ ছায়ানট। তেওট্। স্বরলিপি গীতিমালা
সব সখি মিলে গাও রে॥ বাহার। ঢিমা তেতালা। স্বরলিপি গীতিমালা
সে প্রেম কোথা রে এখন॥ ঝিঁঝিট-খাম্বাজ! খেমটা। স্বরলিপি গীতিমালা
সে যে এসেছিল, সে যে এসেছে॥ শ্যাম। একতাল। স্বরলিপি গীতিমালা

জাতীয় সংগীত

চল্ রে চল্ সবে ভারতসন্তান॥ শঙ্করা। কাওয়ালি। বীণাবাদিনী ১৩০৪। শতগান

এই তালিকা-প্রণয়নে এই পুস্তকগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

স্বরলিপি গীতিমালা
সঙ্গীত প্রকাশিকা
বাঙালীর গান॥ দুর্গাদাস লাহিড়ি
শতগান॥ সরলা দেবী
বীণাবাদিনী পত্রিকা
আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত
ব্রহ্মসঙ্গীত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি। কাঙালীচরণ সেন-কৃত
ব্রহ্মসঙ্গীত। আদি সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত

৫. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র

কালানুক্রমিক তালিকা

মূল চিত্র রবীন্দ্রভারতী-চিত্রশালায় সংরক্ষিত

তারিখ	বিষয়
১৮৭০	
	জনৈক ভদ্রলোক। শ্মশ্রুধারী
	শিল্পী হরিশচন্দ্র হালদার
	কবি বড়াল [অক্ষয়কুমার]
	দৌলত মাঝি
	সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
	গোপালচন্দ্র মজুমদার
	নরনাথ মুখোপাধ্যায়
১৮৭৩	
	সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	রাজনারায়ণ বসু
	যদু ঘোষাল
	অক্ষয় মজুমদার
	নবগোপাল মিত্র
	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
	কেদারনাথ মজুমদার
	কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়
	নবীন মুখোপাধ্যায়
	কেদারনাথ মজুমদার
	বিহারীলাল গুপ্ত
	অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

তারিখ	বিষয়
১৮৭৩	
	যোগেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
	'বুড়োদাদা' পূর্ণ মুখোপাধ্যায়
	চণ্ডুখোর জমিদার
	নবীনবাবু [মুখোপাধ্যায় ?]
	হেম চট্টোপাধ্যায়
	বিষ্ণু (গায়ক)
	নীলকমল মুখোপাধ্যায়
	তারিণী সান্যাল
	গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৭৪	
	সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
	জানকীনাথ ঘোষাল
	সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৭৫	
	তারক দত্ত (আইনজ্ঞ)
	অক্ষয় মজুমদার
১৮৭৭	
	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	শৈলেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	রাজেন্দ্র দত্ত

তারিখ	বিষয়	তারিখ	বিষয়
১৮৭৭		১৮৮০	
	হেম ভট্টা		কাদম্বরী দেবী
	একটি বালিকা। অসমাপ্ত		সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী
	Figure Composition		দুর্গা
১৮৮০			শাস্তারাম
	মেজমাসি। ২ নভেম্বর		জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
	ভগ্নী শরৎকুমারী দেবী। ৩ নভেম্বর	১৮৮১	
	লাহোরিনী		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	দিদি সৌদামিনী দেবী		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	ব্রজ রায়		জনৈক ভদ্রলোক
	ঈশ্বরবাবু		তারকনাথ পালিত
	বেণী। ব্রাহ্মসমাজের বেহালাবাদক		মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
	অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	নিজ প্রতিকৃতি		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	ব্রজবাবু		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নতনেত্রে
	যদু মুখোপাধ্যায়		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সহাস্য
	গোভিন্ করকারে		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিস্ফারিত চক্ষু
	শাস্তারাম		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	যদু		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	শ্রীনাথবাবু		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	কাকিমা। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	টুটি		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তারিখ	বিষয়
১৮৮১	
	একটি বালিকা। অসমাপ্ত মস্তক
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উত্তোলিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	'অক্ষয়িনী'। অক্ষয়বাবুর স্ত্রী
	ভগ্নী বর্ণকুমারী দেবী
	সরোজা দেবী
	একটি বালিকা
	'লাহোরিনী'
	সৌদামিনী গুপ্ত
	ঊষা দেবী
	ইন্দিরা দেবী। বিবি
	সুশীলা দেবী
	সুশীলা বর্মা
	দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৮২	
	নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১৮৮৩	
	স্ত্রী কাদম্বরী দেবী
	জনৈক মহিলা
	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
	শরৎকুমারী দেবী
	নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	কেদার
	সুপ্রভা দেবী
	স্বর্ণকুমারী দেবী

তারিখ	বিষয়
১৮৮৩	
	'সেজ বৌঠান'। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
	শিল্পী 'জগদীশ মামা'
	প্রতিভা দেবী
	যদু। যদুর পুত্র
	একটি বালিকা
	হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	'জ্ঞান'
	সুশীলা দেবী
	নীরজা দেবী
	'লাহোরিনী'
	একটি মহিলা
	নিদ্রিত বালক। অসমাপ্ত
	বিনোদা দেবী
	দেবীচরণ লাহা
	'মামী'। ব্রজরায়ের সহধর্মিনী
	দিদিমা
	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
	একটি বালিকা
	অবিনাশ
	'মেজ মুখার্জি মশাই'
	অভিজ্ঞা দেবী
	'বড় গাঙ্গুলি'
	মনীষা দেবী
	ইন্দিরা দেবী। বিবি
	সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তারিখ	বিষয়	তারিখ	বিষয়
১৮৮৩		১৮৮৩	
	সুরসুন্দরী দেবীর কন্যা		শেষগির রাওএর-কন্যা
	সুরসুন্দরী দেবী		দোরেস্। চীনা ছুতার
	ভূপেন্দ্রবালা। সুরসুন্দরী দেবীর কন্যা		করনদিকার
	একটি বালিকা (সরলা দেবী)		রাম রাও। সত্যেন্দ্রনাথের পরামর্শদাতা
	কুমারী ইন্দু চট্টোপাধ্যায়		জগন্নাথ-মন্দিরের ওড়িয়া পাণ্ডা
	চিকিৎসক এন. চট্টোপাধ্যায়		যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
	ক্যাপটেন্ রাসেল		কালীবর বেদান্তবাগীশ
	নগু। মেথরানী		শ্রীনাথ ঠাকুর
	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর		অম্বাবাই। রাম রাও-এর দুহিতা
	রমা পণ্ডিত		একটি বালক
	ভগ্নী সৌদামিনী দেবী		মিসেস নিবক্
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		জনৈকা আয়া
	কনক		কলিকাতা হাড়কাটার স্বর্ণ
	গৌরী		মি লো। ষ্টিমারের ইঞ্জিনিয়ার
	শ্মশ্রুধারী পাঠরত ভদ্রলোক		শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
	কারওয়ারের প্রধান জমিদার		মণি মুখোপাধ্যায়। যদুর ভ্রাতা
	কৃষ্ণাবাঈ		সুপ্রভা দেবী
	আইনজ্ঞ বামনরাও		অক্ষয় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
	মিসেস ভেঙ্কুকান্তা		অক্ষয় চৌধুরী
	মিঃ টি. কান্তা		জনৈকা বৃদ্ধা
	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাচক		কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
	জন পল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোয়ানিজ পাচক		প্রিয়নাথ শাস্ত্রী
			মিস্ ইংলে
	এন্থনি কোয়েলো। ঠিকাদার		শ্যামবাবু
	শেষগির রাও। সরকারি উকিল		বড়গাঙ্গুলীর স্ত্রী

১৬

তারিখ	বিষয়
১৮৮৩	
	ছোটগাঙ্গুলী
	ইন্দিরা দেবী। অসমাপ্ত
	নারায়ণ রাও। আইনজ্ঞ
	মিসেস কিলো
	মি. সি আই গিবসন
	ক্যাপ্টেন বরকার
	জনৈকা মহিলা। অসমাপ্ত
	মি লাইং
	জনৈকা কুশ্রী কৃষাণী
	জনৈক কুশ্রী কৃষক
	মানদা
	মি. রক্স বোরো। ষ্টিমারের অফিসার
	অনন্তনারায়ণ। নারায়ণ রাওএর পিতা
	ত্রৈলোক্য
	সুশীলা বৌমা। দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
	দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	প্রফুল্লময়ী দেবী। বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
১৮৮৪	
	ভাগিনেয়ী ইরাবতী দেবী
	শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। জুন মাস
	রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়। জুন মাস
	সরোজা দেবী। জুন মাস
	ধীরাবালা দেবী। জুন মাস

তারিখ	বিষয়
১৮৮৪	
	বরদা রায়
	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	Head studies
	Head studies
	জনৈক মিস্ত্রি
	শ্যামাচরণ
	নীরজিনী দেবী
	মি. রোমাইন
	জনৈকা যুবতী। মি. রোমাইনের স্ত্রী
	আকবর খানসামা
	শশী। সরোজিনী স্টীমারের করণিক
	রাখালবাবুর স্ত্রী
	লাবণ্য দেবী
	কৃষ্ণবিহারী সেন
	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
	দ্বিজেন্দ্রবাবু
	চন্দ্রনাথ বসু
	গুরুচরণ কবিরাজ
	প্রসন্ন বিশ্বাস
	সিংহদাস মল্লিক
	প্রকাশিনী দেবী
	ললিত চট্টোপাধ্যায়
	মৃণালিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী
	একটি বাগান ও বাংলোর নকশা

তারিখ	বিষয়
১৮৮৪	
	Head study of Mrinalini Debi, unfinished
	সুশীলা দেবী
	মৃণালিনী দেবী
১৮৮৫	
	অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	জগন্নাথ মন্দিরের উড়িয়া পাণ্ডা
	মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা
	Heed study, unfinished
	শ্মশ্রুধারী ভদ্রলোক
	যদু চট্টোপাধ্যায়
	শ্মশ্রুধারী ভদ্রলোক
	জিতেন পালিত
	প্রিয়নাথ সেন
	শ্মশ্রুধারী ভদ্রলোক
	গোপালবাবু
	নন্দীবাবু
	জনৈক জ্যোতিষী
	জনৈকা যুবতী
	সস্ত্রীক রবীন্দ্রনাথ
	ইন্দিরা দেবী। বিবি, পাঠরতা
	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। পাঠরতা
	রবীন্দ্রনাথ। দুইটি বালিকাসহ
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	ঋষিবর মুখোপাধ্যায়
	সুকুমার হালদার

তারিখ	বিষয়
১৮৮৫	
	লাল গোস্বামী
	বামুন ঠাকনরুন
	ক্ষমা দিদি
	সতু পালিত
	এন্ এন্ ঘোষ
	জনৈক ভদ্রলোক
	ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার
	জনৈক ভদ্রলোক
	ইন্দুপ্রকাশ গাঙ্গুলী
	অক্ষয় বড়াল
	কেদার মজুমদার
	রাখাল রায়
	ষষ্ঠীচরণ
	জনৈক ভদ্রলোক
	জনৈক ভদ্রলোক
	একটি যুবক
	বলাই পান
১৮৮৬	
	ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী
	অঙ্কন-শিক্ষারত, সত্য
	ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়
১৮৮৭	
	শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
	অশ্বিনীকুমার দত্ত। বরিশাল
	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
	কালীনাথ মুখোপাধ্যায়। যশোহর

তারিখ	বিষয়
১৮৮৭	
	মি সোম
	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	Head study, unfinished
	শরৎ মিত্র
	Head study, unfinished
	হেম মল্লিক
	জয়গোবিন্দ সোম
	মতিলাল ঘোষ। অমৃতবাজার পত্রিকা
	নন্দলাল গোস্বামী
	অম্বিকা মজুমদার। ফরিদপুর
	টুপি-পরিহিত ভদ্রলোক
	Head study, unfinished
	Head study, unfinished
১৮৮৮	
	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
	রেভারেণ্ড গগনচন্দ্র দত্ত। খুলনা
	রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
	নফর পালচৌধুরী
	ডাক্তার হোসেন। চুঁচুড়া
	দুর্গামোহন দাস
	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	নরসিংহচন্দ্র দত্ত। আইনজ্ঞ, হাওড়া
	রমেশচন্দ্র মণ্ডল
	রামেশ্বর মিত্র
	ডাক্তার ত্রৈলোক্য মিত্র

তারিখ	বিষয়
১৮৮৮	
	W. C. Bonnerjea
	মন্মথ মল্লিক। হেম মল্লিকের ভ্রাতা
	জনৈক ভদ্রলোক
	শ্মশ্রুধারী ভদ্রলোক। উকিল
	ডাক্তার কে. জি সরকার
	রাসবিহারী ঘোষ
	কিশোরীলাল সরকার
	রে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
	গগনচন্দ্র রায়ের স্ত্রী
	দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	Unfinisned portrait study
	জনৈক কয়েদী
	জনৈক কয়েদী
	জনৈক কয়েদী
	জনৈক কয়েদী
	জনৈক সাধু
	একটি লোক
	গগনচন্দ্র রায়। গাজিপুর
	একটি ভদ্রলোক
	রায় লালদাপ্রসাদ
	কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	জনৈক মালি
	ইন্দিরা দেবী। অসমাপ্ত
	কয়েদী আলি শেখ
	Dr. Robertson of Gazipur Jail

তারিখ	বিষয়
১৮৮৮	
	Mrs. Rivett Cornac
	প্রধানশিক্ষক। গাজিপুর
	খান্দেরাও
	গগনচন্দ্র রায়। গাজিপুর
	Unfinished portrait study
	ডাক্তার কালীকৃষ্ণ ঘোষ
	একটি ভদ্রলোক
	লোকেন পালিত
	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	Unfinished portrait study
	ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
	কেদার মজুমদার
	অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়। কলিকাতা
	সনৎকুমার
	শ্মশ্রুধারী ভদ্রলোক। আইনজীবী
১৮৮৯	
	পি এল. রায়ের স্ত্রী
	মাতুল ব্রজ রায়। অসমাপ্ত
	জগবন্ধু ভট্টাচার্য। জাহাজের করণিক
	Unfinished head study of a girl
	লালন ফকির
	দুর্গাচরণ বর্মা। আসাম
	কীর্তনগায়িকা হরিমতী
	কীর্তনওয়ালী

তারিখ	বিষয়
১৮৮৯	
	ভুবন দাস, মানিকচন্দ্র দোসী
	S. P. Sinha
	ললচাঁদ
	জহরবাই। মি. যোশীর স্ত্রী
	সুরেন্দ্র মিত্র। বিচারপতি মিত্রের পুত্র
	Mrs. Joshi, Bar-at-law
	জ্যোৎস্না ঘোষাল
	লালমোহন ঘোষ
	শ্যামাধর রায়
	হরিচরণ। ইঞ্জিনিয়ার
	শিক্ষক গণেশচন্দ্র গুপ্ত
	প্রিয়ম্বদা দেবী
	জনৈক অসমীয়া ভদ্রলোক
	সরোজ
	প্রিয়র মাতাঠাকুরানী
১৮৯০	
	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	K. Mukherjee
	কিশোরী চট্টোপাধ্যায়। করণিক
	একটি ভদ্রলোক
	অক্ষয় মৈত্রেয়র পিতা
১৮৯১	
	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
	ইন্দিরা দেবী

তারিখ	বিষয়	তারিখ	বিষয়
১৮৯১		১৮৯১	
	Dr. Canir		ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী
	প্রিয়ার মাতাঠাকুরাণী। প্রসন্নময়ী দেবী		Studies of eyes
	শিল্পী ঈশ্বরীপ্রসাদ		একটি যুবতী
	জ্ঞানদা গাঙ্গুলি		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	কৃষ্ণবিহারী সেন		ভুবন চট্টোপাধ্যায়
	লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া		জনৈক যুবা
	ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়		একটি নৌকার মাঝি
	একটি যুবতী	১৮৯২	
	ইন্দিরা দেবী। অসমাপ্ত		P. S. Mukherjee, Bar-at-law
	তারক পালিত		হেমন্ত মল্লিক
	লোকেন পালিত		Unfinished Head study
	ইন্দিরা দেবী। আরাম কেদারায় শায়িতা। অসমাপ্ত	১৮৯৩	
	V. A. Modak		হিরণ মুখোপাধ্যায়
	বিষ্ণু মোদক		রাজেন্দ্র দত্ত
	একটি ভদ্রলোক। অসমাপ্ত		Lady Harman Singh
	বাবুয়া। তারকবাবুর ভৃত্য		রাজেন্দ্রবাবু
	টুপি-পরিহিত উত্তর-প্রদেশীয় লোক		Mr. Golaknath
	বলবন্ত সিং। তারকবাবুর দারোয়ান		উত্তরপ্রদেশীয় ভদ্রলোক
	Woman, Sitaram Sachalolakar		Unfinished Head study
	পুরুষোত্তম গণেশ		Portrait of Mr. Pousamby
	হোসেন। তারকবাবুর পাচক	১৮৯৪	
	টুপি-পরিহিত শ্মশ্রুধারী লোক		দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	টুপি-পরিহিত শ্মশ্রুধারী লোক		Pandit Ranade
			প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী
			সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলি

তারিখ	বিষয়
১৮৯৪	
	Mr. Sohoni
	লক্ষ্মণভূষণ মল্লিক
	কুমারী পালিত
	Mr. Kola
	Mrs. Kola
	Dr. Peters
	'Susobhini Bow'
	Ramchand Kali, Pleader
	Rao-Sahib Chintamani Narayan Bhatt
১৮৯৫	
	নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	অতুলপ্রসাদ সেন
	নিজ প্রতিকৃতি। অসমাপ্ত
	নিজ প্রতিকৃতি
	Mr. Maratte
	ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
	Vinayak Krishna Somani
	Sevaklal
	Aqashy
	Mallapa Basappa Gokhale
	Ananta Bapuji Gokhale
	Govind Karkare
	G. D. Gadre
	Palebar, Editor Subodh Patra

তারিখ	বিষয়
১৮৯৫	
	Solomon *alias* Iswardas
	Mrs. Iswardas
	ঈশ্বরদাসের পুত্র
	জাবেজী
	Sheveran Narayan Gokhale
	মস্তাবনী বাঈ
	শরৎচন্দ্র কাব্যরত্ন। নবদ্বীপ
	Vishavanath Joshi
	গায়িকা মাতঙ্গা
	গায়িকা ইন্দু
	গায়িকা ইন্দু
	গায়িকা লীলা
	গায়িকা রানী
	চন্দ্রকুমার সরকার
	Miss. Forbes
	ইন্দিরা দেবী। বিবি
	H. N. Apte
	Mrs. Kala Bhai
	Kala Bhai
	Wasuder Kamatkar
	সখারাম
	মোহিনীমোহন ব্রহ্মচারী
	কোলা
	কালী
	কেলকার

তারিখ	বিষয়
১৮৯৫	
	টুপি-পরিহিত জনৈক বৃদ্ধ
	Raja Ali Khan playing on Six tabla
	মোগল খান
	আইনজীবী রাণাডে
	চিত্তরঞ্জন দাস
	জনৈকা মহিলা। অসমাপ্ত
	অক্ষয়চরণ মুখোপাধ্যায়
	কুমারী রাধারানী লাহিড়ী
	কৈলাসনাথ চক্রবর্তী
	অভয়চরণ মুখোপাধ্যায়
	জগদীশ মামা
	যোগেশবাবু
	কৃষ্ণবিহারী সেনের পুত্র
	যোগেশ চৌধুরী
	জনৈকা মহিলা। অসমাপ্ত
	লোকেন পালিত
	জনৈকা মহিলা
	নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
	সরলতা ঘোষ
	হেমলতা ঘোষ
১৮৯৬	
	বিভু
	কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পুত্র 'নেহু'
১৮৯৭	
	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তারিখ	বিষয়
১৮৯৭	
	সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	জলধি মুখোপাধ্যায়
	নলিনী সরকার
	রামগোপাল সান্যাল
	A gentleman and a sketch of the President's table and a bell
	রমণীকান্ত রায়। চৌগ্রাম
	খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
	প্রমথ চৌধুরী
	Kolerkar
	জনৈক ভদ্রলোক
	যোগেশ চৌধুরী
	অমিয় চৌধুরী
	প্রিয়ম্বদা দেবী
	মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়
	চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। আদি ব্রাহ্মসমাজ
	মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র 'সাহেব'
	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	নৃত্যগোপালবাবু
	জনৈক ভদ্রলোক
	প্রমথ চৌধুরী
	প্রমথ চৌধুরী

তারিখ	বিষয়
১৮৯৭	
	প্রমথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৯৮	
	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	হেমলতা দেবী। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
	জ্যোৎস্না ঘোষাল
	জনৈকা যুবতী। অসমাপ্ত
	জনৈকা যুবতী। অসমাপ্ত
	স্বর্ণকুমারী দেবী
	কুমুদ মজুমদার
	প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর
১৮৯৯	
	গোদাবরী বাঈ
	অক্ষয় চৌধুরীর জামাতা 'জ্যোতি'
	জনৈকা তরুণী
	কৃষ্ণাবাঈ
	আবদুল খানসামা
	কোচম্যান
১৯০০	
	ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী
	সীতাকান্ত চট্টোপ্যাধ্যায়
	সরযূ
	জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়
	A lady and an unfinished head study
	জ্ঞানদা গঙ্গোপাধ্যায়

তারিখ	বিষয়
১৯০০	
	'খুদু'। সরযূর মাতা
	জনৈক ভদ্রলোক
	Meena, Mrs. U. Banerjee
	অমিয়া দেবী
	Niru (Niranjan Roy Choudhury)
	আশুতোষ চক্রবর্তী। এজেণ্ট
	অমিয়া দেবী ও একটি তরুণী। অসমাপ্ত
	শশীকুমার হেস্
	ভৃত্য—গোবিন্দ
	রাখালচন্দ্র দাস
	Bindeswari Panda Dube
	রাজেন্দ্রবাবু
	রাজা
	কমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
	দর্জি মহম্মদ
	Unfinished portrait study
	পশুপতি বসু
	সুখলয়াল। কাপড় ব্যবসায়ী
	নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়
	জনৈক নাপিত
	Man Bakhan
	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অসমাপ্ত
১৯০১	
	শান্তা দেবী

তারিখ	বিষয়
১৯০১	
	P. Mitra
	দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাসি
	Bemuri Sriram Sastri, Satabadhani, Nellor, Madras
	জগদিন্দ্রনাথ রায়
	ব্যোমকেশ মুস্তাফি
	S. V. Sriram Sastri
	ঢাকাই ঘটকী বুড়ী
	ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার
	শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী
	Unfinished Potrait study
	বধূ। অবিনাশের স্ত্রী
	প্রসন্নকুমার রায়চৌধুরী
	Sir Dinshaw E. Wacha, Congress President
	N. G. Chandraverkar
	Sitalvad (Gujrat)
	Mr. Kola
	গোপালকৃষ্ণ গোখেল
	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
	Unfinished potrait study
	Lalu Raj Kumar
	নগেন মল্লিক
১৯০২	
	Mrs. Hesh

তারিখ	বিষয়
১৯০২	
	Mrs. Mitra
	Dr. Mitter of Kashmere
	শিবনাথ শাস্ত্রী
	V. Venugopal Chetty
	Kakuzo Okakura
	নীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	অমি। অমিয়নাথ চৌধুরী
	সতী। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম
	রাধারানী
	Indrajit Ralathi
	অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৯০৩	
	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	Yoshinovi Hori
	'হাবা'। নবীনবাবুর পুত্র
	'ভুলা'
	রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	মতিলাল
	প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়
	Taikan Yokoyama
	Unfinished portrait study
	Hisidar Sunso
	শরৎকুমারী চৌধুরী
	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	খগেন্দ্র রায়
	খগেন্দ্রের পুত্র

তারিখ	বিষয়	তারিখ	বিষয়
১৯০৩		১৯০৩	
	হেমেন্দ্র সিংহ		ঢেনকানলের রাজা। উড়িষ্যা
	জনৈকা মহিলা। অসমাপ্ত		করুণা সেন
	নিকুঞ্জ		কাজির স্ত্রী
	নীরজ		Vishnu (Bhulia)
	যামিনী গাঙ্গুলি		জনৈকা মহিলা
	মহীন্দ্র দেববর্মা		Unfinished portrait study
	কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন		Miss Hettersley
	'খুদি'। বিন্দুদার পুত্র		Lalu Gupta
	হরিশ হালদার		কামিনী রায়
	শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর		Mrs. Priyabala Gupta
	সুহাসিনী		Satish Gupta
	দীনেশচন্দ্র সেন		জ্ঞান রায়। আই. সি. এস.
	Professor Ito		Motri
	নরসিংহ মুখোপাধ্যায়। নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র		বিহারীলাল গুপ্ত
			Motri
	নিখিলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়		সংজ্ঞা দেবী
	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী		S. P. Sinha
	বৌ। তরুবালা		P. N. Roy
	পৃথ্বিনাথ মুন্সী		Mrs. Banerjee
	A. K. Ghosh		রবীন। বাবুল
	কাজি সাহেব। নেপালি		যোগেন্দ্রলাল সেন
	মণিকা দেবী		M. N. Banerjee
	নিমাই বসু		M. N. Banerjee
	বিনয় ঘোষ		রমেশ সেন
	T. Lall		প্রিয়নাথ ঘোষ
	Miss. M. Pandey		বরদানাথ হালদার

তারিখ	বিষয়
১৯০৩	
	নির্মল সেন
	নলিনী চট্টোপাধ্যায়
	M. Gibbons
	Unfinished portrait study
	Mrs. M. S. Jamrelji
	গুরুচরণ সিংহ
	Mrs. Moody
১৯০৪	
	অমিয়ভূষণ বসু
	পাগরী-পরিহিত শ্মশ্রুধারী ভদ্রলোক
	জনৈক ভদ্রলোক
	কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
	নগেন্দ্রনাথ বাগচী
	Thuras Singh
	সংজ্ঞা দেবী
	কুণাল সেন
	Pairamall
	Nirojim
	Srimati Hridoy Bala Ghosal (Midwife)
	N. C. Sen
	Mrs. F. R. Cama
	গায়ক শ্যামসুন্দর মিশ্র
	D. L. Dhinpra

তারিখ	বিষয়
১৯০৫	
	সংজ্ঞা দেবী। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
	সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	যতীন্দ্রমোহন বাগচী
	Ekai Kawaguchi
	অশোক মুখোপাধ্যায়
	নলিনী দেবী
	Mr. Modie
	ইন্দুশেখর চক্রবর্তী
	Mrs. Halder
	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
	Rewachand G. M.
১৯০৬	
	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
	তারিণীরাম ফুকন
	চণ্ডীচরণ সেন
	Unfinished portrait study of Lalita Devi
	ভবশঙ্কর। সুরেন্দ্রবাবুর পুত্র
	Mrs. S. P. Sinha
	শিশিরকুমার সিংহ
	কৃপা। সুরেন্দ্রবাবুর ভৃত্য
	দেবী। সুরেন্দ্রবাবুর ভৃত্য
	ভবনাথবাবু
	অবিনাশচন্দ্র রায়চৌধুরী। চিকিৎসক

তারিখ	বিষয়
১৯০৬	
	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী
	সরযূবালা। সুরেন্দ্রনাথের কন্যা
	K. N. Sen Gupta
	K. G. Gupta
	S. R. Das
	মন্মথনাথ সেন
	S. P Sinha
	অমৃতলাল বসু
	সরযূবালা
	B. L. Gupta
	স্নেহলতা সেন। লতি
	ভাস্কর নন্দী
	নলিনী দেবী
	জ্ঞান বরুয়া
	শঙ্কর
	Lady Sinha
	S. D. Sen Gupta
	প্রিয়বালা গুপ্ত
	'Shireen'
	সতী
	সাগরিকা
	কমলা গুপ্ত
	K. P. Bose
	সতীশ গুপ্ত
	Babu Chuttiar Roy, Zamindar, 'Kharna'

তারিখ	বিষয়
১৯০৬	
	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়
	নবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৯০৭	
	'কাঞ্চি'। চৌকিদারের স্ত্রী
	কুঞ্জ। পাচক
	মূর্তি। দাসী
	জনৈকা মহিলা
	জনৈকা বালিকা
	শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	Noten
	আবদুল। খানসামা
	নগেন মল্লিক
	প্রমথ চৌধুরী
	Churaman
	লীলা দেবী
	লীলাবতী দেবী
	রাজলক্ষ্মী দেবী
	সাহানা দেবী। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
	Sahib Dutta Mol Dhingra
	দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	শ্রীশচন্দ্র সেন। ভবনাথবাবুর পুত্র
	হেমনাথ সেন। ভবনাথবাবুর পুত্র
	প্রিয়ম্বদা দেবী
	প্রসন্নময়ী দেবী

তারিখ	বিষয়
১৯০৭	
	ইন্দিরা দেবী। বিবি
	রণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	S. N. Mullick, son of Nagen Mullick
	কেদার দাশগুপ্ত
	কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ
	J. N. Mazumder
	প্রমীলা দেবী
	রাজেন্দ্রবাবু
	S. K. Dev
	একজন নাপিত
	A. Barbar
	নতু। সুধীরের ভৃত্য
	ক্ষিতীশ
	কুমুদনাথ ভট্টাচার্য
	ব্রজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
	Mrs. B. M. Chatterjee
	ভৃত্য বাঞ্ছারাম
	চৌকিদার
	পাচকের একজন
	মুদি
	নীলমাধব দত্ত
	সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	মনোময়ী দেবী
	অমিয়নাথ চৌধুরী
	গৌরী দাসী

তারিখ	বিষয়
১৯০৭	
	প্রিয়ম্বদা দেবী
	Leela Devi, Mrs. Arya Kr. Chaudhury
	সুলাজিনী দেবী। রমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
	সুরেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
	সুধীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	টুটি। চৌকিদারের কন্যা
১৯০৮	
	মোরাবাদী পাহাড়
	মোরাবাদী পাহাড়
	মন্দির। রাঁচি
	একটি বাগানের নকশা
১৯০৯	
	সতীশচন্দ্র রায়
	শিবগোবিন্দ তেওয়ারি
	অলোকনাথ বসু
	আশুতোষ গুপ্ত
	জনৈক আদিবাসী, রাঁচি
	Birsi
	মণীন্দ্রনাথ বসু
	Sailagram Pandit
	চুণীলাল বসু
	ফণীন্দ্রনাথ দে

তারিখ	বিষয়	তারিখ	বিষয়
১৯০৯		১৯১২	
	Louis Alexander Thomson, Post Master		অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	শিবচৈতন্য ব্রহ্মচারী। রসগোল্লা বাবাজী		শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী
	মানবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র		যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
	'শান্তিধাম'। মোরাবাদী পাহাড়, রাঁচি		পয়োধিচন্দ্র মিত্র
	এককড়িবাবুর বাড়ি। রাঁচি		কাশীচন্দ্র ঘোষাল
	বসন্তবাবুর বাড়ি। রাঁচি		বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
	'শান্তিধাম'। রাঁচি		সতী দেবী
	রাঁচির ল্যাণ্ডস্কেপ	১৯১৩	
	প্রাণচন্দ্র দত্ত		সংজ্ঞা দেবী। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
	গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়		সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	তারাপ্রসন্ন ঘোষ		ইন্দিরা দেবী। বিবি
	গোপীনাথ কবিরাজ		হরিচরণ দত্ত
	কান্তিভূষণ সেন		অতুল চট্টোপাধ্যায়
	শশীভূষণ দত্ত		উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী
	চুনীলাল রায়		অশোকা দেবী
	জনৈক ভদ্রলোক		C. F Andrews
	D. K. Mitra		Ida S. Ghosh
	ডুকড়ি ঘোষ		Mabel Palit
	ঝুলনলাল বসু		প্রমথ চৌধুরী
	G. K. Mitter		ইন্দিরা দেবী। বিবি
	শিল্পী জ্ঞানদাপ্রসাদ সেন। কলিকাতা		কেদারনাথ দাশগুপ্ত
			অরুণ সেন
			আর্যকুমার চৌধুরী
			S. C. Dev Barman

তারিখ	বিষয়	তারিখ	বিষয়
১৯১৩		১৯১৪	
	তারকনাথ পালিত		ব্রজগোপাল নিয়োগী
	Susarni Karpeles		রাজমোহন বসু
	Andre Karpeles		জনৈক ভদ্রলোক
	লীলা দেবী		জ্যোতি দেবী
১৯১৪			Najma Rasul
	Major Monmathanath Choudhury, I. M. S		নগেন্দ্রনাথ
	A. C. Chatterjee		শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
	জানকীনাথ বসু		সনৎকুমার ঘোষাল
	নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		চন্দ্রমণি চট্টোপাধ্যায়
	কান্তিভূষণ সেন		প্রাণকৃষ্ণ আচার্য
	একটি ল্যাণ্ডস্কেপ		অমরকুমার মুখোপাধ্যায়
	মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়		Manol Smith
	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		H. L. Hodgson
	ঊষা বসু		M. Baker Ali, Photographer
	রানী চট্টোপাধ্যায়		কুমুদবান্ধব চক্রবর্তী
	জয়কালী দত্ত		ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
	Study of a boy		জানকীপ্রসাদ তেওয়ারি
	হিরন্ময়ী দেবী		অনুপমচন্দ্র মৈত্র
	নীরজিনী দেবী		P. K. Bose
	রাধাকমল মুখোপাধ্যায়		Jaswant Anand Godbole
	Unfinished portrait study		সুকুমারী বসু
	Unfinished portrait study of a lady		গিরিবালা দেবী
	সুষমা দেবী		সতী দেবী চট্টোপাধ্যায়
	নিরঞ্জন রায়চৌধুরী		হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
			সুরেশচন্দ্র বসু

তারিখ	বিষয়	তারিখ	বিষয়
১৯১৪		১৯১৪	
	রাখালদাস সরকার		প্রমথনাথ দাশগুপ্ত
	শরৎকুমারী চৌধুরী		শচীকান্ত দাশগুপ্ত
	তনুজা দেবী		জনৈক ভদ্রলোক
	যোগেশচন্দ্র দত্ত		সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	আবদুল করিম		জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
	সতী দেবী (মৈত্র)		অতুল্য ধর
	নিরুপমা দেবী		জনৈক বালক
	প্রতিভা দেবী		জনৈক বালক
	নিরুপমা দেবী		জনৈকা তরুণী
	রবীন্দ্রনাথ ঘোষ		প্রমীলাবালা বসু
	প্রোফেসার রামমূর্তি		নির্মলাবালা রায়চৌধুরী
	রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর		বিমলাবালা ঘোষ
	প্রতিমা দেবী		শৈলবালা রায়চৌধুরী
	নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়		নিরুপমা বসু
	বীণা দেবী		নগেন্দ্রনাথ বসু
	মনোরমা চট্টোপাধ্যায়		সরোজনাথ ভট্টাচার্য। ফটিক
	মায়া দেবী		বিপিনবিহারী সেন। খুলনা
	B. N. Chatterjee		সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	অমূল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়		দেবকুমার রায় চৌধুরী
	উপেন্দ্রনাথ ঘোষ		কেশবলাল রায়চৌধুরী। যশোহর
	সতী দেবী চট্টোপাধ্যায়)		সুশীলা সেন
	গোবিন্দবালা রায়		রাসবিহারী সেন। খুলনা
	বিনয়ভূষণ সেন		ধীরাবতী দেবী
	গিরিবালা দেবী		উষাময়ী সেন
	ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়		কৃষ্ণকুমারী গুপ্ত
	সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ		অরুণকুমার বসু

তারিখ	বিষয়
১৯১৪	
	কমলা দেবী
	J. C. Gupta
	K. K. Chatterjee
	সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়। নাইডু
	নিবারণচন্দ্র দাস
	দেবকুমার রায়চৌধুরী
	হিরণ্ময়ী দেবী
	জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়
	হিরণ্ময়ী গুপ্ত
	লালমণি বসু
	J. N. Roy
	সতী দেবী
	ষোড়শীবালা
	নগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী। পাবনা
	বিজয়শঙ্কর মজুমদার
	পুণ্যময়ী দেবী
	কৃষ্ণধর বন্দ্যোপাধ্যায়
	শৈলবালা বসু
	অজয়কুমার বসু
	B. Ganguly
	নিরঞ্জন রায়চৌধুরী
	M. Gupta
	A. Rasul
	যাদুমতি দেবী
	মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসক

তারিখ	বিষয়
১৯১৪	
	শৈলজা দেবী
	শচীন্দ্রনাথ সেন
১৯১৫	
	W. Addy
	মঞ্জুশ্রী দেবী
	প্রমীলা দেবী
	উমারানী। অসমাপ্ত
	কমলা দেবী। অসমাপ্ত
	কল্যাণী দেবী
	মঞ্জুশ্রী দেবী। অসমাপ্ত
	কল্যাণী দেবী
	নিরঞ্জনপ্রকাশ গাঙ্গুলি
	জয়ন্ত
	W. Addy
	Unfinished portrait study of a lady
	হিরণ দেবী
	কল্যাণী দেবী
	ক্ষিতিমোহন সেন
	কালিকানন্দ ঠাকুর
	J. N. Mookerjee
	ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
	গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	অবনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	গণেশচন্দ্র ঘোষ

তারিখ	বিষয়
১৯১৫	
	কমলা দেবী। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
	সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	উমারানী বসু
	অভয়পদ রায়
	প্রান্তময়ী দেবী
	গোপেন্দ্রমোহন ঠাকুর
	কমলাকুমারী দেবী
	তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
	রবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী
	কমলা দেবী
	সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
	রামলাল দাস
	বীরেশ্বর দাস
	লীলালতিকা দেবী
	প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়
	প্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী। খুলনা
	জয়শ্রী দেবী
	প্রতিমা দেবী। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
	জানকীনাথ ঘোষ
	অমিয়া দেবী
	চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	মন্মথনাথ সেন
	মঞ্জুশ্রী দেবী। অসমাপ্ত
	জনৈক ভদ্রলোক। অসমাপ্ত

তারিখ	বিষয়
১৯১৫	
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্ভবতঃ। অসমাপ্ত
	ইলা দেবী। অসমাপ্ত
১৯১৬	
	অবিনাশচন্দ্র সেন
	মিহিরমোহন ঘোষ
	সিতাংশুপ্রকাশ রায়
	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	বিনয়ভূষণ সেন
	নির্মলা সেন
	V. R. Vogel
	Unfinished Portrait study
	Unfinished Portrait study
	ওঙ্কারানন্দ। পঞ্চু রায়
	উমা বসু
	কমলকৃষ্ণ বিশ্বাস। হাবু
	Unfinished portrait study
	মুনীশ্বর কাহার। দ্বিজেন্দ্রনাথের ভৃত্য
	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অসমাপ্ত
	সুকুমার হালদার
	ডাক্তার এন. চক্রবর্তী
	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	মুনীশ্বর
	লক্ষ্মী সিং

তারিখ	বিষয়
১৯১৬	
	নিরুপমা দেবী
	বীরেশ্বর ভট্টাচার্য
	ঘনা পাণ্ডে। পাচক
	রসময়ী দাসী
	কালীপদ চৌধুরী
	সিন্ধুবালা
	ভগবান সিং
	মন্মথনাথ গোস্বামী
	বি ডি. বোস
	বৈকুণ্ঠনাথ বসু
	অদিতি দেবী
	অমলা রায়
	সুশীলা রায়
	চারুশীলা রায়
	গিরীন্দ্রবালা রায়
	বিধুমুখী দেবী
	লীলা রায়
	যামিনীভূষণ রায় কবিরাজ
	জনৈক তরুণী
	জনৈকা মহিলা
	সত্যগোপাল ঘোষ
	হিমাংশুচরণ চৌধুরী
	হিরণ্ময়ী সেন
	অমিয়া সেন
	হেমাঙ্গচন্দ্র চৌধুরী
	Masud Ali Khan

তারিখ	বিষয়
১৯১৬	
	Odudar Rahaman
	ভুজঙ্গভূষণ মুখোপাধ্যায়
	অনিলাবালা দেবী
	চারুচন্দ্র চৌধুরী
	অজিতকুমার সাহা
	নন্দলাল বসু
	জানকী। ভগবানসিং হর স্ত্রী
	K. G. Natu
	নিত্যানন্দ বসু
	সুরেশচন্দ্র বসু
	David S. N. Roy
	টগর দাসী
	পি কে. দাস
	রামসুন্দর রায়। মশলা-ব্যবসায়ী
	ব্রজকিশোর চৌধুরী
	ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	সরোজিনী দেবী
	গায়ত্রী দেবী
	গার্গি দেবী
	অনন্তনারায়ণ সেন
	বাণী দেবী
	প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়
	সুহাসিনী দেবী
	হৃদিনাথ ঠাকুর
	ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	Wazid Ali Khan

তারিখ	বিষয়
১৯১৬	
	সুকুমার বসু
	মেধা দেবী
	সরলাবালা দাসী
	রমা বসু
	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
	নীহার
	নীলিমা
	Dr. Urquahart
	শেফালী। অসমাপ্ত
	Dorothy Das
	শকুন্তলা দেবী
	K. G. Ghosh
	কুমুদনাথ ভট্টাচার্য
	P. C. Sen
	P. C. Sen
	মিনু সেন
	প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	অদ্বৈতপ্রসাদ দে
	মঙ্গু। নাপিত
	ভাঙ্গু
	কুমুদেন্দু ভট্টাচার্য
	নেপাল
	মনোহরলাল শীল
	বয়রা
	ইন্দিরা দেবী
	প্রথম চৌধুরী

তারিখ	বিষয়
১৯১৬	
	সুপ্রভা দেবী
	ঝুবলু
	চামনা
	গিরিজাভূষণ চক্রবর্তী
	আবদুল। খানসামা
	জগন্নাথ। দরোয়ান
	কেন্দ্র
	লতু
	Unfinished portrait study
	বিজিরাম। মোটরচালক
	কেদারনাথ রায়
	আশুতোষ মিত্র
	নরেন্দ্রলাল খাঁ। নাড়াজোলের রাজা
	উর্মিলা গুপ্ত
	বাদল। পাচক
	কালিদাস ঘোষ
	C. F. Andrews
	C. F. Andrews
	সংজ্ঞা দেবী
	Unfinished portrait study
	Unfinished portrait study
	Unfinished portrait study
	Unfinished portrait study
	সুরেশচন্দ্র নাগ
	বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ

তারিখ	বিষয়
১৯১৬	
	R. W. Jannings
	মনীষীমোহন ঘোষ
	আর্যমূর্তি। আর্য সাধু
১৯১৭	
	R. Isaac
	Moses Solomon
	সুরেশচন্দ্র বসু
	সীতা দেবী
	উমা বসু
	K. C. Roy
	R. G. Choudury
	লালবিহারী বসাক
	লালবিহারী বসাক
	B. Singh
	সীতারাম
	তরণরাম কবিরাজ
	I. A. Isaac
	ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহচৌধুরী
	অসিতকুমার হালদার
	উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
	M. Edge
	M. Chakraborty
	দেবকুমার বসু
	রেবতীমোহন সেন
	জিতেন্দ্রলাল বসু
	মাধুরী দেবী

তারিখ	বিষয়
১৯১৭	
	উমা বসু
	কৃষ্ণবিহারী রায়
	মুরলিধর রায়চৌধুরী
	সুকুমারী বসু
	রণেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
	নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	চুনীলাল রায়
	কমলা বসু
	হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
	সুকুমার বসু
	নিজ প্রতিকৃতি। অসমাপ্ত
	নিজ প্রতিকৃতি। অসমাপ্ত
	নিজ প্রতিকৃতি। অসমাপ্ত
	Moswa Solman
১৯১৮	
	উমা বসু
	জয়া দেবী
	যোগেন্দ্রলাল শিরোমণি
	সুন্দরী রায়
	ভূষণ সেন
	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
	শরৎকুমারী দেবী
	বীণা পাল
	C. F. Andrews
	ননীলাল পাল
	বৈদ্যনাথ ঘোষাল। প্রধান শিক্ষক

তারিখ	বিষয়
১৯১৮	
	সতীশচন্দ্র সেন
	সুরজভূষণ লাল
	মায়া দেবী
	M. N. Kanjilal
	শান্তিলতা দেবী
	প্রীতিলতা দেবী
	B. L. Mitra
	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
	B. K. Lahiri
	R. N. Mookherjee
	Asoke Kumar Roy
	কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	সুবোধ চট্টোপাধ্যায়
	S. A. Banerjee
	শশধর রায়
	বিপিনচন্দ্র পাল
	M. L. Baron
	Nara Prasun
	নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	পেনসিল স্কেচ ॥
	প্রীতিলতা দেবী
	বি এল মিত্র
	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
	বি কে লাহিড়ী
	আর এন মুখার্জি

তারিখ	বিষয়
১৯১৮	
	অশোককুমার রায়
	কান্তিচন্দ্র মুখার্জি
	জ্ঞানচন্দ্র ব্যানার্জি
	সুবোধচন্দ্র চাটার্জি
	এস এ ব্যানার্জি
	শশধর রায়
	বিপিনচন্দ্র পাল
	এম. এল এল. ব্যারন
	নর প্রসুন
	প্রমথ চৌধুরী
	ইন্দিরা দেবী
	রায় বৈজনাথ গোয়েঙ্কা বাহাদুর।
	মুঙ্গের
	সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	চুনীলাল বসু
	অরুণ চক্রবর্তী
	মহিউদ্দিন আহমদ
	ডাক্তার কে. বি. চক্রবর্তী
	মেরী ব্যারন ও তার তোতা পাখি
	রাণা
	বেলা দেবী
	মণিকা দেবী
	ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিনয়রঞ্জন হালদার
	বিভাবতী দেবী
	ধর্মদাস ঘোষ

তারিখ	বিষয়	তারিখ	বিষয়
১৯১৮		১৯১৮	
	জে. রাইট		বেঞ্জি। কুকুর
	প্রমীলা দেবী		শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
	কণকচন্দ্র গুপ্ত		সুষমা ঘোষ। কালিদাস ঘোষের কন্যা
	মতিমালা দেবী		
	ভিক্টর নীতীন্দ্রনারায়ণ		অমৃতলাল গুপ্ত
	মেরী এল টি. শার্পস		প্রেমলতা রায়
	ভি. সি অকনর		সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	সুধাংশুপ্রভা ঘোষ		শ্রীপতি রায়। ব্যারিস্টার
	রামকৃষ্ণ। গায়ক		শরৎকুমারী চৌধুরানী
	যোগানন্দ গিরি		তাপসেন্দু চট্টোপাধ্যায়
	সাহানা দেবী। সুসী		অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী
	ব্রজেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত		মানিক
	সতী দেবী		শরৎচন্দ্র দত্ত
	এস এম. এ অকটু। দাঁতের ডাক্তার		শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
	কে. বি দাশগুপ্ত		অর্ধেন্দুপ্রতাপ। দিয়াড়ার রাজা
	যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়		মায়া দেবী
	নবীনচন্দ্র গুপ্ত	১৯১৯	
	ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়		মহেন্দ্রনাথ দত্ত
	আসাগরী		এস. সি. মিত্র
	রেণু দেবী		এ. সি. ব্যানার্জি
	মেরী		শশিভূষণ মজুমদার
	নিরুপমা দেবী		বীণা দেবী
	সুহাসিনী দেবী		নিজ প্রতিকৃতি
	রঙ্গিনী। নেপালী ঝি		আমানতুল্লা আহমদ
	সিতাংশুজ্যোতি মজুমদার। বকু বাবু		নিরুপমা দাশগুপ্ত
			সুশীলা দাশগুপ্ত

তারিখ	বিষয়	তারিখ	বিষয়
১৯১৯		১৯১৯	
	স্নেহলতা দেবী		কমলাবালা দেবী
	সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়		প্রতিভা দাশগুপ্তা
	সরসীবালা দেবী		প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়
	জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়		শেফালিকা দেবী
	ওয়াই. ই আসিফ্		বিভা দেবী
	নীলমণি চক্রবর্তী		মায়া দেবী
	বিপিনবিহারী দাস। সুবীরেন্দ্র নাথ ঠাকুরের শিক্ষক		জগন্নাথ সিং। জমাদার
	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়		এল জে বার্গীস
	বীরেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়		সুধাময়ী
	কুমুদপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।		আর. মরিস
	অমিয়ভূষণ বসু		অমূল্য চাট্টোপাধ্যায়। ড্রাইভার
	শ্রীমতী সীমা মরিস		সলোমন জে সলোমন
	কিশোরী দত্ত		আবদুল করিম
	ব্যারন মরিস		মিসেস লেভি
	জি আব্রাহাম		মিসেস মোজেস
	মিস গ্রেস মরিস		মিস ক্যাথারিন মোজেস
	ভিক্টর নীতীন্দ্রনারায়ণ		প্রসন্নকুমার দাশগুপ্ত
	অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী		সুরেন্দ্রনাথ বাগচী
	প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়		মিস স্টেলা লেভি
	রাধারমণ বরাট		মিসেস সারা কোহেন
	মিস্ ইব্রাহাম		সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	লতিকা রায়		জে সি গুপ্ত
	নিরুপমা দেবী		নিরুপমা দেবী
	রমা বসু		জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়
	হিরণ্ময়ী দেবী		সলিলা মজুমদার
			মৃন্ময়ী দেবী

তারিখ বিষয়

১৯১৯

ভাম্বু
গ্রেস মরিস
মিস র‍্যাচেল আইজাক
মিস কাটে মসিয়ে
এস লেভি
মোহিতচন্দ্র বসু
মিস এস লেভি
মাধব রায়। ইঞ্জিনিয়ার
মোহাম্মদ আলি ইমাম
সৈয়দ রসীদ জামান
ই এস মরিস
ভি. সলোমন
এ ইমাম

১৯২০

অচ্যুতানন্দ
কমল বৌ। দিনেন্দ্রনাথের স্ত্রী
মননকুমার মৈত্র
অমিয়া দেবী। মানিক।
মোহনলাল মল্লিক
সনৎকুমার ঘোষাল
মিসেস আব্রাহাম
এ. আর নাহার
মনোরমা। জিতেন্দ্রলাল বসুর কন্যা
শোভনা দেবী
অবনীমোহন ঠাকুর

তারিখ বিষয়

১৯২০

প্রেমনাথ কাপুর। লাহোর
রবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
চিত্তরঞ্জন গোস্বামী
পঙ্কজিনী দেবী
ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
ধীনা
যতীন্দ্রলাল সান্যাল
শীলা বন্দ্যোপাধ্যায়
ইন্দু ঘোষ
কানাইলাল ভড়
প্রভাবতী
সুহৃদ চৌধুরী
সুরমা দেবী
মিহিরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ডাক্তার সনৎকুমার ঘোষ
প্রবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
যদুনাথ সরকার
জ্যোতির্ময়ী দত্ত
রমণীকান্ত রায়। চৌগাঁর রাজা।
পারুল দেবী
অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শেষপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
তরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুরেশচন্দ্র সেন

তারিখ	বিষয়	তারিখ	বিষয়
১৯২০		.১৯২০	
	সুভাষিণী দেবী		যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
	স্বরূপা দেবী		শেফালি দেবী
	রোহিণীকুমার মজুমদার		শিশিরকুমার মিত্র
	এল বি মার্টিন		যতীন্দ্রনাথ পাল
	রাজবালা		দয়াময় মুখোপাধ্যায়
	অবনীশচন্দ্র দে		কুসুমকামিনী দেবী
	তিনকড়ি ঘোষ		সত্যচরণ শাস্ত্রী
	মৃগেন্দ্রলাল মিত্র		এ আলিম
	হেমলতা মিত্র		তুলসীমতী চট্টোপাধ্যায়
	সুধা ঘোষ		মীরাবতী চট্টোপাধ্যায়
	হীরাবতী সিং		রাজেশকান্ত রায়
	সুকৃনি		রাধারানী রায়
	মিসেস আবদুল্লা মোহম্মদ		শৈললতা চক্রবর্তী
	বিমলেন্দু রায়		প্রতাপ উদয়নাথ শা দেও। ছোটনাগপুরের মহারাজা
	দেবশরণ সিং দেও		সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
	ডবল্যু ওয়েফারার		পি. এল. রায়
	ভুপালচন্দ্র বসু		অমিতা
	ইন্দুপ্রভা দেবী		রাজেন্দ্রনাথ রায়
	বিমলেন্দু রায়		অসিতকুমার হালদার
	অমিয়কুমার বসু		ইলা
	পারেয়াগ। গোয়ালা		বিমল ও তাঁর কন্যা
	রামগোবিন্দ গোস্বামী		আবদুল্লা মোহম্মদ
	আর সি দেববর্মণ		লীলা দেবী
	প্রতিমা সরকার		সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	এ. ল্যাম		নলিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

তারিখ বিষয়

১৯২০

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্থরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
ইন্দুমতী দেবী
গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
অপর্ণা দেবী
গৌরপ্রসাদ মজুমদার
ইন্দ্রাণী দেবী
নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ইলা
অদিতি দেবী
অদিতি দেবী

১৯২১

ছায়াবতী দেবী
পারুল দেবী
লালবিহারী বড়াল
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পারুল দেবী
অনিলকান্ত নাগ
রমা দেবী
মিসেস বিভা মুখোপাধ্যায়
সরলা মিত্র
প্রমীলাস্থন্দরী দেবী
স্থধেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়
অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কেশবকুমার মুখোপাধ্যায়

তারিখ বিষয়

১৯২১

স্বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নেপু
এইচ ই উইলঙ্গলি
ধীরাবালা দেবী
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
সবিতাবালা দেবী
পঞ্চানন শ্রীরত্ন ভটাচার্য
দেবপ্রসাদ সান্যাল
আই ওয়েস্ট
লালবিহারী বড়াল
জ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্তী
মধুস্থদন দেব
স্থকুমার হালদার
সনৎকুমার হালদার
রাজলক্ষ্মী দেবী
দেবনাম হালদার
ভূপালচন্দ্র বস্থ
সিদ্ধেশ্বর সরকার
এন কে চট্টোপাধ্যায়
ডালিমচন্দ্র দত্ত
কমলিনী বস্থ
রজনীকান্ত গুহ
বীণাপাণি সান্যাল
স্বর্ণকুমারী গুহ
শেফালি
শরৎচন্দ্র রায়
নগেন্দ্রনাথ মিত্র

বিষয় তারিখ বিষয়

১৯২১

স্নেহলতা দত্ত
রমেশচন্দ্র ঘটক
শান্তিলতা বসু
আশিসকুমার বসু
চারুলতা দেবী
অনুপমা দেবী
এস. এম. সিংহ। লেডি সিংহ
কর্নেল সিংহ
রমলা গুপ্ত
দুর্গা দেবী
মহাবীরপ্রসাদ বর্মা
এইচ ই লর্ড সিংহ
কনিষ্কমোহন ঠাকুর
বিজয়কুমার মিত্র
নীহার
শের আলি নুরমহম্মদ
একজন মহিলা
নির্মল সেন
জ্যোৎস্নানাথ সেন
পকু
ফেলিয়াটা চৌধুরী
অশ্বিনীকুমার চৌধুরী

লীলাবতী বসু
একজন মহিলা
আশাবতী দেবী

১৯২১

জ্যোতির্ময় হালদার
বীণাপাণি ঘোষ
কে. সি মুস্তাফি
শ্যামাপ্রভা দেবী
সবিতাবালা দেবী
স্বর্ণময়ী দেবী
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
এল. এইচ. অলসন
সরলাদেবী চৌধুরাণী
জখুরউদ্দিন
ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়
বলীনারায়ণ বর্মা
কল্যাণচন্দ্র বড়াল
নূর খান
মনা দেবী
আমাতুল
এইচ সি মজুমদার
এন. এন. ভোস
মিস ডবল্যু. জি. চট্টোপাধ্যায়
অমৃতলাল সেন
সুধীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
জ্ঞানকর দে
এস কে. মুখোপাধ্যায়
যতীন্দ্রনাথ বসু
অজয়কুমার বসু
বীরেন্দ্রকুমার বসু

তারিখ	বিষয়	তারিখ	বিষয়
১৯২১		১৯২২	
	কৃষ্ণদেব সিং		জ্যোতিপ্রকাশ সরকার
	কমলা দেবী		সরলাবালা
১৯২২			স্টেলা ক্রামরিশ
	নিজ প্রতিকৃতি		এল কে. এলম্‌হার্স্ট
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		ফার্নাণ্ড বেনোয়া
	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর		জগদানন্দ রায়
	একজন ভদ্রলোক		ক্ষিতিমোহন সেন
	কল্যাণী দেবী		প্রভাবতী দেবী
	অজিতা দেবী		অসীমা বন্দ্যোপাধ্যায়
	হেলেন ডি সরন। সিংহলী খ্রীষ্টান		জে এন মুখোপাধ্যায়
			রেণু নাগ
	চুনীলাল চৌধুরী		জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
	সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য		জগদীশচন্দ্র বসু
	জ্যোৎস্নাময়ী দেবী		ডবল্যু ডবল্যু পিয়ার্সন
	অবনীনাথ ঘোষাল		ইন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া
	সোমনাথ মুখোপাধ্যায়		জয়দেব চৌধুরী
	কর্নেল মুরে		ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
	অমৃতনাথ মিত্র		গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী		আনন্দকুমার মুখোপাধ্যায়
	গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		ললিতমোহন সিংহরায়
	অরুণা দেবী		যতীন্দ্রনাথ সিংহ
	সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়		নবীনবিহারী আইকট
	জয়া দেবী		শরদিন্দু নিভাঙ্গিনী
	সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর		প্রবোধচন্দ্র রায়
	মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		সুহৃৎনাথ চৌধুরী
	গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ		যশোবন্ত এন. ডালভে

তারিখ	বিষয়

১৯২২

আভা দেবী
আভা দেবী
বি. এন রায়
শোভা দত্ত
মিসেস নিভা রায়চৌধুরী
রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
বিনয়েন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
এন এন রায়চৌধুরী। সন্তোষ
কমলা বসু
সুন্‌রা মসিয়া
উমা দে
জয়শ্রী দেবী

১৯২৩

আই কাণ্ডে
শক্তীন্দ্রমোহন ঠাকুর
রসগোল্লা বাবাজী। ৯৫ বৎসর
এস. এন. মজুমদার
স্বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর
যতীন্দ্রনাথ মিত্র
মহম্মদ আবদুল মমিন
আলাদিন এস মহম্মদ
প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়
স্ট্যানলি জোন্‌স
মটুরা সেন
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
অশোকা দেবী

তারিখ	বিষয়

১৯২৩

সুবীর ঠাকুর
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
রাজীব চৌধুরী। বেটু
বিনোদবিহারী সরকার
উপেন্দ্র চৌধুরী
লাবণ্যপ্রভা দেবী
মনোরমা দেবী
সুলেখা মিত্র
অনুকূলচন্দ্র সান্যাল
গণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত
মিনু সেন
ভবতারিণী দেবী
প্রেম বন্দ্যোপাধ্যায়
এস এন বন্দ্যোপাধ্যায়
ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়
লতিকা সরকার
হিরণ্ময়ী দেবী
মঞ্জুশ্রী দেবী
সুষমা দেবী
আসগরী
সুষমা সেন
সুধা
অদিতি দেবী
স্নেহলতা সেন
প্রদ্যোৎকুমার সেন। হাবলু
রণবীরকৃষ্ণ রায় দস্তিদার

তারিখ	বিষয়	তারিখ	বিষয়
১৯২৩		১৯২৪	
	সরযূ দেবী		নিজ প্রতিকৃতি
	মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য		গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	প্রশান্তকুমার সেন		মৃণালিনী দেবী
	সুধাহাসি দেবী		মনা দেবী
	বীরেন্দ্রমোহন সেন		জ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্তী
	শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী
	শরৎচন্দ্র বসু		হায়দার মহম্মদ
	যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়		বিজনমোহন চট্টোপাধ্যায়
	প্রমীলা চক্রবর্তী		অতুলকৃষ্ণ বসু
	প্রদীপনাথ চট্টোপাধ্যায়		জি. হারবার্ট উইলটন বেকার
	ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়		মনীষীমোহন ঘোষ
	মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী		প্রণয়লাল গঙ্গোপাধ্যায়
	সরোজবাসিনী দেবী		গীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	অম্বিকাদাস মিশ্র		কিরণবালা
	এ হাকিম		অপর্ণা দেবী
	সুধীন্দ্র		স্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী
	শোভা		সুরমা দেবী
	এল এম. দেব		অমরনাথ মুখোপাধ্যায়
	প্রসন্ন সেন		চুনীলাল বসু
	সত্যেন্দ্র		লতিকা ঘোষ
	কিরণ		সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
	সুরুচী দেবী		প্রমীলাবালা
	নগেন্দ্রনাথ বসু		জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	মধু বসু		নলিনীরঞ্জন সরকার
	দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়		গোপালদাস চটোপাধ্যায়
	প্রমথনাথ বসু		মহম্মদ আইয়ুব

তারিখ বিষয়

১৯২৪

নরসিং দাস
বিজয়চন্দ্র মজুমদার
সার্ বীর মিত্রোদয় সিং দেব বাহাদুর
ঈশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
সরযূবালা দেবী
ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
অরুভা দেবী
মিস আজগারী করিম
প্রমোদকুমারী দেবী
রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
অণিমা দেবী
কালীপ্রসাদ চৌধুরী
ধীরাবতী দেবী
সরসীমোহন রায়
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুবীর ঠাকুর
অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়
বিষ্ণুচন্দ্র চৌধুরী
সত্যশোভন সিংহ
বিমলকুমার রায়
এম. এ হাফিজ
সুষমা সিংহ
মহম্মদ হাসান খান
সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী
সুবোধকুমার বসু

তারিখ বিষয়

১৯২৪

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুরবালা দেবী
প্রকৃতি দেবী
মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়
পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
নিশানাথ চট্টোপাধ্যায়
সুধাংশুমালা দেবী
সীতা দেবী
লছমি দেবী
ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পূর্ণিমা দেবী
ঈশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
জয়ীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভীমরাও শাস্ত্রী
মীরা চৌধুরী
প্রকৃতি দেবী
অণিমা দেবী
পূর্ণিমা দেবী
সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়
প্রতিমা দেবী
দেবরানী দেবী
শেফালিকা দেবী

১৯২৫

শশিভূষণ দত্ত
চপলা দত্ত

তারিখ	বিষয়
১৯২৫	
	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	সুজাতা দেবী

তারিখ	বিষয়
১৯২৫	
	লীলা মৈত্র
	জনক গঙ্গোপাধ্যায়

উল্লেখপঞ্জী